রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
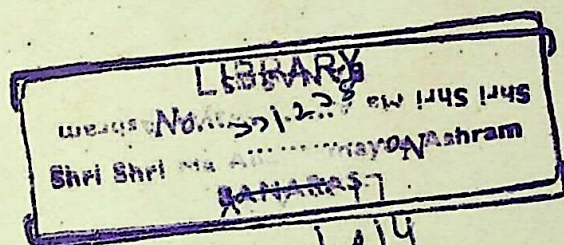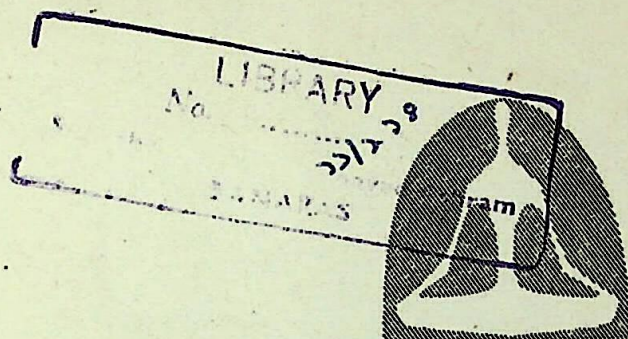
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
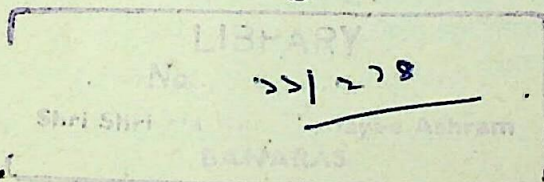
আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ :
২রা অগাস্ট, ১৯৬৪
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৭১

প্রকাশক :
অমিতাভ মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

দাম : ৬·৫০

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন
অহং যন্ত্রং ভবান যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে॥

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা ন হি
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥
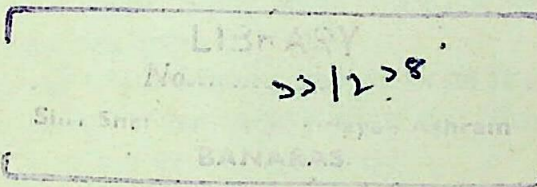
ভূমিকা

'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হয়ে গেল।'

একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে। যে কোনো পথ দিয়ে যেতে-যেতে। ভোগের পথ, ত্যাগের পথ, কর্মের পথ, ধর্মের পথ, সংসারের পথ, সন্ন্যাসের পথ। যে কোনো পথ। প্রশ্ন পথ নয়, প্রশ্ন ভালোবাসা।

কারুর ভাব নষ্ট করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ। কারুর পথের কণ্টক হননি। গিরিশেরও না। বলতেন, ওর রাবণের ভাব, যোগও আছে ভোগও আছে। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।

'আমি এখন কী করব?' গিরিশের প্রশ্ন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর : 'যা করছ তাই করো।'

তাই করেছে। নাটক লিখেছে, নাটক করেছে, নাটক শিখিয়েছে। নিজের প্রবণতাকেই শুধু অনুসরণ করেছে। থিয়েটারের মধ্য দিয়েই করেছে লোকসেবা। ধর্মের খাতে কোনো অনুষ্ঠান করেনি, একটু সামান্য স্মরণ-মনন, তাও নয়। কিছু ধরেনি কিছু ছাড়েনি। শুধু বিশ্বাস করেছে আর ভালোবেসেছে।

এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে পাপের পাহাড়। জীবনের সমস্ত শোককে শ্লোক করে তুলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব চিকিৎসা। কোনো নিষেধ নয় কোনো আরোপ নয়। শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামকে প্রেম করা, আমি-কে তুমি করা, অহঙ্কারকে অলঙ্কার করে তোলা।

'সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কী! সংসারে থেকে তুই যে ঈশ্বরকে ডাকিস, যেন তুই বিশমণ পাথর ঠেলে দেখছিস গহ্বরে কী আছে।'

শুধু বিশ্বাসে আর ভক্তিতে গিরিশ সেই বিশমণ পাথর-ঠেলা গহ্বর-দেখা বীরভদ্র। আমাদের, সংসারীদের, একমাত্র ভরসা।

অচিন্ত্যকুমার

গিরিশচন্দ্র

॥ এক ॥
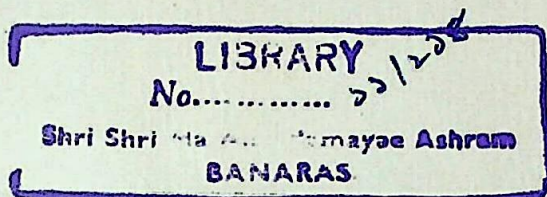
'রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু'চার ডুবে ধন না পেলে।'

এই বুঝি বোসপাড়া লেন।

'মশায়, গিরিশ ঘোষের বাড়িটা কোন্ দিকে বলে দিতে পারেন?'

'ঐ যে—দেখতে পাচ্ছেন না দোরগোড়ায় বৈষ্ণব বাবাজীদের ভিড়—ঐ বাড়িটা। আপনারাও তো দেখছি ভেকধারী—বলি, ওখানে আপনাদের এত হঠাৎ আনাগোনা কেন?'

'আহা, কী বইই লিখেছেন উনি!'

'কী বই?'

'চৈতন্যলীলা।' গ্রন্থের উদ্দেশে নমস্কার জানাল বাবাজী। 'স্টারে প্লে হচ্ছে। দেখেননি আপনি?'

'না মশাই, থিয়েটার কি ভদ্দরলোকে দেখে?' প্রতিবেশী ভদ্রলোক নাক সিঁটকালো। 'তা আপনারা, বৈষ্ণব বাবাজীরা ওখানে ভিড় করেছেন কেন? কোন্ মধুর সন্ধানে?'

'নাম-মধুর সন্ধানে।' বাবাজী বিহ্বল কণ্ঠে বললে, 'শোনেন নি বুঝি থিয়েটারে গৌর নেমেছে।'

'কে নেমেছে?'

'গৌর প্রভু দয়াময়। নাট্যশালায় ভক্তমেলা বসেছে। তীর্থ হয়ে গেছে থিয়েটার।'

'যান মশাই, কেটে পড়ুন।' প্রতিবেশী সরে পড়ল।

গিরিশের বাড়িতে বৈষ্ণব বাবাজীদের মেলা বসেছে। চৈতন্যলীলা দেখে তারা ভীষণ বিচলিত। সর্বক্ষণ ঘিরে আছে গিরিশকে। গিরিশের কাজকর্ম সব শিকেয় উঠল।

স্তবস্তুতি বেশি হলে কি আর ভালো লাগে? ওরা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা!'

মহাপ্রভুর কৃপা কার উপরে নয়? তাঁর কৃপার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা অকৃপণ। তাঁকে অনুসন্ধান না করলেও তা জীবনে এসে জোটে, ফলান্বিত করে।

'তাঁর অমৃতমধুর প্রেমফল আপনি পেয়েছেন।' বললে আরেকজন।

কে না পায়! যে ফল চায় তাকেও দেন, যে না চায় তাকেও দেন! পাত্রাপাত্রের বিচার করেন না, সাধন-ভজনের অপেক্ষা করেন না। যাকে-তাকে ঢেলে দেন, বিলিয়ে দেন অকাতরে। নির্বিশেষে সকলকে দেব এই তিনি জানেন, দেব না—এ কোনোদিন জানেন না। তাঁর নামই যে বিশ্বম্ভর। প্রেমে বিশ্ব ভরবেন বলেই তো তাঁর ঐ নাম।

'আর কী সুন্দর সেই হরিনামের গানটা।' কে আরেকজন গেয়ে ওঠে গলা

ছেড়ে। 'এমন সুধার হরিনাম, হরিনাম বলো না। সাধের পণে কিনবি হরি, সাধ কেন তোর হল না—'

উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আরেকজন : 'আপনি ভাগ্যবান—মহা ভাগ্যবান।'

এও না হয় সহ্য হয়। হরিনাম তো জলের মত সোজা—শুচি-অশুচি নেই, যে কেউ নিতে পারে, যে কোনো সময়, এমন কি উচ্ছিষ্ট মুখে। এমন কি সংশয়ে, অশ্রদ্ধায়, অবিশ্বাসে। কোনো বিধি নেই, বাধাও নেই। আদ্যোপান্ত নির্নিষেধ।

'কী ভক্তি! এমন ভক্তি দেখা যায় না।'

এই আবার বাড়াবাড়ি শুরু করল! অস্থির হয়ে উঠল গিরিশ। শুধু বই লিখলেই ভক্তি হয়? ভক্তি করবার মত জলজ্যান্ত বিগ্রহ কই চোখের সামনে? প্রাণে কই সেই আকুলতা? কূলে থেকে কি কৃষ্ণ মেলে? কুলে থেকেও নয়।

চুলোয় গেল সব কাজকর্ম। এদেরও কাজকর্ম কি সব ঝুলির মধ্যে?

মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। হরি বললে মাগুর মাছের ঝোল ও যুবতী মেয়ের কোল পাওয়া যাবে—দলে দলে চলল বোরেগীরা।

পরে বুঝি তাদের স্বপ্ন ভাঙল। মাগুর মাছের ঝোল মানে হরি নামে যে অশ্রু ঝরে সেই প্রেমাশ্রু, আর যুবতী মেয়ে মানে পৃথিবী—আর, যুবতী মেয়ের কোল মানে হরিপ্রেমে ধুলোয় গড়াগড়ি।

'যাই বলুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনার মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব হয়েছে।' পা ছুঁয়ে কেউ বুঝি এগুলো প্রণাম করতে।

এ উটের পিঠে শেষ কুটো।

গিরিশ ডাকল চাকরকে। চাকর এলে কী বলল ইশারায়।

চাকর বোতল আর গ্লাস দিয়ে গেল।

ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালল গিরিশ।

'কী খাচ্ছেন? ওষুধ?' জিগগেস করল একজন।

গন্ধের সঙ্গে বুঝি পরিচয় নেই বাবাজীদের। নইলে স্থির হয়ে নিশ্বাস নিচ্ছেন কী করে? আরেকজন আরো এক কাটি সরেস। জিগগেস করল, 'এ কি মহাপ্রভুর চরণামৃত?'

'এ মশাই মদ, স্রেফ মদ।' দুঃসহ ক্রোধে বলে ফেলল গিরিশ।

এ শোনাও মহাপাপ! ঘ্রাণে বুঝি বা অর্ধভোজন হয়ে গেল। নাকে-কানে কাপড় গুঁজে উর্ধ্বশ্বাসে পালালো বাবাজীরা।

যাক, বিতাড়িত হয়েছে। আমার আর কাজ নেই, বসে-বসে যা নয় তাই প্রশংসা শুনি! নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে! তবু তারও একটা সীমা আছে। ভব্যতা-ভদ্রতা আছে। বলে কিনা চরণামৃত!

শ্রীরামকৃষ্ণ টলছেন। টলে-টলে ঢলে পড়ছেন। নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। শ্রীমাকে জিগগেস করছেন, 'হ্যাঁ গা, আমি কি মদ খেয়েছি?'

শ্রীমা বললেন, 'না, তুমি কালীঘরের চরণামৃত খেয়েছ।'

ওদের এক বোতল মদে যে নেশা তার চেয়ে আমার বেশি নেশা এক ফোঁটা চরণামৃতে। ওদের কত খরচ কত জ্বালা। আমার শুধু নীট ফূর্তি—কারণানন্দ। তারপরেই কারণের কারণ—সচ্চিদানন্দ।

গান ধরলেন ঠাকুর। 'সুরা পান করি না রে, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।'

সেই কবে থেকে মদ ধরেছে গিরিশ। প্রথম মদ খায়, পরে মদে খায়। কিন্তু বলো, কোনোকালেই কি সে রাক্ষসকে ছাড়া যায় না?

'খা না, কতটুকু খাবি? আর, কতদিন খাবি?' নিজের হাতে গিরিশকে মদ ঢেলে দিচ্ছেন ঠাকুর : 'তুই এ নেশা করছিস আরেক নেশার খবর পাসনি বলে। যখন তোকে সে নেশা পেয়ে বসবে তখন বুঝবি এ নেশা কোন্ ছার!'

তার নামই বুঝি সর্বনাশের নেশা।

অষ্টম গর্ভের সন্তান—মার প্রত্যক্ষ স্নেহ পায়নি গিরিশ। পায়নি বুকের দুধ। প্রসবের পরেই রাইমণি অসুখে পড়ে। এক বাগদি মেয়ে গিরিশের ভার নেয়। তারই স্তন্যে বেড়ে ওঠে গিরিশ।

দুধ না দাও, গিরিশকে কাছে টেনে একটু আদর করতে দোষ কী! তুমি মা, তোমার ইচ্ছে করে না ছেলেকে কোলে নিতে? মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজে অমন বসে থাকো কী করে?

'আমি মা নই, আমি রাক্ষুসী।' প্রাণপণ চেষ্টায় দুই চোখ বন্ধ করে রাইমণি : 'আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যা। আমার থেকে দূরে থাকলেই ওর মঙ্গল।'

কিন্তু এখন যে গাল-গলা ফুলে প্রচণ্ড জ্বর হল গিরিশের। এখন কী করবে? ছেলের সেবা-শুশ্রূষা করবে না?

স্বামীকে ডাকাল রাইমণি। বললে, 'যেমন করে পারো বাঁচাও ছেলেকে।'

'হঠাৎ ছেলের প্রতি দয়া?' নীলকমল গলায় বুঝি বা একটু ঝাঁজ আনে : 'কোনোদিন তো দেখিনি এমন অনুরাগ। যাকে ছুঁতে পর্যন্ত তোমার ঘেন্না তার উপর এত স্নেহ?'

'তুমি তার কী বুঝবে কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখি।' রাইমণির চোখ ছাপিয়ে জল নামল গাল বেয়ে : 'আমার অযত্নে অবহেলায় ও কত কষ্ট পেয়েছে তা ভাবতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর জানেন, ওকে দূরে সরিয়ে রাখলেও আমি ওর মা, বুকের মধ্যে ধরে রাখলেও আমি ওর মা। আমার স্নেহে কি কোনো তর-তম আছে?'

এ সারদামণিরও কথা।

জয়রামবাটিতে এসে আশু মিত্তিরের অসুখ করেছে। একটানা জ্বর তার মধ্যে মায়েরও একটানা সেবা। ভালো হয়ে ওঠো-ওঠো অবস্থা, আশু জিগগেস করল মাকে, 'মা তোমার এই স্নেহ চিরকাল পাব তো!'

শ্রীমা বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, এখানে কি জোয়ার-ভাঁটা আছে? এখানে সমশীতল।'

রোগেও আমি আরোগ্যেও আমি। উপেক্ষায়ও আমি অপেক্ষায়ও আমি। একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে। একই চাঁদ রোজ-রোজ।

নীলকমল বললে, 'তবে কেন তোমার বিরাগ এই সন্তানে?'

'তুমি বড় খোকাকে ভুলে গিয়েছ?' চোখ তুলে তাকাল রাইমণি।

সে কখনো ভোলবার? বাইশ বছরের জোয়ান সমর্থ ছেলে, প্রথম ছেলে, অকালে মারা গেল।

'আমি রাক্ষুসী, খেয়েছি বড় খোকাকে। আমার দৃষ্টিতে অমঙ্গল, স্পর্শে অমঙ্গল—এমন কি আমার ছায়াও অমঙ্গল।' অশ্রুতে ভেসে যেতে লাগল রাইমণি। 'তাই আমি গিরিশকে আসতে দিতাম না আমার কাছে। হাত নিশপিস করত, তবু ছুঁতাম না ধরতাম না ছেলেটাকে, প্রাণটা খাঁ খাঁ করত তবু টেনে নিতাম না বুকের মধ্যে। সব—সব ওর মঙ্গলের জন্যে। ওর মঙ্গলের জন্যেই আমার এই কৃচ্ছ্রসাধন। আজও—আজও ওর এই দুরন্ত অসুখের মধ্যে আমি যাব না, বসব না, থাকব না ওর কাছে। আমি দূরে-দূরে থাকলেই ওর ভাল হবে—ও ভালো হয়ে উঠবে। তাই তুমি ওকে দেখ। তোমার ছেলে, তুমিই ওকে সারিয়ে তোলো—'

সন্তানের মঙ্গলকামনায় মার এই অপূর্ব ত্যাগস্বীকার আর কোথায় দেখেছি?

আমি বাঁচব না—এই একটি নিত্যকালের ব্যথা হয়ে বেঁচে ছিলাম, বিঁধে ছিলাম মার বুকের মধ্যে। যত দিন মা ছিলেন মর্ত্যকায়ায়। মার মূল্য বুঝেছে গিরিশ।

এক ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছে। প্রণাম করবার সময় তাঁর বুড়ো আঙুলের উপর সজোরে নিজের মাথাটা ঠুকে দিল ভক্ত।

শ্রীমা সকাতরে উঃ করে উঠলেন।

'এ কী করলে?' যারা যারা কাছে ছিল সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল।

এতটুকু ঘাবড়াল না ভক্ত। নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে ব্যথা রেখে দিলাম। যতদিন এই ব্যথা থাকবে ততদিন মা আমাকে মনে করে রাখবেন।'

যতদিন ব্যথা ততদিন তো মনে করে রাখবেনই, তারপর যখন আর ব্যথা থাকবে না তখনও মনে করে রাখবেন, ও এক দিন ব্যথা দিয়েছিল বলে।

গিরিশের যখন মোটে দশ বছর বয়স তখন মারা গেল রাইমণি। গিরিশ মাতৃহীন হল।

'মন কেন রে ভাবিস এত। মাতৃহীন বালকের মত? ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত। কালেরও কাল যে মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত॥'

বাপের আদরের দুলাল হয়ে ক্রমে-ক্রমে বয়ে গেল গিরিশ। যা আবদার করে তাই নীলমাধব জুটিয়ে দেয়। যদি তা কেনবার জিনিস হয় দামের জন্যে হটে না।

কিন্তু সেদিন যে বায়না ধরল তা অভিনব।

বাপের কাছে গিয়ে কান্না জুড়ল গিরিশ : তেষ্টা পেয়েছে।

'তেষ্টা পেয়েছে তো জল খা না। ওরে গিরিশকে জল দে।' চাকরের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল নীলকমল।

'জল খাবার তেষ্টা নয়।' রোল আরো উচ্চে তুলল গিরিশ।

'জল খাবার তেষ্টা নয় তো কী খাবার তেষ্টা?' বিরক্ত হল নীলকমল : 'শরবৎ খাবি?'

'না, না, ও সব নয়—'

'ও সব নয় তো তবে কী! খাবার খাবি? রসগোল্লা-সন্দেশ? দই-রাবড়ি?'

'না, আমার খাবার খাবার তেষ্টা নয়।' কান্নায় আরো তুমুল হল গিরিশ।

'তবে, হারামজাদা, কী খাবি? আমার মাথা খাবি?' নীলকমল এই মারে তো ঐ মারে। 'বুড়ো ছেলে, কাঁদছে দেখ না।'

'আমি ফল খাব।'

'ফল খাবি তো সে ফলের নাম নেই?' আবার তেড়িয়া হল নীলকমল : 'বল না কী ফল?'

'শশা। আমি শশা খাব।'

'শশা খাবি তো আনিয়ে দিচ্ছি বাজার থেকে।' ধাতস্থ হল নীলকমল : 'তার জন্যে কান্না কিসের?' আবার চাকরের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন।

কিন্তু গিরিশের যেই কান্না সেই কান্না। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমার বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়, আমার খিড়কির বাগানের শশা খাবার তেষ্টা।'

সে তো আরো সহজ, হাতের মধ্যে। তার জন্যে কাঁদে কে? যা না, নিজেই যা না বাগানে। কচি-কচি কত শশা ফলে আছে, ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খা না যত চাস। তোর আকণ্ঠ তেষ্টা মেটা।'

'আমার অনেক শশা খাবার তেষ্টা নয়, একটা মাত্র শশা খাবার তেষ্টা।'

'বেশ তো একটাই খাবি!' হাসল নীলকমল।

'যেটাতে কুটো বাঁধা আছে সেটা খাব।' গিরিশ এতক্ষণে স্পষ্ট হল।

এবার নীলকমলের বউদি, গিরিশের জ্যাঠাইমা আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'তা কি করে হয়? ওটা আমি শ্রীধরের জন্যে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। গৃহদেবতার জিনিস ওকে দেবে কি করে?'

এতক্ষণে বুঝল নীলকমল, কেন দুরন্ত গিরিশ ক্ষুদ্র একটা শশার জন্যে তার দ্বারস্থ হয়েছে। তৃষিত হয়েছে।

গিরিশের মাথায় হাত রাখল নীলকমল। মিনতিভরা চোখে তাকাল বউদিদির দিকে। বললে, 'ও যখন চেয়েছে তখন ওটা ওই নিক। বালক যার জন্যে এত কাঁদছে শ্রীধর কি তা পারবেন খেতে? তাঁর তৃপ্তি হবে?' তারপর পুত্রকে একটু আদর করল নীলকমল! বললে অস্ফুটে, 'কে জানে এই আমার শ্রীধর কিনা।'

শ্রীমায়ের টিয়ে পাখির নাম গঙ্গারাম। লোহার খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে আর মা-মা বলে। আর কোনো নাম নেবে না, ধরবে না, শুধু মা-মা।

ঠাকুরের জন্যে নৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে, গঙ্গারাম মা-মা করে উঠল।

নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ তুলে নিলেন মা। তুলে নিয়ে হাত বাড়ালেন গঙ্গারামের দিকে। বললেন, 'গঙ্গারাম, খাও বাবা।'

ঠোঁট বাড়িয়ে গঙ্গারাম খেল সেই মোহনভোগ।

ভক্তের দল আপত্তি করল। 'পুজো হয়নি, আগেই গঙ্গারামকে হালুয়া দিলেন।'

স্নিগ্ধ হেসে মা বললেন, 'বাবা, ওর ভেতরেও ঠাকুর আছেন।'

তেমনি আমার গিরিশের মধ্যেও শ্রীধর আছে।

সেই বাপও মারা গেল যখন গিরিশের বয়স মোটে চৌদ্দ। মাথার উপরে রইল না কেউ অভিভাবক। গিরিশ বিপথে পা বাড়াল।

একটি ভ্রষ্টা মেয়ে মা-ঠাকরুনকে এসে বললে, 'মা, আমি কি পথ হারিয়েছি?' মা তাকে বললেন, 'মা, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।'

তাই গিরিশেরও পথ পাবার জন্যেই বিপথ।

বিদ্যালয়ী লেখাপড়াও বেশিদূর এগুলো না। বাপ মারা গেলে ইস্কুলে পড়া ছেড়ে দিল গিরিশ। কিন্তু না পড়লে, ইংরিজি না শিখলে চলবে কী করে? সবাই ধরাধরি করে গিরিশকে ঢুকিয়ে দিল ইস্কুলে। কিন্তু কোনো ইস্কুলই গিরিশের পছন্দ হল না। একটার পর একটা ছাড়তে লাগল পর-পর। কিছুতেই মতি যেন স্থির হবার নয়।

তখন গিরিশের বড়দি কৃষ্ণকিশোরী গিরিশের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বউ এটকিনসন টিলটন কোম্পানির বুক-কিপার নবীন সরকারের মেয়ে প্রমোদিনী।

মুরুব্বি হল নবীন। পাইকপাড়ার আধা সরকারী ইস্কুলে নতুন করে ভর্তি করিয়ে দিলে গিরিশকে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করতে পারল না গিরিশ।

আর ইস্কুলমুখো হল না। বিয়েতে কিছু টাকা এসেছিল হাতে, তাই দিয়ে ইংরিজি কবিতার বই ও নাটক কিনে আনল। ঘরে দরজা এঁটে বাঙলায় অনুবাদ করতে বসল। সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিতে পাশ করতে লাগে না।

গিরিশ থিয়েটারের দিকে ঝুঁকল।

প্রথমে নামল সধবার একাদশীতে, নিমচাঁদের পার্টে। নিমচাঁদ পাঁড় মাতাল, স্টেজে বোতল-বোতল মদ ওড়াবে, সেটাও এক আকর্ষণ।

মদের মত আর আছে কী।

মানুষকে জব্দ করবার জন্যে শোক তৈরি হয়েছে। আর শোককে জব্দ করবার জন্যে মদ।

'কিন্তু যাই বলো', গিরিশ বায়না ধরল : 'ভান করতে পারব না। সেই যে বোতলে লাল জল ভরে দেবে আর তাই খেয়ে স্টেজে মাতলামোর অভিনয় করব, এ অসম্ভব। বোতল-বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে বুকে সর্দি বসে মারা যাই আর কী। আসল জিনিস দিতে হবে।'

'তাই দেব।'

দীনবন্ধু মিত্তির স্বয়ং দেখতে এসেছেন থিয়েটার। নিমচাঁদকে দেখে একেবারে অভিভূত।

'তুমি না থাকলে এ নাটক হবে না।' গিরিশকে অভিনন্দন করলেন : 'মনে হচ্ছে নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্যে লেখা।'

সিমলে স্ট্রিটের সুরেন মিত্তিরও মদ খায়।

বলরাম বোসের বৈঠকখানায় ঠাকুরকে ঘিরে বসেছে অনেকে। গিরিশ আর সুরেন মিত্তিরও আছে।

সে কী! দু'জনেই টেনে এসেছে নাকি।

সুরেনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি আর কী! ইনি—' গিরিশকে ইঙ্গিত করলেন : 'ইনি তোমার চেয়েও—'

করজোড়ে সমর্থন জানাল সুরেন। বিনীত মুখে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি আমার বড়দা।'

সকলে হেসে উঠল সশব্দে।

॥ দুই ॥

'বলি হাঁ হে, তোমরা কাউকে ঘুমুতে দেবে না? যদি পাঁচজন মিলেছ তো শেয়ালের মত ডাক তুলেছ, চিক্কুড়ি না করলে কি তোমার হরি শুনতে পায় না?'

'কেন মশাই, আমরা কেবল হরিগুণগান করি বই তো না—' প্রতিবেশীদের অভিযোগের উত্তরে বললে মুকুন্দ।

'হরিগুণগান করো তো, গাধার মত চেঁচাও কেন?'

'সংকীর্তন করি।'

'কেন, মনে-মনে হরিনাম করলে হয় না? তোমরা যে সব নতুন শাস্ত্র করে তুললে হে। এত বদিয়াতী করলে লোক টেঁকতে পারবে কেন? তোমাদের দৌরাত্মিতে কি রাতদিন লোক ঘুমুবে না? আর কীর্তনের তো মাথামুণ্ডও কিছু বুঝতে পারি না—'প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে'—ও তো টপ্পাবাজি। এমন চেঁচামেচি করলে কিন্তু ভালো হবে না বাপু। মানুষ সমস্তদিন খেটেখুটে একটু আলিস্যি রাখবে, না অমনি ডাকাতপড়া চিৎকার—'

মুকুন্দ গান ধরল : 'আর ঘুমাও না মন। মায়াঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥'

তেড়ে গেল প্রতিবেশী : 'বলি তোমরা নেহাত বেহায়া। বলি, বৈষ্ণব হলে কি জেগে ঘুমোয়? 'ঘুমাও না মন, ঘুমাও না মন' করছ? আমি তোমাদের পরিষ্কার বলছি বাপু, নদেয় ও সব হবে না।'

'কী বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবে না তো কোথায় হবে?'

'আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি। গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে যাই। এর কি কোনো প্রতিকার নেই?'

প্রতিকার আছে। প্রতিকার জগাই-মাধাই।

'চৈতন্যলীলায়' জগাই স্বয়ং গিরিশ। আর মাধাই? মাধাই বুঝি দুকড়ি সেন।

দুকড়ি আবার গিরিশের বড়দা। মদ না পায় তো মেথিলেটেড স্পিরিট খেয়ে হজম করে।

'আজ তোকে আমি দিব্বি করে বলছি, এক-এক শালাকে ধরব আর এক-এক পাত্র গালে ঢেলে দেব।' জগাই বললে।

'আর আমি একখানা পাঁটার হাড় গুঁজে দেব।' পাল্‌টা ঝাড়ল মাধাই: 'শালারা ভোর দিন মালপো ঠুসছে আর চেল্লাচ্ছে।'

'চেল্লায় কেন জানিস? খিদে বাগিয়ে নিচ্ছে। ব্যাটারা হাড়িকাঠ দেখলে চোখে হাত দেয় আর কপালের উপর হাড়িকাঠ আঁকে।'

'তুইও যেমন। শালাদের সব ভণ্ডামি। লুকিয়ে শালারা সের-সের মদ খায়। ব্যাটারা বদমাইসের জাসু, এমন বিপরীত গানও কখনো শুনিনি।'

'আমি বলি, এক-এক শালাকে ধরি আর কামড়ে চাট করি।' জগাই টলতে টলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'ওই নিমাই পণ্ডিতটার কী ঠাওরালি বল দিকি। ওকে দলে নিতে পারবি? ব্যাটা তো বৈষ্ণবদের সঙ্গে লাগত, কিন্তু মদে বড় এগোয় না।'

'ভয় ভাঙেনি—এই রে, শালারা দোর দিয়েছে।' মাধাই হাত বাড়াল: 'দে, মদ দে।'

'গিল্লি আর পাব কোথা?'

'তবে কি তুই ভণ্ডামি করতে এলি?' মাধাই ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'চল মদ নিয়ে আসি—দোরে বমি করে দে যাব।'

গিরিশের বাড়িতে এসেছে দুকড়ি। এসেছে মদের লোভে।

মদের চাট মটর ভাজা। দুকড়ি তাকে বলে 'দোগ্ধ মটর'—ট্যাঁকে করে নিয়ে এসেছে একরাশ।

'সঙ্গে দোগ্ধ মটর আছে।' করুণ চোখে তাকাল দুকড়ি: 'এখন একটু মদিরা পেলেই দাহ মেটে।'

গিরিশ তাকিয়েও দেখল না।

'দে না বাবা ছিটেফোঁটা। কতক্ষণ খাইনি বল দিকি।'

'মদ নেই।' গম্ভীর মুখ গিরিশের।

'তোর ঘরে মদ নেই এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস? সত্যি, কেন ছলনা করছিস বল তো?' দুকড়ি অনুনয়ে কুঁকড়ে গেল: 'দে না মাইরি এক ঢোঁক। গলাটা কাঠ পুড়ে আঙ্গার হয়ে রয়েছে।'

'বলছি নেই।' ধমকে উঠল গিরিশ।

'গা ছুঁয়ে বল।'

'গা ছুঁয়ে বলছি।' একটু বুঝি বা দ্বিধা করল গিরিশ। বললে, 'তবে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে।'

'স্পিরিট?'

'মেথিলেটেড স্পিরিট। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্যে আনা হয়েছে।'

'দে, তাই সই। তাই খাব।' দুকড়ি লাফিয়ে উঠল।

গিরিশ গ্রাহ্য করল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ, সেখানে উপস্থিত ছিল, বোতলটা কুড়িয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাসে। জল মেশাল না, দুকড়ি নীট সাবাড় করলে। অম্লানমুখে চিবুতে লাগল দগ্ধ মটর।

'এ তুমি কী করলে?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ: 'ও প্রত্যক্ষ বিষ। লোকটা এখুনি মারা যাবে।'

বজ্রকণ্ঠে হেসে উঠল দুকড়ি। বললে, 'কচু যাবে। কিচ্ছু হবে না। ও আমি নিত্য খাই।'

'দ্যাখ ভাই ব্যাটাদের টিকিতে চালতা বেঁধে তাড়া দেব।' চৈতন্যলীলায় জগাই বলছে মাধাইকে।

মাধাই বললে, 'আমি ধরতে পারলেই শালাদের তিলক চেটে নেব। গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখী হয়েছে। কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে—নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ি জোটেনি।'

'তুই নিমাই পণ্ডিতের বে-তে গিয়েছিলি?'

'পাঁটার রোঁ গাছটা নেই, গিয়ে কী করব? আমি কলসী করে পাঁটার রক্ত ধরে রেখেছি, অদ্বৈতের বাড়ির দোরগোড়ায় ঢেলে দেব। ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিশে গেছে, আগে ওকে দেখলে পালাত। কী বাবা নেড়ানেড়ীর হেঙ্গাম এল নদেয়—'

'একদিন ছটাকখানেক মদ আর একখানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস? নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে-ঘরে তাড়া করি, বলি, তর্ক করো।'

'ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বিয়েতে দু'হাতে খরচ করেছে। এখনো বোধহয় পোঁতা আছে টাকা। দ্যাখ, বাড়িতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায়, হেউ-ঢেউ খেয়ে আসে।'

'চলনা একদিন রাত্রিতে গিয়ে পড়ি।'

'না রে, তার চেয়ে দলে নিয়ে নে, সব রকম চলবে। ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হয়েছে। এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু' কথায় থ বানিয়ে দিলে।'

এক ভট্টাচার্যের প্রবেশ। মাধাইয়ের ভাষায় 'টিকিদাস ভটচায।'

'ওহে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথা বলতে পারো?'

'নিমাই পণ্ডিত?' জগাই আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত—'

'সে যে আজ দুদিন মারা গিয়েছে।'

'মারা গিয়েছে?'

'আহা, বড় পন্ডিতই ছিল বটে। জ্বরবিকার হল, আর নাই!'

'সে কী?'

'আর সে কী!'

মশাই, আমার কী হবে? আমি পাপী, ঘোর পাপী। হেন পাপ নেই যা আমি করিনি। থিয়েটারে, নিজের ঘরে, গিরিশ অভিনয়ের শেষে নিয়ে এসেছে ঠাকুরকে।

'যে সর্বদা পাপ-পাপ করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'আপনি জানেন না—পাপের পাহাড় করেছি আমি।'

'পাহাড় করেছিস?' ঠাকুর হাসলেন : 'সে তো তুলোর পাহাড়। মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

'কী যে বলেন! আমি যেখানে বসি সে মাটি পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়—'

'সে কী! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আসে?' স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ঠাকুর : 'না, একেবারে দপ্ করে আলো হয়?'

দপ্ করে আলো হয়! আমিও আলো হয়ে উঠব! এ কখনো হয়, হতে পারে? যে 'চৈতন্যলীলা'র জগাই তার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর কি একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে?

'জগাই, তুই নাচছিস কেন?' জিগগেস করল মাধাই।

জগাই বললে, 'বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, 'হরি হে দেখা দাও।' মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস? প্রেমসে কহো ভগী ময়রানী, হরি হে দেখা দাও।'

'আচ্ছা, হরে কে সে শালা, জগা জানিস? আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকে। আমার বোধ হয় এক শালা মালপোওয়ালা, খিদে পেলেই ডাকে। আর, আহা, মালপো যা মোলাম বানায়, ঠিক যেন পাঁটার মাস। তুই যে ওদের মালপো চুরি করতে গেলি, ওদের ভাবটা কী বুঝলি?'

'চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়। দেখলি তো আমাদের চারখানা খেতেই কুপোকাত। ওরা রাধা বলে আর এক-এক ব্যাটা বিশখানা ওঠায়।'

'একশালাকে একদিনও বাগে পেলুম না—'

'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস।'

'দ্যাখ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনোদিন মাতাল দেখেছিস? তুই যেমন ছটাকে, আমি দু সের খেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'

'চল্ না, কেত্তন শোনা যাক গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, চাকুম চুকুম ভুশ ভুশ ভুশ।

'তুই বড় গান শোনানেওয়ালা!'

'ওরে, বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'

'তুই দেখছি বৈরাগী হবি।'

'তোর চোদ্দ দুগুণে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'

'ভেয়ের চোদ্দ পুরুষ তোলে শালা?'

'নে, রাগ করিসনি, মিষ্টি করে বললুম, মদ দেব তোর গাল ভরে, আয় ছুটে আয় হাঁ করে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে গিরিশ। ঘোড়ার গাড়ি করে এসেছে। টেনে এসেছে দু-এক পাত্র। কেমন টলছে দেখ না।

আর কিছু দেখছ না?

হ্যাঁ, কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে আসছে। ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে অঝোর চোখে কাঁদছে।

ঠাকুর সস্নেহে তার গা চাপড়ালেন। একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে একে তামাক খাওয়া।'

কতক্ষণ পরেই গাড়োয়ান ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে।

গিরিশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। দাঁড়াও, গাড়োয়ানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ, যাও শিগগির। সামলাও। মারবে না তো?'

অমানুষিক রাগ গিরিশের। আর মুখও খিস্তিখেউড়ের আঁস্তাকুড়।

না, ফিরে এসেছে গিরিশ। রাগদ্বেষ নেই, কটুকাটব্য নেই। শান্ত হয়ে বসেছে হাতজোড় করে। বলছে, 'ভগবান, আমাকে পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না মনে আসে।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি। তুমি তো আনন্দে আছ।'

'আজ্ঞে না, মন খারাপ—অশান্তি। তাই মদ খেলুম।'

'তা খা না।—কী হয় খেলে?' বললেন ঠাকুর। 'আমি যেমনই ছেলে হই, তিনি আমার আপন মা, আমাকে তিনি কোলে তুলে নেবেনই নেবেন। আশ্রয় না দিয়ে যাবেন কোথায়?' বলে গান ধরলেন :

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি—
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গোব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপানাদি বিনাশি নারী—
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥'

কিন্তু নিমাই চলে গেল সংসার ছেড়ে।

আর কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল মথুরায়।

বালক গিরিশ ঠাকুমার বুকের কাছটিতে শুয়ে কৃষ্ণের গল্প শুনছে।

মথুরার রাজা কংস বন্ধু অক্রূরকে বললে, তুমি রথ নিয়ে ব্রজধামে যাও, কৃষ্ণ আর বলরামকে ভুলিয়ে নিয়ে এস এখানে। দেবর্ষি নারদ বলে গেল ওদের হাতে নাকি আমার মৃত্যু হবে। দেখি কেমন ফলে ওর কথা। ধনুর্যজ্ঞ করব আর সেখানে ওদের নিমন্ত্রণ হয়েছে এই বলে ওদের নিয়ে এস। সভার দরজায় আমার হাতি কুবলয়াপীড়কে রাখব, যেই ওরা ঢুকতে যাবে অমনি শুঁড় দিয়ে তুলে মাটিতে আছড়ে মারবে। যদি তাতে না মরে আমার দুই কুস্তিগীর পালোয়ান আছে, চানূর আর মুষ্টিক, তারা ওদের অনায়াসে যমের বাড়ি পাঠাবে। যাও, রাজধানীর শোভা দেখবে, অন্তত এই বলে ওদের নিয়ে এস। দেখি ঋষিবাক্য ওলটাতে পারি কিনা।

বৃন্দাবনে এসে অক্রূর নন্দকে রাজার নিমন্ত্রণ জানাল। নন্দ বললে, উপায় কী, রাখতেই হবে নিমন্ত্রণ। কৃষ্ণ-বলরাম তো আহ্লাদে আটখানা।

কিন্তু ব্রজপুরের আর সকলে? গোপ-গোপী, রাখাল বালকেরা? ব্রজপুরের তরুলতা, ব্রজপুরের গোধন, ব্রজপুরের যমুনা? জননী যশোদা? তাদের কী দশা? তাদের নয়নের মণি কৃষ্ণ চলে যাচ্ছে, তারা এ বিচ্ছেদ সইবে কী করে? তারা সরবে-নীরবে কাঁদতে লাগল অঝোরে। 'ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, কানু কানু করি সুর।'

ধেনু-বেণু সব ভুলে গেল সাথীরা, ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরল, নিয়ে যেতে দেবে না কৃষ্ণকে। মেয়েরা পথের ধুলোয় শুয়ে পড়ল, যাবে তো রথের চাকায় আমাদের ধুলো করে দাও। গোপাল আমার, যাসনে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল যশোদা।

তবু চলে গেল রথ। কারু কান্নায় কান দিল না অক্রূর। নামে অক্রূর কিন্তু কাজে নিষ্ঠুরশ্রেষ্ঠ।

'আর কৃষ্ণ?' জিগগেস করল বালক : 'সেও শুনল না কারু কান্না?'

'শুনল না। শোনে না।' ঠাকুমা বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এত যারা তাকে ভালোবাসে তাদের ছেড়ে দিব্যি চলে গেল বিদেশে?'

'চলে গেল।'

'আবার তবে কবে ফিরে এল?'

'আর ফিরল না। কংসকে মেরে মথুরায় রাজা হয়ে বসল।'

'আর ফিরল না?' বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল গিরিশ।

'সে কী! ফিরল না বলে কাঁদছিস কেন?' ঠাকুমা প্রবোধ দিতে চাইল : 'তখন তার কত ঐশ্বর্য, কত সৌভাগ্য, সে ফেরে কী করে?'

'যে ফেরে না যে ছেড়ে চলে যায় তার কথা চাই না শুনতে।' কান্নাভরা মুখটা লুকোল বালক।

'না, এর পরে আরো কত কাণ্ড আছে। কৃষ্ণ-বলরাম কেমন মারবে সে হাতিকে, সেই দৈত্যকায় পালোয়ান দুটোকে, স্বয়ং কংসকে—' ঠাকুমা উৎসাহিত করতে চাইল।

'চাই না শুনতে। শুনে আমার দরকার নেই।' কানে আঙুল দিল গিরিশ।

গল্প ছেড়ে চলে গেল উঠে। কদিন আর ঠাকুমার সঙ্গই করল না। এমন কারু খবর দিতে পারো না যে ছেড়ে চলে যায় না কোনোদিন? ছেড়ে দিলেও আবার ফিরে আসে?

সেই তো গিরিশের আজীবন জিজ্ঞাসা। এমন কি কেউ নেই যে এমনিতে ছেড়ে তো যায়ই না, তাড়িয়ে দিলেও যায় না ত্যাগ করে?

চারদিকে তাকায় গিরিশ। না, কেউ নেই কিছুই নেই। শুধু অঙ্কের হিজি-বিজি। হিসেব মেলে না কোনোখানে।

শুধু এক এলোমেলো খামখেয়াল।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই গিরিশ নাস্তিক। আর সে-যুগে ঈশ্বর না মানাই প্রকাণ্ড পাণ্ডিত্য। কিছু আছে বলতে যাওয়াই তো নিজেকে ছোট করা। অহঙ্কারে মট-মট করছে গিরিশ। নিজেকে ছোট করবে কেন? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

'শালা!' পথে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়ে গাল দিয়ে উঠল গিরিশ।

লোক নেই জন নেই কারু সঙ্গে ঝগড়া-বচসা নেই, হঠাৎ কাকে দেখে তেতে-পুড়ে উঠল? পথের সঙ্গী সবিস্ময়ে বললে, 'সে কী রে, কাকে গালাগাল দিচ্ছিস?'

'ঐ যে, ওকে।'

'কাকে?' হাঁ হয়ে গেল বন্ধু। কোথাও একটা নিশ্বাস পর্যন্ত নেই।

'দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ যে ওটাকে।' ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করতে চাইল গিরিশ।

'ওটা তো একটা মন্দির।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বন্ধু।

'হ্যাঁ, মন্দির। ঐ মন্দিরে কে আছে?'

'যতদূর দেখতে পাচ্ছি শিবের মন্দির।'

'হ্যাঁ, ঐ শালা শিবকে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে হাতে পেচ্ছাপ করে বিশ্বনাথের মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিল ঠিক করেছিল।'

'ছি ছি, ছি ছি,' ধিক্কার দিয়ে উঠল বন্ধু: 'তোর এই মতিগতি?'

'হ্যাঁ এই মতিগতি। শালা পুজো খাবার আর বিষয় পেল না!' খিস্তি করে উঠল গিরিশ।

'দেখিস তোর কী হয়!'

'তাই তো চাই দেখতে। তোর শিব যদি সত্যি হয়, জাগ্রত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবে। এত বড় অপমান সে সইবে না মুখ বুজে।'

'দেখিস—'

'দেখেছি। এই কাঁচকলা করবে।' বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল গিরিশ।

কিছুই করল না। একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটল না। করবে কী করে? থাকলে তো করবে।

ক'দিন পরে আবার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

'কী রে, কিছু করল তোর শিব?'

'তার বয়ে গেছে। তার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কোথাকার কে কীটানু-কীট, দাসানুদাস, তাকে কী বললি না-বললি, তাতে সে অমনি খেপে যাবে, তক্ষুনি তোকে তাড়া করবে ত্রিশূল নিয়ে—'

হো হো হো করে হেসে উঠল গিরিশ। 'তার মানেই তো শিব বলে কেউ নেই কিছু নেই—'

নিঃসীম নিঃশিব।

একেবারেই কিছু নেই? তা কি হতে পারে? অন্তত আমি তো আছি। আমার থাকাটা কি থাকা নয়? আমি যদি আছি, তবে কে আমি?

কী বলেছিল সেদিন বাবা?

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার নৌকোয় বেড়াতে গিয়েছিল গিরিশ। নবদ্বীপের কাছে আসতেই মেঘ করে এল আকাশে। দেখতে দেখতে ঝড় ছুটল, নদীর জল ফুলে-ফুলে কালো হয়ে উঠল। দুলতে লাগল নৌকো।

ভয় পেয়ে বাবার হাত চেপে ধরল গিরিশ।

ডুবল বুঝি নৌকো!

কালী নদীতে অন্ধকারে চোখ বুজল নীলকমল।

কিন্তু, না, মাঝিরা সামলে নিয়েছে নৌকো। কালী নদী লক্ষ্মী হয়েছে।

নীলকমল গিরিশকে শুধোলেন, 'তখন তুই আমার হাত চেপে ধরেছিলি যে? নৌকো যদি ডুবত, ভেবেছিলি আমি তোকে বাঁচাতাম?'

বাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গিরিশ।

'ককখনো বাঁচাতাম না। তোকে আমি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে নিজে বাঁচতে চাইতাম। আমার কাছে তোর প্রাণ বড়, না, আমার নিজের প্রাণ বড়?'

চুপ করে রইল গিরিশ।

নিজেই উত্তর দিল নীলকমল। 'আমার নিজের প্রাণ। শোন, তোর বিপদের দিনে তুই নিজে ছাড়া তোর আর কেউ পরিত্রাতা নেই। হাত ধরবার লোক নেই ধারে-কাছে। তুই একাকী, তুই নিজেই তোর একলার উদ্ধারকর্তা।'

হ্যাঁ, আমিই আমার আছি। আমিই নিজেকে তুলব, নিজেকে বাঁচাব, নিজেকে উদ্ধার করব। উদ্ধরেদাত্মনা আত্মানম্। আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

হ্যাঁ, নিজেকে বিশ্বাস করো। আত্মবিশ্বাস। আশ্চর্য, এখানেও সেই বিশ্বাসের কথা।

কিন্তু কে আমি? নিজেকে যে বিশ্বাস করব, কী আছে আমার মধ্যে?

আমার মধ্যে আছে বৃহত্তম সত্তা, ইয়ত্তাহীন পরিচ্ছেদ, অপরিমেয় প্রতিশ্রুতি। আমি মহত্তম বলী, প্রদীপ্ততম সাধু, মধুমত্তম প্রিয়। নইলে নিজের কাছেই বা হাত পাতি কোন সাহসে?

তবে আমি—আমিই কি ঈশ্বর নই?

কিন্তু এ বলে আবার কোন্ কথা?

বলে, 'তুমি শুধু মার নামে বিশ্বাস করো। হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, হয়ে যাবে। শুদ্ধ বিশ্বাস।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর : 'শ্যামাধন কি সবাই পায়? কালীধন কি সবাই পায়? নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥'

গিরিশ হুঙ্কার করে উঠল : 'নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।'

গুণরহিত পুত্রে অধিক দয়া।

'প্রসীদ ত্বং মাতঃ, গুণরহিতপুত্রে অধিকদয়া। নিরালম্বো, লম্বোদরজননি, কং যামি শরণম্?'

কিন্তু মাকে যে বিশ্বাস করব সেই মা কোথায়? কোথায় তোমার সেই মাতৃমন্ত্রের প্রমিতা প্রতিমা?

যাকে স্বপ্নে দেখেছে ইনিই সেই মহিমময়ী। একটি মেয়ে শ্রীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'মা, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।'

মা হাসলেন। বললেন, 'হাত-পা ধুয়ে এস। এখুনি তোমাকে দীক্ষা দেব।' কল-ঘর দেখিয়ে দিলেন।

'কিন্তু মা, স্নান করিনি তো।'

'স্নান করতে লাগবে না।'

মেয়েটি তখন হাত-পা ধুয়ে এল। মা তাকে দীক্ষা দিলেন। বললেন 'এবার তবে দক্ষিণা দাও।'

দক্ষিণা? মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই তো আনিনি সঙ্গে করে। কী হবে!

মা তখন তার দু'হাত ভরে ফুল বেলপাতা কমলালেবু কুল তুলে দিলেন। বললেন, 'বলো, আমার পূর্বজন্মে, ইহজন্মে জানত অজানত যা কিছু পাপ-পুণ্য করেছি সব তোমাকে সমর্পণ করলুম।'

মেয়েটি তাই বলল। বলা হলে মা-ও সমস্ত ফুল-ফল হাত পেতে নিজে গ্রহণ করলেন।

বাস্তবে না হোক, স্বপ্নেও কি একটিবার দেখতে পাবে গিরিশ?

ছি, ছি, তার কাছে কি আসে? স্বপ্নেও আসে না। সে যে পতিত, লম্পট, সুরাসক্ত, সে যে আছে বারবিলাসিনীদের সঙ্গে।

॥ তিন ॥

ভগবতী গাঙ্গুলির বাড়িতে হাফ-আখড়াইয়ের বৈঠক বসেছে। চল শুনি গে।

ছেলেবেলা থেকেই গানে-বাজনায় আকর্ষণ। কোথায় যাত্রা হচ্ছে, পাঁচালি হচ্ছে, হচ্ছে কবির লড়াই, হাফ-আখড়াই, গিরিশ ছুটেছে সেখানে। কথকতাও বাদ দিচ্ছে না।

নারায়ণ দাসের যাত্রা শুনতে গিয়েছে গিরিশ। প্রহ্লাদকে বিষ খাওয়ানো হবে অথচ আসরে কোনো পাত্র নেই। অগত্যা, কি আর করা, বাজনদারের হাত

থেকে মন্দিরা কেড়ে নিয়ে সেটাকেই পাত্র বানানো হল। হেসে উঠল সকলে। কিন্তু যেই প্রহ্লাদ গান ধরল, 'দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি তায় কিছু হবে না, আমি মলে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণনাম কেউ লবে না।' তখন এক নিমেষে থেমে গেল পরিহাস। চকিতে হাজার-হাজার লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল, করুণায় আর্দ্র হয়ে কাঁদতে লাগল ভক্তিতে।

কতদিন আপনমনে গুনগুন করেছে গিরিশ : আমি মলে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণনাম কেউ লবে না, আর তার দুচোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

পাঁচালি কি পাঞ্চাল দেশ থেকে এসেছে? পাঞ্চালী থেকে কি পাঁচালি? কেউ বলে পাঁচমিশেলি থেকে পাঁচালি। কেউ বলে পা চালিয়ে আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গায় বলে পাঁচালি।

কিংবা বলো, পাঁচ-অঙ্গ বলে পাঁচালি। প্রথম অঙ্গ, পাদচারণা, ঘুরে ঘুরে পদগান ও ব্যাখ্যা; দ্বিতীয় অঙ্গ, ভাবকালি, হাতে মুখে চোখে স্বরে ভাবের সংকলন ও বিকাশ; তৃতীয় অঙ্গ, নাচাড়ি, নাচ গান আবৃত্তি; চতুর্থ অঙ্গ, বৈঠকী, বসে জমাট হয়ে রাগরাগিণীতে আলাপ; আর পঞ্চম অঙ্গ, দাঁড়াকবি, সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের দাঁড়িয়ে সমবেত সঙ্গীত।

তারপর একই আসরে আসত আরেকদল—কাটানদারের দল। তারা একই বস্তু আরেক ভাবে গাইত, রসভঙ্গ করতে পারত না। যার পালা বা সংবাদ ভালো গাওয়া হত সেই বাহবা কুড়োত।

পরে দেখা গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেই বুঝি রস বেশি জমে। তাই সেই দাঁড়াকবি আর কাটানদারের থেকেই জন্মাল কবিগান।

আবার বাদ-প্রতিবাদ সুরু হলেই বুঝি বাদ পড়ে শোভনতা। দেখা দেয় খিস্তিখেউড়। আনন্দ এসে দাঁড়ায় হুল্লোড়ে। ভাষা অশ্রাব্যে।

পাঁচালি আর কবি মিশিয়ে দেখা দিল আখড়াই। আর তারই মাজাঘষা ভদ্র রূপ হাফ-আখড়াইয়ে।

এবার তবে কলকাতায় ভদ্র সমাজ দু দণ্ড বসতে পারো আসরে। উপভোগ করতে পারো।

কিন্তু গাঙুলি বাড়িতে আজ এত ভিড় কেন?

শুধু গান শুনতে? না। কোন একজনকে দেখতে। কে সে? কোথায় সে? 'ঐ যে।'

গিরিশ দেখল তাকিয়ে। সাদাসিধে পোশাকে একজন সাধারণ প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু, যাই বলো, মুখখানা হাসিভরা, আলোভরা।

'কে উনি?'

সে কী? ঈশ্বর গুপ্তকে চেন না?

বা, নাম শুনেছি বৈকি। সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর কত কবিতার টুকরো আমার মুখস্ত। তিনিই তো ঈশ্বরকে "হাবা বাবা" বলেছিলেন। "কহিতে না পার কথা, কি রাখি নাম, তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।" তা তিনি এখানে কেন?

তিনিও গান বাঁধবেন। তাই তো এ প্রচণ্ড ভিড়। এ উদাত্ত অভ্যর্থনা।

গিরিশের মনে বাসনা জাগল, আমিও কবি হব। পাব এমনি বিশুদ্ধ অভিনন্দন।

হাফ-আখড়াইয়ের আসরে পরে গিরিশও গানের বাঁধনদার হয়েছে আর ছড়ার লড়াইয়ে গুপ্ত-কবির মতই পেয়েছে সমাদর। কিন্তু হাফ-আখড়াইয়ের আসরে নয়, বাঙলা সাহিত্যের পুরো আখড়ার আসরে সে আসন পাবে না?

কত বড় সাহিত্যরথীদের যুগ সেটা। যখন গিরিশ ভূমিষ্ঠ হয়, ইংরিজি ১৮৪৪ সাল, তখন বঙ্কিম ছ বছরের বালক, দীনবন্ধু চোদ্দ বছরের কিশোর, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর আর ঈশ্বর গুপ্ত যথাক্রমে কুড়ি, চব্বিশ আর তেত্রিশ বছরের যুবক আর দাশরথি একচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়।

তারপর আবার সুরু হয়েছে যাত্রা—লোকা ধোপার যাত্রা! 'শ্রীমন্তের মশান' প্লে হচ্ছে। কোতোয়ালেরা শ্রীমন্তকে বেঁধে নিয়ে এসেছে আর শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করছে। শ্রীমন্তের শরীরে বন্ধন-পীড়নের কোনো চিহ্ন নেই, হাতে শুধু একটা লাল রুমাল জড়ানো। 'ডোঁক ব্যাটা ডোঁক' অর্থাৎ ডাক ব্যাটা চণ্ডীকে ডাক, বলে কোতোয়ালেরা হম্বি-তম্বি করছে। দর্শকদের কাছে হাসবার অনেক উপকরণ। কিন্তু শ্রীমন্ত যখন গান ধরল, 'কোথায় আছ মা শঙ্করি, পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন জ্বালায় জ্বলিয়া মরি,' তখন শ্রোতারা কেঁদে ভাসিয়ে দিল। লাল রুমালে ঢাকা বন্ধনজ্বালার তন্তুও দেখা যাচ্ছে না তবু কান্নায় গলে যেতে কারু বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। সকলের মুখেই শুধু এক কথা : লোকা কী গায়! কী গায় আমাদের লোকনাথ!

দৃশ্য নেই পট নেই সাজ নেই সজ্জা নেই, শুধু কল্পনার সাহায্যে উপভোগ—যাত্রা শোনে 'ফাত্‌রা' লোকে। দেখা দিল থিয়েটার। দেখা দিল পোশাক আর গয়নার চাকচিক্য, আলোর কারসাজি।

বেলগাছিয়ার বাগানে রামনারানের অনুবাদ, রত্নাবলি প্লে হচ্ছে। প্লের শেষে চারদিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আহা, মুক্তোর মালাগাছটা দেখেছ? দেখেছ আগুনের ঝলক? আর কী ফার্স্টক্লাশ পোশাক-আশাক!

গিরিশও দেখতে গিয়েছিল। বলছে, 'আগুন লেগেছে দেখে রাজা, গলায় তার মুক্তোর মালা, সাগরিকাকে রক্ষা করবার জন্যে ছুটেছে। এক রাজভক্ত এগোলেন তাকে বাধা দিতে। রাজা বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটল। মুক্তোর মালা ছিঁড়ে গেল, রাজা ফিরেও দেখল না। দেখ ব্যাপারখানা! কারু মুখে কাব্যের প্রশংসা নেই, অভিনয়ের প্রশংসা নেই, কোনো সরস পঙক্তির আবৃত্তি নেই—কেবল মুক্তোর মালা আর মুক্তোর মালা!—কেবল সাজসরঞ্জামের প্রশংসা।'

আজও বোধ হয় সেই দশা। কেবল স্টেজের উপর ট্রেনের হুস-হুস, বন্যার জলের খলবল, ঝড়বিদ্যুতের ঝনঝন!

কথকতাও করেছে গিরিশ।

'এটা আবার কোন আর্ট!' তার বন্ধুবান্ধবেরা কথকতায় উৎসাহী নয়।

শুধু পাঠ-আবৃত্তি নয়, ব্যাখ্যা-বর্ণনার মাঝে মাঝে সংগীত, হাবভাবভঙ্গি। জানো তো সোনামুখির গঙ্গাধর শিরোমণিই কথকতার প্রথম প্রবর্তক। আগে-আগে শুধু ভাগবতের পাঠ আর ব্যাখ্যা করত গঙ্গাধর। একদিন বেদীতে বসে পাঠ করতে গিয়ে দেখে শ্রোতা নেই। কী ব্যাপার? গ্রামে কোথায় রামায়ণ-গান হচ্ছে সেখানেই ভিড় করেছে সকলে। এই কথা? শিরোমণি ঘোষণা করল, সকলকে বলে দাও কাল এখানে আমি ভাগবত গান করব। আর যায় কোথা! শিরোমণি যেমন পণ্ডিত তেমনি গায়ক, আবার তেমনি তার সুললিত ভাষ্য। ব্যাখ্যা-বর্ণনা নেই কবিত্বরস নেই ভাষার ঔজ্জ্বল্য নেই, কে আর রামায়ণ-গান শোনে। কবিত্ব ছাড়া গান, পাণ্ডিত্য ছাড়া ব্যাখ্যা, লালিত্য ছাড়া বর্ণনা, সার-ছাড়া খোসাভুসি।

'কেদার চৌধুরীর বাড়িতে আমি ধ্রুবচরিত্র কথকতা করব।' গিরিশ বললে তার বন্ধুদের, 'তোরা যাস, দেখিস কেমন মাতাই সবাইকে।'

শুধু আগন্তুক দর্শকেরাই নয় বন্ধুর দলও অভিভূত হয়ে গেল। কত গুণই না ধরে আমাদের গিরিশ।

কিন্তু গিরিশের মনে সুখ নেই। শুধু হাফ-আখড়াইয়ে আর কথকতায় প্রাণ ভরছে না। আরো-আরো কী যেন সে বলতে চায়, লিখতে চায়, জানাতে চায় উচ্চঘোষে। হায়, বিদ্যেবুদ্ধি হল কই?

কালী বেদান্তীর বাপ রসিকচন্দ্র চন্দ্রের কাছে পড়েছে গিরিশ। পড়েছে তার ভাই অতুল আর তার সাকরেদ সুরেন মিত্তির। কালীকে বলছে একদিন গিরিশ, 'তোর বাপ গৌর আঢ্যদের স্কুলে পড়াত, আর সেই স্কুলেরই ছাত্র আমি।'

'কদিন আর পড়েছিলে?' মুখ টিপে হাসল কালী।

'তোর বাপের মার খেয়ে কার সাধ্যি সে ইস্কুলে পড়ে। উঃ বাপ রে, সে কী মার!'

'দুষ্টুর শিরোমণি ছিলে যে।'

'তা ছিলুম। তোর বাবা ক্লাসে ঢুকেই প্রথমে সুরু করতেন, যারা অলস আর অমনোযোগী তারা লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বোসো। বুঝতেই পাচ্ছিস—'

'লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে।'

'সে না হয় বসলাম। কিন্তু ক্লাসে বসাই যে কঠিন।'

'কেন?'

'বন্দী হয়ে অতক্ষণ বসে থাকা যায় চুপ করে? হাসল গিরিশ : 'একেবারে অলস আর উদাসীন হয়ে থাকা আরো শক্ত।'

'তা হলে কী করলে?'

'ইস্কুল ছেড়ে দিলাম।'

দমদমে কোন ইস্কুলে মাষ্টারি করত বলে যজ্ঞেশ্বর চন্দ্রের নাম হয়েছিল দমদম মাস্টার। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে প্রায়ই যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন দেবস্থানে রিক্ত হাতে যেতে নেই, তাই এক পয়সার বাতাসা নিয়ে

যায়। গরিব মাস্টার, এর বেশি আর সে পাবে কোথায়? কত ভক্ত কত কিছু নিয়ে আসত কিন্তু ঠাকুর সব ত্যাগ করে এই বাতাসাই চেয়ে খেতেন।

বরানগর মঠে যজ্ঞেশ্বরের আশ্রয় মিলেছে। সেখানে আর-আরদের সঙ্গে আছে কালী বেদান্তী, স্বামী অভেদানন্দ। একদিন বাজারের পথে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে হঠাৎ রসিকচন্দ্রের দেখা।

'কী হে দমদম মাস্টার, তোমাদের কালীর খবর কী?'

দাঁড়িয়ে পড়ল যজ্ঞেশ্বর।

'বলি, এখন সে কী করছে? তার কি creatorকে দেখা হল, না কি এখনো creation দেখেই ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

হতবাক যজ্ঞেশ্বর।

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি ব্যাটা কী ধার্মিক!' রাস্তার মাঝখানেই বললে রসিক, 'আমার এক ব্যাটা খৃস্টান, এক ব্যাটা সন্ন্যাসী, আর এক ব্যাটা আছে সেটাকে মুসলমান করে দেব।'

আর গিরিশের হাতে কিনা নাস্তিক্যের নিশান।

দুর্গাপূজার আগের দিন কারা উঠোনে প্রতিমা রেখে গেছে, দেখি গিরিশ কী করে। কী করেছে, একবার দেখ এসে সকালে।

সকাল হতেই প্রতিবেশীদের ভিড়।

গিরিশ মদে উন্মাদ হয়েছে। কালাপাহাড় সেজেছে। হাতে কুড়ুল নিয়েছে। অশ্রাব্য কোলাহল করতে-করতে নামছে নিচে। প্রতিমা টুকরো টুকরো করে ফেলব তবে আমার নাম। এক তাল মাটি সে কিনা দুর্গা। এক তাড়া খড় সে কিনা মহিষমর্দিণী।

দিদি কৃষ্ণকিশোরী চিৎকার করে উঠল : 'যাসনি যাসনি গিরিশ, সর্বনাশ করিসনি।'

মজা দেখতে এসেছিল বটে প্রতিবেশীরা কিন্তু গিরিশের এই মারমূর্তি দেখে হায়-হায় করে উঠল। কেউ বা চাইল ঠেকাতে। গিরিশের গায়ে তখন অসুরের বল, কার সাধ্য তার প্রতিরোধ করে। সমস্ত বাধা বন্যার সামনে খড়-কুটো হয়ে গেল।

প্রতিমার গায়ে কুড়ুলের কোপ বসাল গিরিশ। শতখণ্ড হয়ে গেল প্রতিমা। শুধু ভেঙেই গিরিশের শান্তি নেই। যদি টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয় কেউ, তার জন্যে সেগুলোকে সে মাটিতে গোর দিল। শিবঘরণী, আমাকে নিশ্চিন্ত করো, ঘুম যাও অন্ধকারে। আর জ্বালাতন করতে এস না।

রাত্রেই গিরিশের ধুম জ্বর হল।

কৃষ্ণকিশোরী ভয় পেয়ে গেল। বললে, 'দেখলি তো—'

হাসল গিরিশ, উড়িয়ে দিল। 'অনিয়ম করেছি, তাই জ্বর হয়েছে। এতে অত ঘাবড়াবার হয়েছে কী।'

মুখচোখ ভীষণ ফুলে উঠল দেখতে-দেখতে।

'অত মাথায় হাত দিয়ে বসবার মত কিছু হয়নি।' গিরিশ লঘু করবার চেষ্টা করল : 'শহরে ডাক্তার নেই? তাদের একজনকে ডাকো। আর ডাক্তারিতে যদি না কুলোয় তখন না হয় দেবীমাহাত্ম্য বিশ্বাস করা যাবে। বিশ্বাসই তো করতে চাই কিন্তু চারদিকে এত গরমিল কেন, কেন এত হিজিবিজি?'

মা, এই অবিশ্বাসীকে কৃপা করো। দুর্গার কাছে মানত করল কৃষ্ণ-কিশোরী—চার বছর তোমার পুজো দেব। তুমি আমার গিরিশের দোষ ধোরো না।

'তা দেখ, লোকেরই বা দোষ কী।' ব্রহ্মচারী বরদাকে বলছেন শ্রীমা, 'আমারও আগে-আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করতুম, ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারিনে। অনেক প্রার্থনা অনেক অশ্রুজলের পর তবে দোষ দেখাটা গেছে। বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, তোমার রূপটি বাঁকা মনটি সোজা—আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও। দেখ, মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ করো, অমনি তার মুখটি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি কজন দেখে? গুণটি দেখা চাই।'

রাঁধুনি বামনি এসে বললে, 'কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।'

মা বললেন, 'এত রাত্রে স্নান করে দরকার নেই। শুধু হাত পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ো।'

'তাতে কী হয়?'

'তবে গঙ্গাজল নাও।'

বামনির মন এতেও উঠল না। স্তব্ধ হয়ে রইল। তখন মা বললেন, 'তাহলে আমাকে স্পর্শ করো।'

গিরিশ কবে মার পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারবে?

কে মা? উপরালা য়্যাটকিনসনের চেয়ে কি কেউ প্রবলতর আছে? কলিং বেলএর শব্দের চেয়ে কি আছে কিছু মধুরতর?

কলিং বেলএ আঙুলের ঠোকর মেরে ঊর্ধ্বতন সাহেব ডাকছে নিম্নতন কেরানিকে। গিরিশ যখন নিম্নতন কেরানি তখন তাকেও সেই সম্ভাষণে অভ্যস্ত হতে হবে। এই এখন অফিসের নতুন রেওয়াজ।

গিরিশের উদ্দেশে বেজে উঠেছে ডাক-ঘণ্টা। গিরিশ কানেও তুলছে না। বাজুক না যতক্ষণ বাজাতে পারে। চঞ্চল হলে ক্রুদ্ধ হলেই তো গিরিশের হার।

এ কী বেয়াদবি! আগুন হয়ে সাহেব নিজে এসে ঢুকল গিরিশের ঘরে। এ কি, শুনতে পাও না ঘণ্টার শব্দ?

ঘণ্টার শব্দ তো কানে ঢুকছে, তা অস্বীকার করি কী করে?

তা হলে সাড়া দিচ্ছ না কেন?

ঘণ্টা যে আমাকেই ডাকছে তা বুঝি কী করে? ঘণ্টা তো আর গিরিশ-গিরিশ বলছে না।

'কি, জবাব দিচ্ছ না যে?' সাহেব হুমকে উঠল : 'কেন অবাধ্যতা করছ?'

গিরিশ গম্ভীর স্বরে বললে, 'দেখুন ঘণ্টার শব্দে উঠতে-বসতে অভ্যস্ত নই।'

'বটে?'

'না, নই। ঘণ্টা বাজিয়ে অধীনস্থ কর্মচারীকে ডাকা তাকে অপমান করা। আর যে কোনো কর্মচারীর অপমানই সেই অফিসের অপমান।' নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললে গিরিশ।

ব্যাপারটা উপরে গেল। কোম্পানি সিদ্ধান্ত করল গিরিশের আচরণই সঙ্গত হয়েছে। উঠে গেল কলিং বেল।

য়্যাটকিনসনদেরও নীলের কারবার।

দিনের বেলায়, রোদ্দুরে, আপিসের ছাদে নীল শুকোতে দেওয়া হয়। আপিস বন্ধ হবার আগে নীল মজুত হয় গুদামে।

সেদিন আকাশ দিব্যি পরিষ্কার দেখে ছাদের নীল ছাদেই পড়ে থাকল। গুদামে চালান করা হল না। বৃষ্টির যখন নামগন্ধ নেই তখন ছাদের নীল সম্পূর্ণ নিরাপদ। একরাতের তো মামলা।

কিন্তু, ভাগ্যের এমন রসিকতা, রাতের দিকে দিব্যি মেঘ করে এল। সন্দেহ নেই, কতক্ষণেই ঝরবে আকাশ ভেঙে। গিরিশের মনে পড়ল অফিসের ছাদের কথা। বৃষ্টি যদি নামে নীল রসাতলে যাবে। লালবাতি জ্বালাবে।

ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ছুটল গিরিশ। যাক নামেনি বৃষ্টি। ডবল মজুরিতে কুলি লাগিয়ে সমস্ত নীল তুলে দিল গুদামে। বাঁচিয়ে দিল কোম্পানিকে।

গিরিশকে লোক পাঠিয়ে সেলাম দিল য়্যাটকিনসন।

গিরিশ আসতেই বললে, 'এই লোহার সিন্দুক খুলে রেখেছি তোমার জন্যে, হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা টাকা তুলে নাও।'

'টাকা!' গিরিশ থমকে দাঁড়াল।

'প্রকাণ্ড লোকসান তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ কোম্পানির। কোম্পানি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চায়।'

'আমি যা করেছি তা এক কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর মর্যাদায়।' বললে গিরিশ, 'এতে টাকার কথা ওঠে না।'

সিন্দুকে হাত ঢোকাল না গিরিশ।

এত করেও কোম্পানিকে টেঁকানো গেল না। কোম্পানি লাটে উঠল। সব আসবাবপত্র নিলেম হয়ে গেল।

গিরিশ মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সে কি কোম্পানির শোকে? না, তার ঘরের যে টেবিলটা বিক্রি হয়েছে তার টানার মধ্যে ছিল তার ম্যাকবেথের অনুবাদ। আপিসের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এতদিন সে অনুবাদ করে এসেছে। কত পড়াশোনা করেছে লুকিয়ে। নিজে আর কত বই কিনতে পেরেছে। পড়বার লালসায় এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর হয়েছে পর্যন্ত।

সব ভুণ্ঠিনাশ হল! এখন কোথায় গিরিশ সে টেবিল খোঁজে! চোরাবাজারে টেবিল খুঁজে পেলেও ম্যাকবেথ আর পাবে না।

বাগবাজারে নতুন এক যাত্রার দল খুলেছে। দলের প্রধানদের মধ্যে গিরিশও একজন। কিন্তু প্লে হবে কী? প্লে হবে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা।

বেলগাছিয়ার বাগানে 'রত্নাবলি' দেখেছে মাইকেল। দুঃখ করে বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলছে, 'কী একটা নগণ্য নাটকের জন্যে কী অজস্র অর্থব্যয়! পাইকপাড়ার রাজাদের কি ভীমরতি ধরেছে!'

'কিন্তু আর বই কই?' বললে গৌরদাস। 'তবে কি বলো বিদ্যাসুন্দর করব? ভালো নাটক দাও, করে দিচ্ছি।'

'দাঁড়াও, আমি লিখব নাটক।'

কদিনের মধ্যেই মাইকেল লিখে আনল 'শর্মিষ্ঠা'।

গিরিশ যে যাত্রা করবে তাতে নতুন কখানা গান জুড়তে হবে।

সে যুগের নাম-করা বাঁধনদার প্রিয়মাধব মল্লিক। অনেক সাধ্যসাধনায়ও তাকে রাজি করানো গেল না। দরকার নেই, গিরিশ বললে, আমিই গান বাঁধব।

ওস্তাদ হিঙ্গুল খাঁ সুর বলে দিল আর তাই অনুসরণ করে গিরিশ গান বাঁধল : 'সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে। সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে।'

কিন্তু সখের যাত্রায় পুরোপুরি সুখ কই? গিরিশের বড় সাধ থিয়েটার করে। থিয়েটার ছাড়া তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ হবে কোথায় ?

কিন্তু থিয়েটার করতে যে অনেক খরচ। অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

'তা হলে সধবার একাদশী করি এস।' বললে গিরিশ, 'ওতে পোশাক পরিচ্ছদের খরচ নেই। দৃশ্যপটও সাদাসিধে।'

দলের নাম হল বাগবাজার য়্যামেচার থিয়েটার। আর প্রথম অভিনয় হল বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে।

সবাই প্রশংসায় উন্মুখর হয়ে উঠল। যেমন প্রশংসা নাট্যকারকে তেমনি নটকে, গিরিশকে। 'আর সব ভুলব, গিরিশের নিমচাঁদকে ভুলব না।'

নিমচাঁদ ভুলুক, কিন্তু গিরিশ যেন তার পিতৃতর্পণের তারিখটা না ভোলে।

পিতৃতর্পণে ফল কী? এখানে যদি আমি জল দিই তা হলে স্বর্গবাসী পিতা পান কী করে? এ জলে স্বর্গের তৃষ্ণার কী করে নিবারণ হয়? আর স্বর্গ কি এমনি কঠিন জায়গা যেখানে জল পাওয়া যায় না? তৃষ্ণানিরসনের ব্যবস্থা নেই সে আবার কেমনতর স্বর্গ!

বেশ তো, বিশ্বাস না করো, বাবাকে জল দিও না। যার শরীর নেই সে খায় কী করে? সুতরাং জল দিয়ে তর্পণ করা বিশুদ্ধ পাগলামি। উঠে পড়ো আসন ছেড়ে।

কি জানি কী আছে! গিরিশ পারল না উঠতে। তবু বাবা যদি একটু স্নিগ্ধ হন, তৃপ্ত হন, শান্ত হন তাঁকে স্মরণ করেছি বলে। কে জানে এ জল

হয়তো সেবাপ্রেমের নিদর্শন। যে ভালোবাসায় জলটুকু দিচ্ছি, জলের চেয়েও সেই ভালোবাসারই দাম বেশি। মরবার পরও বুঝি থেকে যায় এই ভালো-বাসার ইচ্ছা।

'আমার মা কোথায় গেলে?' কাশীতে শ্রীমা আছেন, একদিন হঠাৎ শুনতে পেলেন দূর থেকে কে গান গাইছে করুণ সুরে।

বারান্দায় এসে বসতেই একটি মেয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'এত দিনে তোমার দেখা পেলাম মা। আজ আমার কী আনন্দ কাকে বলি।'

'তুমি কে মা?'

'আমি তোমার এক অনাথিনী ভিখারিনী মেয়ে।'

'থাকো কোথায়?'

'অন্নপূর্ণার দরজায়, নয় দশাশ্বমেধ ঘাটে, নয়তো বেহারী বাবার মন্দিরের কাছে।'

'ভিক্ষেয় চলে তো মা?'

'খুব চলে তোমার আশীর্বাদে। তোমার জন্যে ভিক্ষেয়-পাওয়া এই পেয়ারাটি এনেছি। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা। তুমি নেবে?'

'নিশ্চয় নেব। তুমি দেবে আর আমি নেব না?' মা হাত বাড়িয়ে নিলেন পেয়ারাটি, মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'শুধু নেব না মা, আমি খাব এটি। জানো না ঠাকুর কী বলেছেন! বলেছেন ভিক্ষের জিনিস খুব পবিত্র।'

গিরিশ বলছে, 'আমার জীবন যদি ভিক্ষে করো মা, তাহলে আমার জীবনও এক নিমেষে পবিত্র হয়ে ওঠে।'

॥ চার ॥

মিস্টার জাস্টিস সিটনকার থিয়েটার দেখতে এসে গ্রিন-রুমে ঢুকে পড়েছেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' অভিনীত হচ্ছে। প্রশংসায় সারা শহর সরগরম। সেই গরম হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁচেছে। স্বয়ং হুজুরকে এনে হাজির করেছে থিয়েটারে।

কিন্তু কী কেলেঙ্কার, সাহেব ভুল করে সাজঘরে ঢুকে পড়েছে।

'মাই গাড্! জেনানা! জেনানা!' মিস্টার জাস্টিস থমকে গেলেন। যে মেয়েটি সাজগোজ করে বসে আছে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আই বেগ ইয়োর পার্ডন—'

মেয়েটি লজ্জার প্রতিমা হ'য়ে মধুর মৃদুরেখায় হাসল।

মিস্টার জাস্টিসের বিচারে লিঙ্গভুল হয়েছে। আদালতে সর্বত্রই কুয়াশা, আদ্যোপান্ত ছদ্মবেশ। ছদ্ম ভেদ করতে পারেননি বিচারক। যে নির্দোষ

মেয়ে সেজে বসে আছে, হাসছে মৃদু-মৃদু, সে আসলে জেনানা নয়, সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহেব পালাবার পথ পায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণও ভুল করে ঢুকে পড়েছেন সাজঘরে।

স্টারে 'দক্ষযজ্ঞ' দেখতে এসেছেন। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সে পথ দিয়ে সটান চলে এসেছেন মেয়ে-মহলে।

যে মেয়েগুলো সাজছিল-গুজছিলো, হই-চই ক'রে উঠল।

ঠাকুর এতটুকু ভড়কালেন না, পিছু হটলেন না। বললেন, 'ওগো, গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

'কে তুমি?' মুখিয়ে উঠল মেয়েরা।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছে।'

কেউ কিছু জানল না বুঝল না, গিরিশের কাছে নালিশ করতে ছুটল।

পড়ি-মরি করে ছুটে এল গিরিশ। এসেই ঠাকুরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। সকলের চক্ষুস্থির, কোথাকার কে এক আলাভোলা লোক, তাকেই কিনা গণ্যমান্য গিরিশ এমন অঢেল প্রণাম করছে।

'ওঠো গো, ওঠো।' ঠাকুর গিরিশকে তুলতে গেলেন হাতে ধরে : 'জামায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল না, ময়লা গেল!' গিরিশ উঠে মেয়েদের লক্ষ্য করে উচ্ছ্বসিত হল : 'তোরা দাঁড়িয়ে থেকে কী করছিস! পায়ে লুটিয়ে পড়, লুটিয়ে পড়। সবাইকে ডাক। দেখতে পাচ্ছিস না কে এসেছে—'

তবু বুঝি দ্বিধা যায় না মেয়েদের।

'ওরে ঠাকুর এসেছে। তোদের মহাভাগ্য, উনি পথ ভুলে তোদের ঘরে চলে এসেছেন।' গিরিশ উদাত্ত স্বরে উদ্বেল হ'য়ে উঠল : 'ওরে, এমন সুযোগ আর পাবি নে—'

সকলে সাজগোজ ফেলে ছুটে এল। নিষ্কুণ্ঠে প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

'ওঠো গো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' বরদ হাতে আশীর্বাদ করলেন ঠাকুর : 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বাস করো এই আনন্দে। যাও সাজগোজ করে তৈরি হও গে—'

মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের পার্টে প্রথম স্ত্রীলোক আমদানি হল।

তার আগে পর্যন্ত পুরুষরাই শরীরের অনেক কারচুপি ঘটিয়ে মেয়ে সেজে এসেছে। পানের থেকে একবিন্দু চুন খসে নি এমন হুবহু তাদের সাজপাট, হাঁটাচলা, হেলা-দোলা। এমন ওজনকরা ঢঙ-ঢাঙ। কে বললে কোনো ছলনা আছে। একেবারে যথাবৎ।

'নব-নাটকে' জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর নটী, সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলি বড় বউ, অমৃত-লাল গাঙ্গুলি ছোট বউ।

'এ কী ভয়ানক!' প্রতিবেশী চাটুজ্জেমশাই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন : 'বাড়ির মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দিন কাল কী হল! কোথায় চলেছি আমরা!'

কে একজন জান্তা লোক আশ্বাস দিতে এল। বললে, 'ওরা আসলে যা ভাবছেন তা নয়।'

'তা নয়? তুমি বললেই হবে?' প্রতিবেশী ক্ষিপ্ততর হল : 'গেল, গেল, সব গেল। সমাজের মান-সম্ভ্রম কিছু রইল না।'

'মিছিমিছি কেন উতলা হচ্ছেন? ওরা মেয়ে নয়। ওরা মরীচিকা। কটা ছোকরা থিয়েটারে মেয়ে সেজে নেমেছে। তারাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে।'

'তুমি বললেই হবে? আমি দেখিনি স্বচক্ষে? আমি মেয়েমানুষ চিনি না?'

বেঙ্গল থিয়েটারের ভার নিয়েছে শরৎ ঘোষ। একটা পরামর্শদাতা কমিটি বসিয়েছে। তাতে আছে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, উমেশ দত্ত, আরো অনেক কেষ্টবিষ্টু। শরৎ ঘোষকে মাইকেল বললে, 'যদি সত্যিকার থিয়েটার খুলতে চাও মেয়ের পার্টে মেয়ে নামাও। পুরুষ দিয়ে স্ত্রীলোকের পার্ট করালে অভিনয় জমবে না কিছুতেই। কখনোই পারে না জমতে। এ স্বতঃসিদ্ধ।'

বিদ্যাসাগর নারাজ। সমাজ তাহ'লে উচ্ছন্নে যাবে।

শেষ পর্যন্ত মাইকেলের প্রস্তাবই গৃহীত হল। চারজন স্ত্রীলোক ভর্তি হল থিয়েটারে। স্বভাবশ্রীতে পাদপ্রদীপের আলোকে নটনাথকে প্রথম বন্দনা জানাল।

সেই অগ্রবর্তিনী কে কে? জগত্তারিণী, এলোকেশী, শ্যামা আর গোলাপ।

আর এই গোলাপই পরে বেঙ্গল ছেড়ে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করল। সেই থেকেই তার নাম দাঁড়িয়ে গেল সুকুমারী। আর সংগে অভিনয় করছিল যে গোষ্ঠবিহারী দত্ত, সেই সহ-অভিনেতাকে বিয়ে করে বসল। সেদিক থেকেও গোলাপ প্রথমতমা।

সেই থেকে ছড়া তৈরি হল :

আমি শখের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রী-পুরুষে এক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে—

কিন্তু বিদ্যাসাগর থিয়েটারের সংশ্রব ছেড়ে দিলেন এক বাক্যে।

শুধু তাই নয়, তাঁর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ভোলানাথ বসুকে তাড়িয়ে দিলেন স্কুল থেকে।

'তোমার মত ছাত্রকে রাখতে পারব না স্কুলে। তুমি চলে যাও।'

অপরাধ?

'তুমি ঠাকুর-বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর নাটকে বিদ্যা সেজেছিলে। রত্নাবলিতেও তুমি সখী সাজো।'

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা কী? পালা 'বিদ্যাসুন্দর'। শেষ রাত্রে আরম্ভ হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে

এসে ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনেছেন।

যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছে তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। তাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তা হ'লে চেষ্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

'বলেন কী! আমি তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। আমার পক্ষেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব?' ছোকরা অবাক মানল।

'নিশ্চয়ই সম্ভব। কত অভ্যেস করেই না গাইতে-বাজাতে শিখেছ। সেই অভ্যাসযোগেই হবে ঈশ্বরলাভ।' ঠাকুর তাকালেন ছোকরার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটা কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যেই হলো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত আর!'

হেসে উঠল সকলে।

'সংসারে সুখ তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে : 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কী ক'রে!'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে, তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরসত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছাপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

গিরিশ মদ আগেই ধরেছে, এবার ধরল রঙ্গমঞ্চের রঙ্গিনীদের।

'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ গিরিশ ঘোষ আর অটল নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে।' বলছে নিমচাঁদ, 'ব্রাণ্ডির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি রাইম করতে চাও তো মদ খাও।'

সুরাপান-নিবারণী সভা হয়েছে শুনে নিমচাঁদ বলছে, 'ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয়, আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব, এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—'

গিরিশে-নগেনে মতান্তর হল। গিরিশ দল ছেড়ে দিল। গিরিশকে বাদ দিয়েই 'লীলাবতী' উঠল রিহার্সেলে।

আখড়া খরচ চালাতে লাগল গোবিন্দ গাঙ্গুলি। সে না হয় হল, কিন্তু অভিনয় হয় কোথায়? স্টেজ-খরচ, পোশাক-খরচ, সঙ্গ-অনুষঙ্গের খরচ—এ সব আসে কোত্থেকে? এক কাজ করা যাক। টিকিট বেচে অভিনয় করি এসো।

তারপর সে টাকায় স্থায়ী স্টেজ বাঁধি! তারপর একবার নিজেদের স্টেজ হলে কে আর পায় আমাদের!

কিন্তু দলে গিরিশ ঘোষ না থাকলে কে গাঁটের পয়সা খরচ করে আসবে থিয়েটার দেখতে!' সুতরাং চলো যাই গিরিশকে ডেকে আনি।

ঝগড়া বেশিদিন মনের মধ্যে পুষে রাখবে গিরিশ তেমনি ক্ষুদ্রচেতা নয়। নগেনের বাড়িতে 'লীলাবতী'র ড্রেস-রিহার্সেল হচ্ছে, চলো যাই বলতেই সেখানে হাজির হল। কিন্তু, যে যাই বলুক, টিকিট বেচে থিয়েটার করতে সে রাজি নয়। লোকের কাছ থেকে পয়সা নেব, অথচ থিয়েটারের ভালো ঘর-বাড়ি নেই, পাকা স্টেজ নেই, সে ভারি বিশ্রী দেখাবে। তার চেয়ে চাঁদা তোলা ভালো। মাইকেলেরও সেই কথা। পাঁচ হাজার টাকা উঠলেই শুরু করে দেয়া যায়।

চাঁদার খাতা নিয়ে, যেমন রেওয়াজ, বড়লোকদের বাড়িতে যাওয়া হল।

'কি, ফুর্তির পয়সায় কম পড়েছে বুঝি?' টিপ্পনী কাটল কেউ-কেউ : 'আজকাল তো শুধু মদ নয়, আজকাল আমোদ!'

আরে, ছি, বড়লোকের কাছে কেউ হাত পাতে? গরীব গৃহস্থেরা যা দেয় সেই রাই কুড়িয়েই বেল হবে।

হল না। মোটে আড়াইশো টাকা উঠল।

চাঁদা তুলে হবে না। টিকিট বেচেই আয় করতে হবে।

কিন্তু গিরিশের ঐ এক গোঁ—টিকিট বেচা চলবে না। ঢাল নেই তলোয়ার নেই, সেই নিধিরামকে দেখিয়ে কে বলবে ট্যাক্সো দাও। এ যেন বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর। আগে উপযুক্ত বাড়ি-ঘর করো, সাজসরঞ্জাম আনো, তারপর টিকিট বেচ।

কিন্তু ওদিকে চুঁচুড়ার দল 'লীলাবতী' প্লে ক'রে বসেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বঙ্কিম আর অক্ষয় সরকার।

তা হোক গে, তবু চুঁচুড়ার কাছে বাগবাজার হার মানবে না।

'কিছুতেই না', শ্যামবাজারের রাজেন পাল বললে, 'আমার বাড়ির উঠোনে নাট্যমঞ্চ বাঁধা হোক।'

দীনবন্ধু হাসলেন। অর্ধেন্দুকে বললেন, 'তোমরা পারবে না।'

'পারব না?' প্রায় আস্তিন গুটোল অর্ধেন্দু।

'কী ক'রে পারবে? আমার লীলাবতীতে বঙ্কিম আর অক্ষয় কলম চালিয়েছে।'

'বলেন কী! আপনি সহ্য করলেন?'

'একেকটি শব্দ কেটেছে আর আমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছে।'

বললেন দীনবন্ধু, 'কিন্তু কী করব বলো, বঙ্কিম ভাই আর অক্ষয় ছেলে—ওদের ভালোবাসি বলে আমার শরীরে জ্বালা লাগেনি—'

'ভয় নেই, আমরা অক্ষত রেখেই করব।'

'তোমরা পারবে না।' অনুকম্পার হাসি হাসলেন দীনবন্ধু।

'পারব না? আবার সেই কথা? চলো যাই গিরিশের কাছে।' অর্ধেন্দুর

সঙ্গে নগেনও সুর মেলাল।

পা মেলাল ধর্মদাস সুর, গোবিন্দ গাঙ্গুলি। সবাই একযোগে ধন্না দিল গিরিশের বাড়ি। 'তোমাকে নামতেই হবে লীলাবতীতে। চুঁচুড়ার কাছে বাগবাজার হেরে যাবে—এ তোমাকে বসে-বসে দেখতে দেওয়া হবে না। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ—'

সপ্রশ্ন চোখে তাকাল গিরিশ।

'হ্যাঁ, তোমার কথাই থাকবে! টিকিট বেচা হবে না।'

গিরিশ নামল 'লীলাবতী'তে। ললিতমোহনের ভূমিকায়।

গিরিশের ছোঁয়া লেগেছে, দারুণ জমে গেল অভিনয়। বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন পালের বাড়ির উঠোনে স্টেজ বাঁধা হয়েছে, দর্শকদের আসর খোলা মাঠে। কারুর থেকে পয়সা নিই নি, কিছু বলতে পারো না। কাল-বোশেখীর ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল, সকলে ভিজে গেল—তা আমাদের দোষ কী! কিন্তু কী আশ্চর্য, কেউ জায়গা ছেড়ে পালাল না। সিক্তগাত্রে বসে রইল শেষ পর্যন্ত।

নাট্যকার স্বয়ং ছিলেন উপস্থিত। গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল? ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড নাটকের একটি কথাও বাদ দিইনি আমরা—'

দীনবন্ধু সাহ্লাদে বললেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে চুঁচুড়ার দলের তুলনাই হয় না। আমি এবার চিঠি লিখব বঙ্কিমকে, দুয়ো বঙ্কিম!'

যেমন তোমার নিমচাঁদ, তেমনি ললিতমোহন।

'মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথম দেখিল বঙ্গ নবনটগুরু তার।'

'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?' অশ্বিনী দত্তকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?'

'হ্যাঁ গো, থিয়েটার করে।'

'দেখিনি কখনো। নাম শুনেছি।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি?' অশ্বিনীর মুখে বুঝি কটা রেখা ফুটল অসরল। উদার মমতায় ঠাকুর বললেন, 'তা খাক না! খাক না! কতদিন খাবে?'

মদের চেয়েও দুর্মদ কি কিছু নেই? যে নারী দুষ্কৃতাগ্নিশিখা, সে কি মূর্তিমতী ভক্তি হয়ে যেতে পারে না?

সার্কাসে টানা তারের উপর দিয়ে যাতায়াত দেখেছ? তাই তো মহাযান। অবলীলায় কাম থেকে প্রেমে চলে আসা। আর যদি একবার প্রেমে ধরে তখন কামও প্রেম।

'আমি প্রেমে মত্ত হয়েছি—আমাকে সাবধান করা বৃথা।' এ হুঙ্কার গিরিশের হুঙ্কার।

লীলাবতীর সাফল্যে কর্তারা আবার চঞ্চল হল, টিকিট বেচেই নাট্যশালা তৈরি হোক। আর তার নাম হোক ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

কানা পুতের নাম পদ্মলোচন। গিরিশ আবার ঘাড় বেঁকাল। দৈন্যকে জাতীয় পোশাক করে দেখিও না জগতকে। আগে পালোয়ান হও, পরে কুস্তি করো।

কুস্তি করতে-করতেই পালোয়ান হব।

গিরিশের সঙ্গে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। গিরিশ দল ছাড়বে, কিন্তু মত ছাড়বে না।

ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে 'নীল দর্পণে'র মহলা বসল। পরে প্লে হল চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের উঠোন ভাড়া করে। ব্যোম ভোলানাথ, প্রথম রাত্রেই দুশো টাকার টিকিট বিক্রি!

গিরিশ ভাবের দোরে নিদারুণ আঘাত পেল। তার মনে জাতীয় মর্যাদা-জ্ঞান ছিল, নাটক ও অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-ঔজ্জ্বল্যের একটি স্থির পরিকল্পনা ছিল—সব যেন ভেঙে গেল নিমেষে। এই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের চেহারা!

গিরিশ গান বাঁধল। যারা যারা ছিল ন্যাশন্যালে তাদের নাম ধরে ব্যঙ্গ করে। বাগবাজারে শখের যাত্রায় 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' হচ্ছে, সেখানে সঙ দিয়েছে—সাপুড়ে ও বাউল। রাধামাধব কর বাউল সেজে সেই গান গাইছে :

'লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধার।
তাতে পূর্ণ অর্ধ ইন্দুকিরণ
সিঁদুর মাখা মতির হার॥
নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণা কায়
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা;
মিছে করে আশা যত চাষা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার!
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিনে খসে—
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥'

'ওহে, গিরিশ তোমাদের ধোলাই দিয়েছে।' অমৃত বসুকে বললে এসে একজন, 'কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে। তোমাদের গালাগাল দিয়ে গান বেঁধেছে।'

'কই দেখি।'

গান পড়ে অমৃত ভীষণ খুশি। সকলে খুশি। এস বাগবাজারের ঘাটে বসে সকলে মিলে গাই গলা খুলে। যদি পারো তো গিরিশ ঘোষকেও ডেকে আনো। উনি আমাদের গুরু, উনি নিজের কানে শুনে যান।

গিরিশের কানে গেল, যাদের লক্ষ্য করে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তারাই সানন্দে সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে। ও কথা শুনে গিরিশের ভাবান্তর হল। মতান্তর আর মনান্তরে গিয়ে দাঁড়াল না।

ন্যাশন্যালের 'নীলদর্পণে' দীনবন্ধু খুশি নয়। বললেন, 'সবই আছে, শুধু একজনই নেই। যে সিরিয়াস পার্টের য়্যাকটর সেই অনুপস্থিত।'

অন্য আভরণে কী হবে মাথার মুকুটই খোয়া গেছে।

তারপর যখন ন্যাশন্যাল মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ধরল, সমস্যা জাগল ভীমসিংহের পার্ট কে করে?

উপায় নেই, চলো যাই গিরিশের কাছে। গলবস্ত্রে দ্বারস্থ হই।

গিরিশের সমস্ত অভিমান ভেসে গেল। হ্যাঁ, সে সাজবে ভীম সিং। কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে পারবে না। লিখবে, এ ডিস্টিনগুইস্‌ড য়্যামেচার।

তথাস্তু।

মাইকেল নিজে উপস্থিত ছিল সে অভিনয়ে। গিরিশকে প্রাণঢালা প্রশংসা করল। আর নাটোরের মহারাজা গিরিশকে স্বহস্তে নিজের রাজবেশ পরিয়ে দিলেন, কোমরে ঝুলিয়ে দিলেন নিজের তলোয়ার।

কিন্তু কদিন পরেই উঠে গেল ন্যাশন্যাল। অর্থই অনর্থ হয়ে উঠল। ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হল রাগারাগি।

তাই বলে জনসাধারণকে তা জানতে দেওয়া কেন? শেষ অভিনয়ের রাত্রে যে বিদায়ের গান গাওয়া হল তাও গিরিশের লেখা।

'কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
নির্মাইয়ে নাট্যালয়
আরম্ভিলে অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয় এ মিনতি পায়॥'

কে এক রাত-ভিখারি রামপ্রসাদের গান গেয়ে চলেছে : 'গেল দিন মিছে রঙ্গরসে। আমি কাজ হারালাম কালের বশে।'

গিরিশ তাকে ডাকিয়ে আনল। তিন-চারটি গান শুনল। পয়সা দিল।

শরৎ মহারাজকে বললে, 'জানো শরৎ, এই রামপ্রসাদী পদ এমন তেজী ভাবের যে মনের আর কোনো খোঁচখাঁচ থাকে না, মনটাকে একবারে সিধে চোস্ত করে দেয়।'

দুপুরবেলা কে এক জটাধারী সন্ন্যাসী এসে বসেছে ঠাকুরদালানে। হাতে চিমটে, গায়ে ছাইমাখা। প্রথমেই চুপিচুপি ঝিকে ডেকে ভাব করল, তার থেকে বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিল। যাও এবার বাড়ির ভিতর গিয়ে বলো গণৎকার এসেছে।

অন্দরে ঢুকে ঝি রব তুললে। ওগো হাত দেখাবে এস। ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী এসেছে।

সন্ন্যাসীর সামনে কুলবধূদের পর্দা নেই। তার হাত দেখাবার জন্যে সব সময়েই তারা প্রসারিত। হাত দেখছে আর পট পট করে বলে দিচ্ছে সন্ন্যাসী।

বৈঠকখানা ঘরে দরজা ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে সব দেখছিল গিরিশ। রাগে সারা গা রি-রি করে উঠল। ছুটে বেরিয়ে এসে ঠাকুরদালানের সামনের করবী গাছের একটা ডাল ছিঁড়ে নিয়ে তেড়ে গেল সন্ন্যাসীকে। গলি দিয়ে পালাতে চাইল সন্ন্যাসী, এই মারে তো সেই মারে—শালা ঝিয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে বিদ্যে ফলাতে বসেছে!

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশের তর্ক লেগেছে।

তর্কের মাঝপথেই গালাগাল।

'থাম শালা। ভিখিরি সন্ন্যাসী।' হুমকে উঠল গিরিশ।

'যা শালা ভাঁড়!' পালটা গর্জাল নরেন : 'তুই শালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শালা কি ব্রেন আছে?'

॥ পাঁচ ॥

ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে গিয়ে দু'ভাগ হল। এক ভাগে গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র বোস, ধর্মদাস সুর, আরেক ভাগে অর্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃত বোস, নগেন বাঁড়ুয্যে। প্রথম দলের নাম ন্যাশনাল-ই থাকল, দ্বিতীয় দল নাম নিল হিন্দু ন্যাশনাল।

যা পরে 'মেয়ো হসপিটাল', তার ভিত্তিস্থাপন করল সেদিনের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক। হাঁসপাতালের জন্যে চাঁদা তোলার হিড়িক পড়ে গেল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন এক ইংরেজ ডাক্তার, মিস্টার ম্যাকনামারা, টাউন হল ভাড়া করে ডাকলেন ন্যাশনালকে। তোমরা প্লে করো। খরচখরচা বাদ দিয়ে যা বাঁচবে তা যাবে হসপিট্যাল ফাণ্ডে।

কী নাটক করব? কৃষ্ণকুমারী?

কৃষ্ণকুমারীর শোকে ভীমসিং যেখানে উন্মাদ হয়ে মানসিংহকে বধ করবার সংকল্প করছে সেই দৃশ্যটা গিরিশ কী দুর্দান্ত ভালো করত তা কেউ ভুলতে পারছে না। 'মানসিংহ—মানসিংহ—মানসিংহ—তাকে তো এখনই নষ্ট করব। আমি এই চললেম।' এই তো কটা কথা। কিন্তু এমনভাবে বলত গিরিশ, সবাই বিহ্বল হয়ে যেত। প্রথম 'মানসিংহে' গিরিশ যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে; দ্বিতীয় 'মানসিংহে' সে যেন দুর্ঘটনাটা অনুমান করতে পারছে; আর তৃতীয় 'মানসিংহে' তার হিংস্রগম্ভীর গর্জন, বাস্তবে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে ব্যভিচার।

এই তৃতীয় গর্জনে সামনের লাইনের ক'জন দর্শক ছিটকে পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

না, কৃষ্ণকুমারী নয়। ম্যাকনামারা বললে, নীলদর্পণ। উড সাজবে গিরিশ ঘোষ।

কিন্তু মুস্কিল হবে সৈরিন্ধ্রীকে নিয়ে। অভংগ ন্যাশনালে যখন অভিনয় হয়েছিল তখন সৈরিন্ধ্রী হয়েছিল অমৃতলাল। অমৃত তো এখন 'হিন্দু' হয়েছে। নতুন ন্যাশনালে সে এখন মৃত ছাড়া আর কী।

এগিয়ে এল ডাক্তার আর, জি, কর—রাধাগোবিন্দ কর। বললে, আমি সৈরিন্ধ্রী হব।

গিরিশই সবাইকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিল।

ভীষণ জমল অভিনয়। দর্শকেরা কখনো চেঁচাচ্ছে ক্রুদ্ধ হয়ে, কখনো হাত-তালির উল্লাসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঘরদোর। উডকে অনেকে গিরিশ বলে চিনতেই পারেনি। ভেবেছে ম্যাকনামারা কোত্থেকে এক বাংলা-জানা খাঁটি সাহেব জোগাড় করে এনেছে। দেখছ, কী হাবভাব, আদব-কায়দা, কেমন প্রবেশ-প্রস্থান! হুবহু সাহেবের মত।

দেওয়ান গোপীনাথ দাস বলছে স্বগত : 'লোকের সর্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়। শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ। এই যে আসছেন সাহেব।' তারপর নীলকর সাহেব উড এলে বলছে, 'হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহা মন্দ নয়, বেটা গোলোক বোসের পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে।'

উড বলছে, 'এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল। দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল; বলে, পুকুরের পাড়ে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে। আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।'

'ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।' বললে গোপীনাথ!

'মোকদ্দমা কিছু হইবে না। এ ম্যাজিস্ট্রেট বড় ভালো লোক আছে।' উড বলছে সবজান্তার মত : 'দেওয়ানী করিলেও পাঁচ বছোরেও মোকদ্দমা শেষ হবে না। ম্যাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত।' স্পর্ধাভরে হাসল বোধহয় উড।

সেই উড চরম চটেছে গোপীনাথের উপর। লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। বলছে : 'চপরাও ইউ ব্যাস্টার্ড অব হোরস বিচ। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা? শালা কাউয়ার্ড কায়েৎ বাচ্চা। ডেভিলিশ নিগার। এই তোম ক্যাওটকা মাফিক কাম ডেগা? জেলমে ভেজ দেগা টোমকো।'

উড চলে গেলে গা ঝাড়তে ঝাড়তে গোপীনাথ উঠল। বললে, 'সাত শো শকুনি মরে একটি নীলকরের দেওয়ান হয়। কি পদাঘাতই করেছে বাপ!'

দর্শকেরা চরম খেপেছে যখন চাষী তোরাপের বেশে মতিলাল সুর রোগ্-সাহেবের বেশে অবিনাশ করের গলা টিপে ধরেছে। বলছে, 'সুমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, বাক্যি হরে গিয়েছে। সুমুন্দির কি ইমান আছে যে ধরম

কথা শোনবে। ও যেমন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর—' বলে গালে-মাথায় বেদম চড় মারতে লাগল।

মার, মার শালাকে—সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে এমনি আত্মহারা হয়েছে দর্শকেরা।

ব্যারিস্টার উড্রোফ সাহেবের বাবু দীনদয়াল বোস লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে স্টেজের উপর। তোরাপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেও মারতে সুরু করেছে রোগ্‌কে।

রোগ্‌-এর উপরে রাগ কেন? রোগ্‌ মূর্তিমন্ত 'রোগ'—আকাট লম্পট। নীল-চাষীর মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে বেইজ্জত করতে নিয়ে এসেছে কুঠিতে। বলছে 'ডিয়ার, ডিয়ার, আইস, আইস—'

ক্ষেত্রমণি বলছে, 'ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, তুমি মোর বাবা। হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।'

'তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।' বলছে রোগ্‌, 'আমি কোনো কথায় ভুলিতে পারিনা, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।'

কেঁদে আকুল হচ্ছে ক্ষেত্রমণি। বলছে, 'মোর ছেলে মরে যাবে—দোহাই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে, মুই পোয়াতি।'

হেসে উঠল রোগ্‌ : 'তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।'

জানলার খড়খড়ি ভেঙে তোরাপ ঢুকল কামরায় আর রোগ্‌-এর উপর সুরু করল প্রহার। 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের। পাঁচদিন খাবালি, একদিন খা।'

দর্শকদের ভিতর থেকে দীনদয়াল ছুটে এসেছে স্টেজে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেও পিটছে রোগ্‌কে। হৈ হৈ কান্ড। আর এমন উত্তেজনা, আততায়ী দীনদয়ালই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

অমৃতলাল দেখতে এসেছিল সৈরিন্ধ্রী কেমন করে। দেখলে রাধাগোবিন্দ, ডাকনাম গোবি, খাসা উতরেছে। অমৃতের বিদ্রূপের চোখ ঈর্ষায় কষায় হয়ে উঠল।

ভীষণ জমেছে থিয়েটার। সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইংলিশম্যান লিখল, এমন অভিনয় শুধু একদিনের জন্যে?

এগারোশো টাকা উঠল টিকিট বেচে। চারশো খরচ বাবদ রেখে ম্যাকনামারার হাতে সাতশো দেওয়া হল।

দেখাদেখি হিন্দু-ন্যাশনাল লিন্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস ভাড়া করে করল শর্মিষ্ঠা। জমল না, টিকিট-বিক্রিও অকিঞ্চিৎ।

টাউন হল ছেড়ে ন্যাশনাল বা গিরিশের দল চলে এল রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে। বিজ্ঞাপন দিল, কপালকুন্ডলা হবে।

ভাগ্যের কী রসিকতা, অভিনয় আরম্ভ হবার ঠিক আগে দেখা গেল কপালকুন্ডলার খাতাখানি হারিয়ে গেছে। কী সর্বনাশ! খোঁজ, খোঁজ, খাতা কোথায় যাবে, খুঁজে বার কর শিগগির।

প্রায় ফুল-হাউস, এ সময় খাতা নেই? খাতা ছাড়া গেল হবে কী করে? কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দর্শকেরা টাকা ফেরত চাইবে। শুধু টিটকিরি করেই রেহাই দেবে না, ছুঁড়বে ইঁট-পাটকেল। আর বিকশিত দন্তে হাসবে শত্রুপক্ষ। হিন্দু-ন্যাশনাল।

তখন সবাই ধরল গিয়ে গিরিশকে : 'মশায়, উপায় করুন।'

রাজবাড়ির লাইব্রেরি থেকে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা বইখানা নিয়ে এস। আছে তো লাইব্রেরিতে? যদি থাকে, যদি পাও, তখন দেখা যাবে।

বই পাওয়া গেল।

গিরিশকে তখন পায় কে। বললে, 'কোনো ভয় নেই, বই দেখে-দেখে আমি প্রম্পট করে যাচ্ছি, তোমরা রঙ্গমঞ্চে বার হও।'

গিরিশের সে এক অসাধ্যসাধন। একমাত্র উপন্যাস আর ছাপানো প্রোগ্রাম তার অবলম্বন। তাই ধরে মুখে-মুখে দৃশ্যে ও চরিত্রে সামঞ্জস্য রেখে দিব্যি সে নাটক খাড়া করে দিল। পার করে দিল ঝোড়ো নদী। কেউ জানতেও পারল না, হাল-পাল-ছাড়া নৌকোর সে কী চেহারা।

এদিকে ন্যাশনালের সাফল্য দেখে আশুতোষ দেব ওরফে ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎ ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার খুলল আর অভিনেত্রীর আমদানিতে চারদিক সরগরম করে তুলল। বিহারীলাল চাটুজ্জে দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ দিলেন আর জলজ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে শরৎ ঘোষ জগৎ সিংহরূপে আবির্ভূত হল। রঙ্গমঞ্চে সত্যিকার ঘোড়া—ভেঙে পড়ল দর্শকের দল!

বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ আগাগোড়া মাটি দিয়ে তৈরি, মাঝখানে কয়েকখানা তক্তা—তারই জন্যে ঘোড়া নামানো সহজ ছিল। তাছাড়া শরৎ ঘোষ ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার। অভিনেত্রী বিনোদিনী বলছে, 'স্টেজে ঘোড়া বেরিয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়ার পায়ে হাত দিলেন, অমনি ঘোড়া শান্ত-শিষ্ট হয়ে গেল, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল; তিনি সেই ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের বাড়িতে একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় ঠাকুর-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তাঁর দিদিরা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল খেতে দিতেন ঘোড়াকে।'

পরে বিনোদিনীও পাদপীঠের আলোতে দাঁড়িয়েছে ঘোড়ায় চড়ে।

ন্যাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনাল দুই-ই গিয়েছিল ঢাকায়, দুই-ই হতোদ্যম হয়ে ফিরে এল স্বস্থানে। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় তার ছেলের অন্ন-প্রাশন উপলক্ষ্যে কলকাতায় লোক পাঠালেন থিয়েটার বায়না করতে।

ন্যাশনাল না হিন্দু-ন্যাশনাল কাকে বায়না করে, ফাঁপরে পড়ল আমমোক্তার। সেই সঙ্কটে দুই দল—হিন্দু আর অহিন্দু—একত্র হয়ে গেল। একত্র হয়ে গেল তারা দীঘাপতিয়ায়। সেখান থেকে রাজসাহী ও বহরমপুর হয়ে কলকাতা।

দলাদলি মিটে গেল। মিটমিট করতে-করতে নিবে গেল অতঃপর।

হিন্দু-ন্যাশনাল-এর নগেন আর শুধু-ন্যাশনাল-এর ধর্মদাস বেঙ্গল থিয়েটারে নাটক দেখতে এসেছে। সঙ্গে ধনাঢ্য জমিদারের ছেলে ভুবন নিয়োগী।

সেদিন থিয়েটারে এত ভিড় যে তারা চার টাকার টিকিট আট টাকায়ও কিনতে পেল না। নিজেদের অপদস্থ মনে হতে লাগল। এই কথা? ভুবন খেপে গিয়ে বললে, যত টাকা লাগে খোলো নতুন থিয়েটার। আনো চমকদার মেয়েমানুষ। নটী ভঙ্গি-পটীয়সী।

বিডন স্ট্রিটে মহেন্দ্র দাসের জমি চল্লিশ টাকা মাস-ভাড়ায় ইজারা নেওয়া হল। কাঠের তৈরি স্টেজ হল। থিয়েটারের নাম হল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

গিরিশ বেঙ্গলেও নেই, গ্রেটেও নেই। সে শুধু এখানে-ওখানে মাঝে-মধ্যে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

এমনি একদিন গিয়েছে বেঙ্গলে। 'অশ্রুমতী' প্লে হচ্ছে, কিন্তু প্রতাপ সিংহ অনুপস্থিত। সকলে গিরিশকে ধরল, উপায় নেই, আপনাকে প্রতাপ সিংহ সাজতে হবে। নইলে আমরা পথে বসব।

'সে কী? আমি যে এ নাটকের কিছুই জানি না।' পাশ কাটাতে চাইল গিরিশ।

'আপনাকে কিছু জানতে হবে না। শুধু প্রম্পটিং-এর উপর চালিয়ে যাবেন।'

'বা, বইটাই যে আমার পড়া নেই।'

'তা না থাক। রানা প্রতাপকে তো আপনি জানেন। তাইতেই হবে।'

ধরেবেঁধে গিরিশকে প্রতাপ করে দেওয়া হল। একবার যখন সেজেছে, তখন উদ্ধার করে দেবেই দেবে। হাঁপ ছাড়ল ম্যানেজার।

দু'অঙ্ক অভিনয় হবার পর গিরিশের দেখা নেই।

সে কী? যাবে কোথায়? গায়ের পোশাক পর্যন্ত ছাড়েনি। কাছেপিঠেই কোথাও রয়েছে। এদিক-ওদিক খোঁজো না একটু ভালো করে।

কে একজন এসে বললে, 'গিরিশ পীরুর হোটেলে বসে খাচ্ছে।'

খাচ্ছে? খাবার আর সে সময় পেল না? ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটল।

কী আশ্চর্য, প্রতাপের পোশাক-গায়েই খেতে বসেছে গিরিশ।

'সে কী মশাই? আপনার সীন এসেছে আর আপনি এখানে খাচ্ছেন?' ম্যানেজার হুমড়ি খেয়ে পড়ল: 'খবর পাঠালে তো থিয়েটারেই দেওয়া যেত খাবার।'

ভরামুখে গিরিশ বললে, 'আমি আর প্লে করব না।'

'প্লে করবেন না? সে কী?' সাত হাত জলের তলে পড়ল ম্যানেজার: 'কেন, আপনার পার্ট তো চমৎকার হচ্ছিল।'

'তা হোক। কিন্তু আর নয়, এইখানেই শেষ।'

'কেন অপরাধটা কী হল?' হতভম্বের মত মুখ করল ম্যানেজার।

'ঘোরতর অপরাধ।' প্রায় গর্জে উঠল গিরিশ: 'রানা প্রতাপের মেয়ে অশ্রুমতী শেষকালে আকবরের বেটা সেলিমের প্রেমে উন্মাদিনী হবে?'

'তাতে আমার-আপনার কী হাত আছে?'

'আলবৎ আছে। আপনি ও বই নির্বাচন করবেন না। আর আমি অভিনয় করব না।'

'বা, ইতিহাসকে আপনি মুছে দেবেন কী করে?' যুক্তির পথ ধরতে চাইল ম্যানেজার : 'আপনি তো অভিনেতা। আপনিই তো আর প্রতাপ নন!'

'ও, নই বুঝি! তাহলে নিয়ে নিন পোশাক।' গিরিশ গা থেকে পোশাকটা খুলে দিল। বললে, 'যে প্রতাপ আকবরের কুটুম্ব বলে মানসিংহের সঙ্গে একত্র খেতে রাজি হল না তারই মেয়ে কিনা সেলিমের জন্যে পাগল! আগে জানলে কি মশাই এ কেলেঙ্কারিতে রাজি হই? যান মশাই, পোশাক নিয়ে ফিরে যান। আর কারু গায়ে চাপিয়ে দিন।'

পোশাক নিয়ে ফিরে গেল ম্যানেজার।

'ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংস মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তাই এখনো শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।' আবার বললেন, 'বেশ্যারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলোই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।'

ঘরেতে মাদুর পাতা, নরেন এসে প্রণাম করে বসল।

'ভালো আছিস?' ঠাকুরও এসে বসলেন মাদুরে : 'হ্যাঁরে, তুই নাকি গিরিশের ওখানে প্রায়ই যাস?'

'যাই।'

'কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন গন্ধ একটু থাকবেই।'

'তা থাকুক।'

'হ্যাঁ, ওর থাক্ আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে।' বললেন ঠাকুর, 'যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ ঘোষ!' নরেন বন্ধুর হয়ে বললে।

'আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম,' পরিহাসপ্রসন্ন মুখে ঠাকুর বললেন, 'একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। আমি জিগগেস করলুম, এ কী হল? ও তো দামড়া। তখন গাড়োয়ান বললে, মশাই, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।'

'যাবে, একদিন যাবে, একদিন যাবে।'

আগের কথার জের টানলেন ঠাকুর : 'এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন একটু আড়চোখে চেয়ে দেখল। ব্যাপার কী জানো?' হাসলেন ঠাকুর : 'সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।'

'কিন্তু—কিন্তু গিরিশের বিশ্বাস?'

'গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস তেমনি অনুরাগ।' ঠাকুর বুঝিবা একটু অভিযোগের সুর আনলেন : 'কিন্তু এত গালাগাল মুখখারাপ করে কেন?'

কী করবে! বাল্যকাল থেকেই একটার পর একটা শোক পেয়ে আসছে। অসৎ সঙ্গে মিশেছে। আচার-বিচার মানে নি! মদ ধরেছে। থিয়েটারে ভিড়েছে। সঙ্গ করেছে বারাঙ্গনার। উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু বাকি রাখেনি।

আজীবন যদিও বয়াটে নাম, পরোপকার করতে ছাড়েনি সাধ্যমত। পাড়ার পুকুরে কে এক ভদ্রলোক ডুবে গিয়ে মারা যায়। লাশ ভেসে উঠলেও তার আত্মীয়স্বজন তা তুলতে রাজি নয়। পুলিস এল মুদ্দাফরাস দিয়ে সেই লাশ তুলতে। গিরিশ জলে লাফিয়ে পড়ল, নিজেই সে বিকৃত ভারী লাশ পাড়ে তুলল, দলবল জুটিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে, সেখান থেকে ছাড়ান করে নিয়ে গেল শ্মশানে।

'বলিদান'-এ হিরণ্ময়ী বিধবা হবার পর শুধু এক গরিব প্রতিবেশিনী এসেছে তাকে সান্ত্বনা দিতে। বলছে, 'তা আমি এখন আসি বাছা। দিন কি আর যাবে না? নাও, অমন করে থেকো না, কাল থেকে পড়ে রয়েছ, একটু মুখে জল দাও নি। হবিষ্যি চড়িয়ে দাও, কি করবে! আসি মা।'

প্রতিবেশিনী চলে গেল হিরণ্ময়ী বলছে আপন মনে, 'আহা এই গরিব অনাথা, এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মারলে না। পাড়ায় যাদের বয়াটে বলে তারা কাঁধে করে সৎকার করতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকে কেউ উঁকি মারলে না। কি করব, কি হবে!'

নিজের কথাই লিখেছে গিরিশ। সে বয়াটে কিন্তু তাই বলে সৎকার্যে সে বিমুখ নয়।

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে, গিরিশ শুনতে পেল রসিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে কে এক মুমূর্ষু আর্তনাদ করছে। সাহস করে ঘরে ঢুকল গিরিশ। দেখল এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু একা শুয়ে আছে খাটে, আত্মীয়স্বজনরা বেপাত্তা। বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে বললে, মরতে দেরি আছে বুঝে সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে, আর ফেরেনি। বাবা, একটু জল দিতে পারো? বৃদ্ধের মুখে গঙ্গাজল দিয়ে গিরিশ ছুটল, দুধ জোগাড় করা যায় কিনা। আর কোথায় মিলবে, নিজের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। আর বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছতেই শুরু হল ঝড়। ঝড়ের মধ্যেই গিরিশ ছুটল দুধ নিয়ে। পথে আলো নেই. জনমানব নেই, শুধু মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের ঝলসানি। আর বৃষ্টি।

পথ চিনে গিরিশ ঠিক পৌঁছুল ঘাটে। দেখল দরজা বন্ধ। ঠেলল, কিন্তু খুলল না। ভাবল মুমূর্ষুর আপনজনেরা কেউ এসেছে বুঝি। 'দরজা খুলুন', চেঁচাল গিরিশ। কেউ কোনো সাড়া দিল না। তখন জোরে ধাক্কা মারতেই দরজা ফাঁক হল, আর যেই গিরিশ ঢুকতে যাবে অমনি একখানা ঠাণ্ডা সরু হাত তার গলা টিপে ধরল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল সেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। জীবন্ত নয়, মৃত। স্পর্শে আর মুখের চেহারায়ই তা প্রকাশিত। বুঝল কলেরার রুগী হয়তো, বিকারের ফলে খাট থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিংবা বিকারের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়ে সেই দাঁড়ানো অবস্থায়ই মরে রয়েছে।

চেঁচালে কে বা শুনবে, গিরিশ চেঁচাল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ল না, মৃত দেহকে খাটে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গিরিশের কি তখন মদের নেশা ছিল? আর যদি থেকেই থাকে, তার দোষ ধোরো না। তার জীবনে উৎপীড়নটা একবার দেখ। আর কে বলবে, একের পর এক এই শোককে জব্দ করবার জন্যেই তার মদ!

প্রথমেই শৈশবে মরল দিদি প্রসন্নকালী, এক রতি মেয়ে, জয় রাধাগোবিন্দ বলতে না পেরে বলত 'ধেও নাধার গোবিন্দ।' গিরিশকে ডাকত গিরি-ভাই বলে। তারপরে গিরিশের যখন দশ বছর বয়স, মরল বড়দাদা নিত্যগোপাল। এগারো বছর বয়সে মা, চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা। অভিভাবক বলতে কেউ রইল না। তারপর আরেক দিদি গেল, কৃষ্ণরঙ্গিনী। যখন তেইশ বছর বয়স, প্রথম ছেলে হল গিরিশের। দু'মাসের আয়ু ফুরিয়ে গেল এক ফুঁয়ে। দু'বছর পর আরেক দিদি, কৃষ্ণকামিনী চোখ বুজল, আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ছোটভাই কানাইলাল।

মেঘের গায়ে একটি মাত্র রূপোর পাড়, সেই বছরেই দ্বিতীয় পুত্র হল গিরিশের। সেই সুরেন্দ্রনাথ বা দানিবাবু।

সেই দানি ঘোষের অসুখ করেছে।

ডাক্তার-বদ্যি যা আছে সব এনে ভিড় করিয়েছে, ওষুধপত্রের শেষ নেই, সেবা শুশ্রূষারও চরম, তবু স্বস্তি নেই গিরিশের। এক দুপুরবেলায় ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছায়া-কায়া সমান, তাকাল ঠাকুরের পটের দিকে। বললে, 'সব অসুখের বৃত্তান্ত তো জানো, আর এও জানো এই আমার একমাত্র ছেলে। ভালো করে দাও বলছি। যদি ভালো করে না দাও, ভালো হবে না বলছি।' বলে মুখে যা এল কদর্য ভাষায় গাল দিতে লাগল। চৌদ্দপুরুষের অন্ত করে ছাড়ল।

পরে ক্রুদ্ধ মুখে বললে, 'তুই যদি অবতার হোস তো আমার ছেলেকে ভালো করে দে, তা না হলে আরো মুখ খারাপ করব বলে রাখছি।'

সে যাত্রা ভালো হয়ে গেল দানি ঘোষ।

দেবেন মজুমদারের বাড়িতে গিরিশকে বলছেন ঠাকুর, 'তুমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল, তা হোক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। বদরক্ত রোগ কারু কারু আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভালো।'

'হ্যাঁ, পেটেমুখে এক হওয়াই ভালো।' বললে গিরিশ।

'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়চড় করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।' গিরিশের দিকে তাকালেন সস্নেহে, 'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন-দিন উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশি আসতে পারব না—তা হোক, তোমার এমনি হবে।'

'এমনি—এমনি কারু হয়?'

'হয়। যদি নীরন্ধ্র বিশ্বাস থাকে, যদি উর্জিতা ভক্তি থাকে।'

'কিন্তু আমি যে লম্পট, আমি যে দুরাচার।'

ভাবে ঘনীভূত হয়ে ঠাকুর মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। বলছেন, 'মা, যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় কী বাহাদুরি! মা, মরাকে মেরে কী হবে? যে খাড়া হয়ে আছে তাকে মারলে তো তোমার মহিমা।'

আর দেবেনের সেই গানটা মনে করো :

'এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা, বাবা নিদয় গেছেন ফেলে॥
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পান সমান ব্যথা,
এ কি মা দারুণ কথা, নাই ব্যথা কুপুত্র বলে॥
যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন করে থাকতে পারে ছেলে ভুলে॥'

॥ ছয় ॥

বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল এঁটে উঠছে না। 'দুর্গেশনন্দিনী' করে খুব লুটছে বেঙ্গল, সুতরাং গ্রেট ন্যাশনাল-এও বঙ্কিমচন্দ্রকে চাই। গ্রেট ন্যাশনাল-এর ম্যানেজার ধর্মদাস গিরিশের শরণাপন্ন হল, 'মৃণালিনী'কে নাটক করে দিন আর আপনি নিজে সাজুন পশুপতি।

'পয়সা নেব না কিন্তু।' হাসল গিরিশ।

'যদি বলেন তাই। অবৈতনিক।'

সবাই জানত কাজ একবার হাতে নিলে গিরিশ কিছুতেই ফাঁকি দিত না। টাকা দিলেও না, না দিলেও না।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধিকার পশুপতি। বখতিয়ার খিলিজির সঙ্গে তার এই ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে যদি যুদ্ধ না করে তা হলে নবদ্বীপ অধিকার করে তাকে বাঙলার সিংহাসন দেবে। পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বখতিয়ার বিনা আয়াসে বাঙলা জয় করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখল না। পশুপতিকে বললে, 'তুমি নরাধম, তুমি অবিশ্বাসী, দেশদ্রোহী। তুমি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নও। তোমার স্থান কারাগারে।'

কটি দৃশ্য নিজে লিখে দিল গিরিশ। আর উন্মাদ-অবস্থায় পশুপতির যা অভিনয় করল তার জুড়ি নেই।

বন্দী অবস্থায় পশুপতিকে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

'মহারাজ, চলুন, নৌকো প্রস্তুত।' বললে বখতিয়ারের সেনাপতি।

'মহারাজ! মহারাজ কে!' পশুপতি বলছে : 'মহারাজ তো আমি। লক্ষ্মণ সেন, তোমার মুখকান্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার ন্যায় শত-শত শক্তির ছিন্নমস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসনে আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—

জানু পর্যন্ত শোণিত দেখ—রাজপথ দেখে এস, শোণিতস্রোত ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে—'

'এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই?' বলছে সেনাপতি : 'মহারাজ, চলুন নৌকো প্রস্তুত।'

'কে ডাকে? কাকে ডাকে?'

'নৌকো প্রস্তুত।'

'বিশ্বকর্মা আমার সিংহাসন আনছে।' বলছে পশুপতি : 'দেখ, যম কেমন পুরোহিত, সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে নৃত্য করছে। ছত্রধারী, ছত্র ধর। মনোরমা—মনোরমা—সিংহাসনের বামপার্শ্বে কি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে!'

'আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্যে নৌকো প্রস্তুত। চলুন।'

'বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষ্মণ সেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল। পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।'

পশুপতি করে না কিন্তু পশুপতি যে সেজেছে সে গিরিশ করে। কে বিশ্বাসের যোগ্য? তার উত্তর পেয়ে গেছে সে জীবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আরেকদিন থিয়েটার দেখাবে?'

'যে আজ্ঞে, আপনার যেদিন ইচ্ছে হয়, দেখবেন।' গিরিশ বললে বিনীত স্বরে।

'দেখব তো কিছু নিতে হবে।' হাসতে লাগলেন ঠাকুর : 'বিনি পয়সায় দেখব না।'

'বেশ তো, আট আনা দেবেন।'

'আট আনা?' যেন খুব কম, প্রায় না দেবার সামিল, এমনি মুখ করলেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, গ্যালারিতে বসবেন। গ্যালারির টিকিট আট আনা।'

'না, না, সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।' ঠাকুর বললেন, 'আমি এক টাকা দেব।'

'বেশ, তা হলে আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই বসবেন।'

'তা বসব। কিন্তু দেবো পুরো এক টাকা। ষোল আনা।'

'যে আজ্ঞে, তাই দেবেন!'

গিরিশের জন্যে দক্ষিণেশ্বরে অপেক্ষা করছেন ঠাকুর, কিন্তু গিরিশের দেখা নেই।

ভবনাথ বললে, 'কোথায় কোন দলে ভিড়ে গেছে, সে আর আসবে না।'

স্নেহার্দ্র স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসবে হে আসবে। আমি তাকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলুম, সে আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

ষোল আনার চেয়েও বেশি। দিয়ে ফেলল নিস্তর্ক বিশ্বাস। আর দুর্বার বিশ্বাসেই দুর্ধর্ষ বিশ্বজয়।

গিরিশ আর অমৃতলাল বসু একসঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেছে থিয়েটার।

বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়াল গিরিশ। মাকে প্রণাম করল।

অমৃতলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি প্রণাম করলে না?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'না।'

গিরিশ কোনো কথা কইল না। যেমন হাঁটছিল হাঁটতে লাগল।

শোভাবাজারের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের কাছে এলে গিরিশ আবার প্রণাম করল হেঁট হয়ে।

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমৃত।

এগিয়ে চলল দুজনে। গিরিশ জিজ্ঞেস করলে, 'ওখানে ঘাড়টা অমনি ফিরিয়ে ছিলে কেন?'

অমৃত বললে, 'ও বাবাঠাকুরটি অপয়া।'

'অপয়া বলে তোমার বেশ বিশ্বাস আছে?'

'সবাই বলে, কাজেই বিশ্বাস করতে হয়।'

'বেশ তবে ঐ বিশ্বাসটাকেই ঠিক রেখো।' গিরিশ দৃপ্ত স্বরে বললে, 'ইহজীবনে ঐ ঠাকুরের মুখ আর দেখো না। খবরদার, না। কোনোদিন না।'

আর কোনো কথা হল না, কিন্তু একটা খটকা অমৃতের মনে বিঁধে রইল। যদি অপয়া বিশ্বাস করি তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন?

'বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই।' বলছেন রামকৃষ্ণ : 'পাহাড়ে গুহায় নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে তা হলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতে ভয় নেই।'

গিরিশ তখন থেকে-থেকে মা-মা বলে হুঙ্কার করছে। যখনই ডাক ছাড়ে তখনই ছাতিটা ফুলে ওঠে, মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়। বলে, 'বেটিকে গাল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাইব তাই পাব।'

কিন্তু 'মৃণালিনী' নাটকে পশুপতির পার্ট করতে-করতে একদিন তার কী হল, প্রতিজ্ঞা করে বসল, মার কাছে শক্তি চাইব না, কিছু চাইব না, রাজ্যপদ তৃণখণ্ড, অমনি-অমনি শুধু ডাকব। বুঝলে হে অমৃত, কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ নেই, অমনি ডাকো প্রাণ খুলে।

গিরিশের মোটে তখন ত্রিশ বছর বয়েস, স্ত্রী মারা গেল।

বিয়ের দিন নিমতলার এক কাঠগোলায় আগুন লেগেছিল। লেলিহান জিভ মেলে সে আগুন এগিয়ে এল বাগবাজারের দিকে। এগুতে-এগুতে একেবারে গিরিশের বাড়ির খিড়কির বাগানে। সেখানে এক প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছে বাঁধা পড়ল।

এখন মনে হল সে-আগুন তার বাড়ি পর্যন্তই ধাওয়া করেছে।

চিকিৎসার আর বাকি রাখেনি গিরিশ, তবু থাকল না প্রমদা। শোকে ভেসে গেল গিরিশ। আর শোক ভুলতে মদে। আর যখন মদ নেই তখন কবিতায়।

'শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়ে কায় পেয়েছিনু প্রমদায়
ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন!'

তখনো তো বিশ্বাস নেই গিরিশের। তাই তখন তার সমস্তটাই শাস্তি, শান্তি নয়।

আগের আপিসের ফেল পড়বার উপক্রম, গিরিশ ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানিতে গিয়ে ঢুকল। মাল-খরিদের কাজ। আর তারই জন্যে গিরিশকে যেতে হল ভাগলপুর।

কিন্তু দূরে চলে গেলেও ভুলতে পারল না সেই নিকটকে।

কলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন সমস্ত চুরি হয়ে গেল গিরিশের। পরনের কাপড়খানা ছাড়া আর কিছু নেই সম্বল।

'ভাই, দশ টাকা ধার দিতে পারো?' প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হাত পেতে। দুঃখের কাহিনীটা ব্যক্ত করলে।

প্রতিবেশী বললে, 'দশ টাকা ধার দিতে পারি না, পাঁচ টাকা ভিক্ষে দিতে পারি।'

কান দুটো গরম হয়ে গেল গিরিশের। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, পাঁচটা টাকাই নিয়ে এল ভিক্ষে করে।

অতি দুঃখেও গিরিশের চোখে জল আসে না, কিন্তু এখন তার চোখে জল দাঁড়াল।

ক'দিন পরে সেই লোকটি কলকাতায় এসেছে। খবর পেয়েই গিরিশ দেখা করতে গেল। পাঁচ টাকা বার করে এগিয়ে ধরল ভদ্রলোকের দিকে, বললে, 'তোমার সেই টাকা কটা—'

ভদ্রলোক হাসল। বললে, 'ও টাকা তো তোমাকে আমি দান করেছি। তার আবার ফেরত কী।'

একটা লাগসই তীক্ষ্ম উত্তর গিরিশের জিভে এসেছিল, ফিরিয়ে নিল। যাই হোক উপকার করেছিল তো লোকটা। টাকা পাঁচটা ভদ্রলোকের হাতের কাছে রেখে নমস্কার করে চলে গেল গিরিশ।

অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ গিরিশের বন্ধু। বললে, 'ফ্রাইবার্জার ছেড়ে দাও। বারে বারে বাইরে যেতে হলে শরীর টিকবে না।'

'কিন্তু ছাড়বো তো যাব কোথায়?'

'বলো তো 'ইণ্ডিয়ান লিগে' ঢুকিয়ে দিই।'

ইণ্ডিয়ান লিগে হেড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার হয়ে এক বছর কাজ করল গিরিশ। তারপর পার্কার কোম্পানিতে বুক-কিপার হয়ে ঢুকল।

'শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে পত্নীহীন।' নিজের কথা বলতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে গিরিশ। কিন্তু যৌবন তার এখুনি চলে গিয়েছে কি? না, যায় নি। তাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করল গিরিশ। স্ত্রীর নাম সুরতকুমারী।

ঘরে খানিক বোধহয় শ্রী এল, শান্তি এল। গিরিশের মন পড়ল গিয়ে আবার থিয়েটারে।

স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' দেখতে এসেছেন ঠাকুর। বিডন স্ট্রিটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার সেখানেই আগে স্টার থিয়েটার ছিল।

অভিনয়ের শেষে রঙ্গমঞ্চের বিশ্রামঘরে এসে বসেছেন। গিরিশ, নরেন আর মাস্টার আশেপাশে। শোভাবাজার রাজবাড়ির যতীন দেবও উপস্থিত।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন গিরিশকে, 'এ থিয়েটার কার? তোমার, না-তোমাদের?'

গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে, আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো। আমার বলা ভালো নয়।'

'সবই থিয়েটার।' বলে উঠল নরেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও অবিদ্যার।'

'সবই বিদ্যার।' নরেন বললে গম্ভীর স্বরে।

'হ্যাঁ, তাই, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের পক্ষে দুইই আছে, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া। তুই একটা গান গা।'

নরেন গান ধরল। গান শেষ হবার পর ঠাকুর বললেন, 'কই, দেবেন আসেনি?'

গিরিশ বললে, 'না, আসেনি। তার অভিমান হয়েছে।'

'কেন, কিসের অভিমান?'

'সে বলেছে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর—আমরা এসে কী করব?'

'তার বুঝি নরেনের উপর হিংসে! কই আগে তো এমন ছিল না।'

জলখাবার এল, ঠাকুর খেতে লাগলেন। নরেনকেও খাইয়ে দিলেন।

যতীন দেব খেপে উঠল। বললে, 'সব সময় কেবল নরেন্দ্র খাও, নরেন্দ্র খাও, নরেন্দ্র খাও,—আমরা শালারা ভেসে এসেছি।'

'ওরে, তোর কথা বলছে।' নরেনের দিকে সস্নেহে তাকালেন ঠাকুর। পরে যতীনের থুতনি ধরে আদর করতে-করতে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাস, সেখানে খাস।'

এর পর আবার বিবাহবিভ্রাট হবে। সেদিন শোনেন নি, আজ শুনবেন।

গ্রেট ন্যাশনালকে নিয়ে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে ভুবনমোহন। হিসেব-পত্রের বালাই নেই, এক রাত্রি বেশি বিক্রি হল তো পানে-ভোজনেই ফুঁকে দাও। পৈত্রিক বিষয় মায়ের নামে, হ্যান্ডনোট কাটা ছাড়া টাকা-সংগ্রহের পথ নেই। তাছাড়া ছদ্মবেশী বন্ধুরাই এখন মহাজন। এক হাজার দাদন করে হ্যান্ডনোটে লিখিয়ে নিচ্ছে দু'হাজার।

ধারের থেকে উদ্ধার পাবে কী করে?

বেঙ্গলের দেখাদেখি অভিনেত্রী আমদানি করল। পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে—

রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, যাদুমনি আর হরিদাসী। এবার তবে গ্রেট ন্যাশনালকে পায় কে?

বেঙ্গলের 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকই নতুন করে চালাল গ্রেট ন্যাশনাল। ভীষণ জমে গেল। এত জমে গেল যে দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে—দিল্লী-লাহোর-মিরাটে। সঙ্গে নিয়ে গেল বিনোদিনীকে, রাধিকার পার্টে। বিনোদিনীর মা কিছুতেই মেয়েকে একা ছাড়বে না, সেও সঙ্গ ধরল।

লাহোরে গোলাপ সিংকে কে না জানে। বিরাট বড়লোক, ডাক-নামও রাজা। বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, ঐ মেয়েটিকে চাই।

বিনোদিনীর মা চোখে অন্ধকার দেখল। বিপদ যে বাইরে থেকে আসতে পারে এ ভাবেনি। কিন্তু যাই হোক, তাকেই ঠেকাতে হবে।

গোলাপ সিংএর লোক বললে, 'তুমি ভড়কাচ্ছ কেন? রাজাসাহেব তোমার মেয়েকে দস্তুরমত বিয়ে করবেন। বিয়ে করে রানী বানাবেন।'

ও একই কথা। বিনোদিনীর মা রাজী হলনা কিছুতেই। থিয়েটারের ধর্মদাসকে বললে, 'লাহোরে আর কাজ নেই। শিগগির ফিরে চলুন কলকাতায়। নয়তো আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিন। যাতে জোর করে না ছিনিয়ে নেয়, পুলিশে খবর দিয়ে রাখুন। নইলে বলুন, আমি নিজেই থানায় যাই।'

দলবল নিয়ে ধর্মদাস তাড়াতাড়ি চলল মিরাটে। বিনোদিনী রক্ষা পেল।

'সতী কি কলঙ্কিনী'র পর গ্রেট ন্যাশনাল ধরল জ্যোতি ঠাকুরের 'পুরু-বিক্রম'। কিন্তু পঞ্চকন্যার মধ্যে নায়িকা সাজবে কে?

পরীক্ষা হোক।

নাটকের এক জায়গায় নায়িকার মুখে কথা আছে—'পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ'। ও কথাটা যে একসঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারবে সেই পাবে নায়িকার পার্ট।

পরীক্ষা দাও। বলো—'পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ'।

সব চেয়ে ভালো পারল ক্ষেত্রমণি। অতএব সেই নেবে নায়িকা ঐলবিলার ভূমিকা।

এততেও লাভের অঙ্ক ডুমুরের ফুল হয়েই রইল। দিল্লী-লাহোর করে অনেক টাকা কামিয়েছিল ধর্মদাস, কিন্তু হিসেব যা দিল ভুবনমোহনকে তার চেহারা নিতান্ত কাহিল, দুর্ভিক্ষপীড়িত। লাহোরে একদিন কাশ্মীরের মহারাজা অভিনয় দেখতে এসেছিল। অভিনয় দেখে অপরিসীম খুশি হয়ে অজস্র পুরস্কার দিল সকলকে—শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর, আরো কত-কী বহুমূল্য জিনিস। পুরস্কার বাবদ ধর্মদাস ভুবনমোহনকে সাধারণ একটা রুমাল ও পাথরের ছোট একটা রেকাবি মাত্র দিল। রহস্য প্রকাশ হতে দেরি হল না। ফলে শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যেকে থিয়েটারের ইজারা দিয়ে দিল ভুবনমোহন। নামল ধর্মদাস।

কিন্তু কৃষ্ণধন সুবিধে করতে পারল না। ভুবনমোহন আবার নিল নিজের হাতে, উপেন্দ্রনাথ দাস ডিরেক্টর আর অমৃতলাল বসু ম্যানেজার।

নামাও আবার 'পুরুবিক্রম'। রঙ্গমঞ্চে সেই জাতীয়তার গান আবার ধ্বনিত হোক : 'জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।' নামাও 'সরোজিনী'। ধ্বনিত হোক ক্ষত্রিয় নারীদের জহরব্রতের গান : 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা জ্বল্‌রে দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।'

সঙ্গে একটি প্রহসন জুটল—'গজদানন্দ'।

সপ্তম এডওয়ার্ড তখন যুবরাজ, ভারতদর্শনে কলকাতা এসেছে। বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুর দেখতে তার ভীষণ সখ, কিন্তু কে আছে তাকে আহ্বান করে? হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজী হলেন। তাঁর বাড়ির মহিলারা হিন্দু পদ্ধতিতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করে যুবরাজকে সংবর্ধনা করলেন।

আর যায় কোথা! সমস্ত কলকাতা নিন্দায় সহস্রমুখ হয়ে উঠল। হেমচন্দ্র 'বাজীমাৎ' লিখলেন। 'বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পো, খেললে ভালো চোটে।' উপেন দাস প্রহসন লিখল 'গজদানন্দ', আর তাতে গান বেঁধে দিল গিরিশ। 'জজ হতে চাও গজ গিরিধন'।

'গজদানন্দের' অভিনয় বন্ধ করে দিল পুলিশ।

নাটকের নাম বদলে রাখা হল 'হনুমান চরিত্র'। পুলিশ সেটাও নিষিদ্ধ করে দিল। শুধু নিষেধে হবে না, পুলিশ ঠিক করল প্রতিশোধ নেবে। শিক্ষা দেবে থিয়েটারওয়ালাদের।

আগে 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামে একটা নাটক হয়ে গিয়েছিল, পুলিশ সেটাকে অশ্লীল বলে সাব্যস্ত করল। বার করাল ওয়ারেণ্ট। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও অভিনেতা কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

'সতী কি কলঙ্কিনী' প্লে হচ্ছে, পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট দলবল নিয়ে এসে পড়ল হুড়মুড় করে। ডিরেক্টার উপেন দাস, ম্যানেজার অমৃত বোস আর অভিনেতাদের মধ্যে মতিলাল সুর, বেলবাবু, শিব চাটুজ্জে, গোপাল দাস, গানের মাস্টার রামতারণ সান্যালকে গ্রেপ্তার করলে। ভীষণ হুলুস্থুল পড়ে গেল। দর্শকের দল পালাল ছত্রভঙ্গ হয়ে। অভিনেত্রীরা কাঁদতে লাগল চেঁচিয়ে।

উপেন ধমকে উঠল সকলকে। কী এমন ঘটেছে যে সবাই একেবারে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছ? সমস্ত দায়িত্ব আমার। আর কারুরই কোনো জবাবদিহি নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? যদিও ওয়ারেণ্ট নেই তবু ধর্মদাস সুর স্টেজের উপরে সিলিংএ উঠে লুকিয়েছে। মতিলাল পালাচ্ছিল ঝাঁকামুটে সেজে, পুলিশের চোখ এড়াতে পারল না।

'গিরিশ ঘোষ কই?'

'থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।' বললে উপেন।

'এসেছিল আজ এখানে?'

'এসেছিল, কিন্তু তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বার আগেই চলে গিয়েছে।'

বিচারে আর সকলে ছাড়া পেল, দোষী সাব্যস্ত হল শুধু উপেন আর অমৃতলাল। দুজনেরই একমাস করে সশ্রম কারাবাস।

মোশন হল হাইকোর্টে। ফিয়ার আর মার্কবির সামনে। সাহেবরা নাটকে অশ্লীলতার বাষ্পও দেখতে পেল না। দণ্ডাদেশ নাকচ করে দিল।

তবু মোশন করতে সামান্য যেটুকু দেরি, উপেন আর অমৃতকে তিন দিন থাকতে হল জেলে।

তারপর এল অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ-আইন। বন্ধনের পর আরেক বন্ধন।

ইচ্ছেমত নাটক করার আর স্বাধীনতা রইল না। দেশ বা সমাজের কোনো বেদনা-বঞ্চনার কথা বলা যাবে না। তবে আর কী। শুধু গীতিনাট্য চালাও।

রাধামাধব হালদার লিখে দিল গীতিনাট্য। চলল না। আট আনার গ্যালারিতেও বিশেষ লোক নেই।

গিরিশ গান বাঁধল :

'আমায় ফিরিয়ে দে না আধুলি—
কি ঠকানটা ঠকালি!'

আবার :

'ও রাধানাথ বাঁশরী কই?
তোমার কোথায় গেল চুড়োধড়া।
কোঁচড়ভরা মুড়কি খই?'

ভুবনমোহন ঠিক করল থিয়েটার আবার ইজারা দেবে। কিন্তু লোক কই?

গিরিশ বললে, 'আমাকে দাও।'

শুধু উল্লসিত নয়, নিশ্চিন্ত হল ভুবনমোহন। তিন বছরের জন্য থিয়েটার ভাড়া দিল গিরিশকে।

গিরিশ প্রথমেই গ্রেট ন্যাশনালের গ্রেট বাদ দিল। বিশুদ্ধ নাম হল : ন্যাশনাল থিয়েটার। আর নাটক নির্বাচন করল মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'।

গিরিশ একাই মেঘনাদ আর রাম।

তরঙ্গায়মান শব্দে আবৃত্তি করছে নরেন :

'ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মণ, নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়।'

তারপর বিভীষণকে বলছে :

'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'

'কী ভীষণ একটা নেমকহারাম!' সতেজে বলে উঠল নরেন, 'ট্রেইটর! বংশটা ছারখার করল। নিজের কাছে নিজের বংশমর্যাদা নেই? ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট হয়ে গেল?'

আর প্রথম অভিনয়ের রাত্রে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গিরিশ কবিতা পড়ল :

'সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জন;
ঝুনু ঝুনু নাহি আর কঙ্কণের ঝনৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন॥'

॥ সাত ॥

বেঙ্গলে যখন 'মেঘনাদবধ' প্লে হত তখন কী হত? মন্দোদরীর থেকে যুদ্ধে যাবার আগে বিদায় নিচ্ছে মেঘনাদ। 'কেন মা ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে, রক্ষোবৈরী।' মেঘনাদের ভূমিকায় নামত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তরবারি কোষমুক্ত করে সবেগে ঢুকতো স্টেজে—হুঙ্কার করে উঠত। একবার কী হল? খোলা তলোয়ারে মন্দোদরীর হাতের তাবিজের সুতো কেটে গেল। ছিটকে পড়ল তাবিজ।

সে এক মহাকেলেঙ্কার!

কিন্তু ন্যাশনালে গিরিশের মেঘনাদ কী রকম? বীর ও মাতৃভক্ত পুত্রের যেমন হতে হয়। বিনয়, বীর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। আবার এদিকে মায়ের প্রতি স্নেহশীল। ব্যাকুল মায়ের আশঙ্কা দূর করবার জন্যে দৃঢ়তা। তারপর পূজাগারে লক্ষ্মণ যখন প্রথম ঢোকে তখন মেঘনাদের সে কী সৌম্য প্রশান্ত ভাব, আবার ক্ষণপরেই রোষক্ষিপ্ত বহ্নিমূর্তি, 'ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে লক্ষ্মণ—' যে দেখেছে সেই মুগ্ধের অধিক হয়ে গিয়েছে।

তারপরে আবার রামের পার্ট। দ্বন্দ্বের মধ্যেই তো গিরিশের জীবনের নাটিকা।

রামরূপে লক্ষ্মণকে বিদায় দিচ্ছে গিরিশ। লোকে শুনছে আর কাঁদছে।

তারও অধিক হয়ে গেল সেদিন।

দোতলায় চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা দেখছে। সেদিন কী হল, চিক ছিঁড়ে পড়ল হঠাৎ। কিন্তু অভিনয়ের গুণে সবাই এত তন্ময় যে কোনো গোলমাল হল না কোথাও। মেয়েদের খেয়াল নেই যে চিক নেই আর পুরুষদেরও খেয়াল নেই রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখবার আছে অন্যদিকে।

মাইকেলের পর নবীন সেনকে ধরল গিরিশ। মেঘনাদবধের পর 'পলাশীর যুদ্ধ'। গিরিশ ক্লাইভ সাজল আর বিনোদিনী সাজল ইংলণ্ড-রাজলক্ষ্মী।

'দ্রুম করে দূরে তোপ গর্জিল অমনি—আপনার ঐ লাইনটা ভালো হয়নি।'

নবীনকে গিরিশ বললে সরাসরি : 'ওটা তো বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড থেকে নেওয়া, তাই না?'

'তাই।' স্বীকার করল নবীন।

'অনুবাদটা ভালো হয়নি।'

'আপনি হলে কী রকম করতেন?'

'মুখে-মুখে বায়রনের অনুবাদ করা সোজা নয়।' গিরিশ এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বললে, 'নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জন, অস্ত্র ধরো অস্ত্র ধরো কামান ভীষণ॥ এ রকম করলে মন্দ হয় না।'

'চমৎকার হয়।' নবীন জড়িয়ে ধরল গিরিশকে। ডাকল ভাই বলে।

মুখে মুখে কবিতা বাঁধতে ওস্তাদ গিরিশ। আফিসের পথে বেরিয়েছে, এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ধরল। আগের চেনা, গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'ভাই, বেয়াইবাড়িতে লিচু পাঠাচ্ছি, তোমায় একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।'

'লিচুর কবিতা! সে কী কথা!'

'হ্যাঁ ভাই, কটা লাইন না লিখে দিলেই নয়।' ভদ্রলোক পেড়াপেড়ি করতে লাগল : 'তুমি বরং বলে যাও, আমি লিখে নি।'

গিরিশ তখুনি বেঁধে দিল কবিতা :

'সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু
সবিনয় নিবেদন পাঠাতেছি কিছু।
দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে,
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে বেঁটে।
সুরস রসেতে যদি রসে তব মন,
জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন॥'

'ভাইজী!' তেরো নম্বর বোস পাড়া লেন থেকে গিরিশ চিঠি লিখছে নবীন সেনকে, রেঙ্গুনে : 'আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই তুমি জানো আমি একটা বাউন্ডুলে—তুমি আপনার গুণে আমায় মাপ কোরো। তুমি জানো কিনা জানিনা আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অন্য কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে মনে তোমায় পরম বন্ধু বলে জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নেই যে পড়ে। যার হস্তাক্ষর সে আমার সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে বসে লেখে। আমি যে যে কথা বললুম তা যে আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী।'

উত্তরে লিখছে নবীন সেন : 'হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।'

'আম গেলে আমসি, যৌবন গেলে কাঁদতে বসি।' লিখছে গিরিশ : 'যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিল ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। এখন এই দূরদেশ ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছে করে। তোমার তো পত্র লিখতে ক্লান্তি নেই।

যদি মাঝে মাঝে লেখো, শোবার সময় পাঠ করে শুতে যাই।

সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনো আছি। মীরকাশিম নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বাজারে ওর সুখ্যাতি শুনছি। যে-কয়রাত্রি অভিনয় হয়েছে লোকেরও যথেষ্ট ভিড়। ব্রাহ্মরা পর্যন্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নয়। আমার ছেলে দানি মীরকাশিমের অংশ নিয়েছিল, তার সুখ্যাতি একবাক্যে।

মীরকাশিম ছাপাখানায় পাঠিয়েছি, তবে কতদিনে প্রুফ দেখে উঠতে পারব, তা আমার আমিরি মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জানো—নেভার টু ডু টু-ডে হোয়াট ইউ ক্যান পুট অফ টিল টুমরো—এই আমার মটো। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক তার কল্যাণে নেহাৎ আমিরিটা চলবে না বেশি দিন।

আমি তো হাঁপে ভুগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক দানির কথা বললুম, আর তো কারো কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার পরিবারবর্গ ছেলেপুলের সংবাদ লিখবে। সকলের শুভ সংবাদ শুনলে একটু মনটা খুশি হবে, ভাববো, যা হোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু শান্তিতে দিন কাটায়। বন্ধুবান্ধব তো বেশি নাই—এ একজনের সঙ্গে তবু কথা কই। কবিগিরি কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝছি, বলি—একটু দৃষ্টি খোলে, তাতে একটু আনন্দ আছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি খুলে আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয় বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব শোধরালো না।'

আশ্বিন মাসে পুজো উপলক্ষে গিরিশ 'আগমনী' লিখল আর 'আগমনী' নামাবার চারদিন পরেই আবার নতুন নাটক 'অকালবোধন' সুরু করল। মেতে উঠল কলকাতা। সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল 'আগমনীর' গান : 'ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই। এবার জামাই এলে বলব তারে উমা আমার ঘরে নাই।'

ছোট ভাই অতুল, হাইকোর্টে নতুন উকিল হয়েছে, গিরিশকে এসে বললে, 'অসম্ভব। এভাবে পারে না চলতে।'

গিরিশ চোখ তুলে তাকাল।

'তার চেয়ে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো।'

'কেন, কী হল?'

'তুমি থিয়েটার চালাবে কী! পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। আর তুমি তলিয়ে যাবে লোকসানে।'

'কেন, আমার কি চোখ-কান নেই? আমি কি আকাট?'

'তুমি দিনে আফিসে কাজ করো, রাত্রে হয় বই লেখ, নয় রিহার্সাল দাও, নয়তো থিয়েটার করো। তোমার ব্যবসা দেখবার সময় কোথায়? ভুবনমোহনবাবু এত হুঁসিয়ার, তিনি পর্যন্ত দেনার দায়ে ডুবলেন। তোমার না সেই দুর্দশা হয়!'

'টিকিট কী রকম বিক্রি হচ্ছে তা দেখেছিস?'

'দেখেছি। ওরকম হয় মাঝে মাঝে।' অতুলের চোখেমুখে তীব্র অবিশ্বাস :

'কিন্তু তোমার সাধ্য নেই সময়ও নেই যে সব দিক আগাগোড়া সামলাতে পারো। শেষকালে ধারেকর্জে তলিয়ে গিয়ে এজমালি সম্পত্তি না বিপন্ন করে বোসো।'

'কটা দিন দ্যাখ না—'

'দরকার নেই দেখে। তার চেয়ে সময় থাকতে পার্টিশন করে নাও।'

এই কথা? গিরিশ এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন। পরে বললেন, 'যা, নেব না থিয়েটার।'

'নেবে না মানে?'

'থিয়েটার করব, কিন্তু তার ভার নেব না। মানে য়্যাকটর হব, প্রোপ্রাইটর হব না। বড়জোর মাইনের মধ্যে থাকব, লাভের মধ্যে যাব না। কী, হল?' অতুলের কাঁধে হাত রাখল গিরিশ: 'কী, এবার নিশ্চিন্ত হলি?'

কথা রেখেছে গিরিশ। শ্রমিক হয়ে রয়েছে, মালিক হয়নি। মাইনেই খেয়েছে, মুনাফার ঘরে থাবা বসাতে চায়নি। আমার শিল্পই বড় হোক, ধর্মই বড় হোক, তুচ্ছ মালিকানা নিয়ে আমি কী করব?

এই অতুলকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শোনালেন তাদের বাড়িতে: 'আত্মীয় কালসাপ আর সংসার পাতকুয়ো।'

'আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে।' অতুলকে বললেন ঠাকুর, 'সংসারও করবে, ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।'

এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, জিজ্ঞেস করলে, 'ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয়?'

'কেন হবে না? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল—এ সব আছে।'

'এক জন্মে কি হয়?'

'তাঁর দয়া হলে কী না হয়!' বললেন ঠাকুর, 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায়? একেবারে একসঙ্গে আলো হয়।' লক্ষ্য করলেন অতুলকে: 'আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন্। কী, অমন আঁট বুঝি হয় না—ব্যাকুলতা?'

অতুল নিশ্বাস ফেলল। বললে, 'মন কই থাকে?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না! রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে, তাহলে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'কেবল রাত-দিন বিষয়কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? যদু মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত। আজকাল আর তত বলে না, রাতদিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, আর কেবল বিষয়ের কথা বলে।'

ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিল গিরিশ। এবার ভার নিল দ্বারকানাথ দেব। কয়েকমাস পরে দোয়ারীবাবু ছেড়ে দিলে কেদার চৌধুরী ইজারা নিলে।

দীনবন্ধু-মাইকেলের পর বঙ্কিমের যুগ পড়েছে।

কেদার চৌধুরী গিরিশকে 'বাদশা' বলে ডাকে। বললে, 'বাদশা, তুমি বিষবৃক্ষখানাকে নাটক বানিয়ে দাও আর তুমি নিজে নগেন্দ্রনাথ সাজো। আর বিনোদিনীকে কুন্দনন্দিনী হতে বলি।'

তথাস্তু। বিষবৃক্ষ অমৃতফল প্রসব করল। জমজমাট হয়ে উঠল ন্যাশনাল।

'বাদশা, এবার তবে দুর্গেশনন্দিনী ধরো। তুমি জগৎসিংহ, আর তিলোত্তমা আর আয়েষা দুই ভূমিকাতেই বিনোদিনী।' কেদার আবার গিরিশের দুয়ারে এসে ধর্না দিলে।

গিরিশ বললে, 'ঠিক আছে।'

ন্যাশনালের আবার জয়ধ্বনি উঠল, কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হল না সৌভাগ্য, গিরিশ পড়ে গেল স্টেজের উপর।

আসমানি বিদ্যাদিগগজের ঘরে ঢুকে খিচুড়ি খাচ্ছে আর বিদ্যাদিগগজকেও খাওয়াচ্ছে—এই একটা দৃশ্য আছে। ফুটি চটকে খিচুড়ি দেখানো হত। ঐ খিচুড়ি খাওয়ার দৃশ্যের পরেই জগৎসিংহের প্রবেশ। এক টুকরো ফুটির খোসা পড়ে ছিল স্টেজে, জগৎসিংহের পা পড়ল সেই খোসার উপর। আর যায় কোথা ? পা হড়কে বিরাটভাবে পড়ে গেল জগৎসিংহ।

দর্শকেরা হায় হায় করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গেই ড্রপ পড়ে গেল।

গিরিশের বাঁ হাতের কবজি গুরুতর ভেঙে গিয়েছে।

তিন-তিন মাস থিয়েটার-ছুট হয়ে রইল গিরিশ। বিক্রি যাচ্ছেতাই কমে গেল। সভাপতি ছাড়া সভা চলে, গিরিশ ছাড়া থিয়েটার চলে না।

অতুল ঠিক বলেছিল, কেদারবাবুও রাখতে পারল না, গোপীচাঁদ কেঁইয়া, মাড়োয়ারী, সাব-লিজ নিলে।

কলকাতার বাজার নিস্তেজ, চলো ঢাকায় যাই দল নিয়ে।

কিন্তু ঢাকায় পোস্টার পড়ল, ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা, তাই ওই থিয়েটার দেখতে যাওয়া কোনো ছাত্রের কর্তব্য নয়। যদি তবু কোনো ছাত্র যায় তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ন্যাশনালের অবস্থা তখন প্রায় বারোটা বাজার কাছাকাছি।

'সাবিত্রী' নাটকে বারাঙ্গনা সাবিত্রী সাজবে এ অসহ্য।

ঢাকা থেকে সুরু করে অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত কাশী এল ন্যাশনাল। ম্যানেজার অবিনাশ করকে গোপীচাঁদ বললে, 'তুমি পারো তো চালাও গে থিয়েটার, আমি আর ফিরছি না।'

অবিনাশ থেকে ভার নিলে কালিদাস মিত্তির। কালিদাসও ফেল মারল। এবার লঙ্কাবাবু, যোগেন মিত্তির এলেন। তিনি আবার দর্শকদের উপহার দেওয়া সুরু করলেন। আয়না-রুমাল-সাবান-সেণ্ট তো বটেই, আংটি-ইয়ারিং পর্যন্ত। গ্যালারি আর পিটের দর্শকের সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে লাগল। কিন্তু কত আর উপহার দেওয়া যায়! চরম করলেন ফুটি-তরমুজ-লাউ-কুমড়ো উপহার দিয়ে।

অতুল ঠিকই বলেছিল, দেনার দায়ে ন্যাশনাল নিলেমে উঠল। আর কোর্ট-সেলে প্রতাপচাঁদ জহুরি কিনে নিল এক ডাকে।

প্রতাপচাঁদ জানে কী করে ব্যবসা চালাতে হয়, দোরস্ত রাখতে হয় খাতাপত্র। কাকে রাখতে হয় সর্বাঙ্গীণ ম্যানেজার।

গিরিশকে বললে, 'আপনি আসুন। পুরোপুরি ভার নিন। ন্যায্য মাইনে দেব আপনাকে।'

'বেশ তো, আগে যেমন করতাম, সন্ধ্যের পর আফিস থেকে ফিরে এসে, তেমনি অভিনয় করব। বলেন তো শেখানো, তাও শেখাব। কিন্তু মাপ করবেন,' গিরিশ বললে করজোড়ে, 'মাইনে নিতে পারব না। আগে যেমন বিনা-টাকায় করেছি এখনো তাই করব।'

প্রতাপচাঁদ বাস্তবদর্শী। বললে, 'মশাই, একসঙ্গে দু নৌকোয় পা দেওয়া চলবে না। আফিস আর থিয়েটার—আফিস ছেড়ে আপনাকে পুরোপুরি থিয়েটারে ভিড়তে হবে। আসুন, আমি আপনাকে একশো টাকা মাইনে দেব।'

'আমি যেখানে কাজ করছি—পার্কার কোম্পানি—সেখানে দেড়শো টাকা পাচ্ছি।'

'আমার কাছে আপাতত একশো নিন, থিয়েটারে আয় বাড়লে আপনারও মাইনে বাড়বে।'

গিরিশ ছেড়ে দিল চাকরি। পঞ্চাশ টাকা ক্ষতিস্বীকার করে প্রতাপচাঁদের আশ্রয় নিলে। কেন? শুধু থিয়েটারকে ভালোবাসে বলে। নাটকরচনার সফলতর সুযোগ পাবে বলে। নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করবে বলে।

পার্কার গিরিশকে ঠেকাতে চাইল। 'বেশ তো, যখন খুশি তুমি আফিসে আসবে যখন খুশি চলে যাবে, কেউ কিছু বলতে আসবে না। তুমি থাকো। আফিসও করো থিয়েটারও চালাও।'

'না সাহেব, আর ফাঁকির কারবারে থাকব না। এবার দেশসেবা করি। লোক-শিক্ষার কাজে লাগি।'

হ্যাঁ, থিয়েটারের ভিতর দিয়েই আমার দেশসেবা। লোকশিক্ষা।

নবীন সেন লিখছেন গিরিশকে : ভাই গিরিশ, আমার অনুরোধ তুমি সাত দিনে এসব না করিয়া কিছু বেশীদিন সময় লইয়া আমাদের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষা-বিভ্রাট, চাকরি-বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি কমিকো-ট্র্যাজিক নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। আমার পেড়াপিড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃতফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি 'আনন্দমঠে' দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।'

গিরিশের বাড়ি আসছেন রামকৃষ্ণ। দ্বারপ্রান্তে গিরিশ দাঁড়িয়ে। ভক্তসঙ্গে যেই ঠাকুর সমীপস্থ হলেন গিরিশ দণ্ডের মত সামনে পড়ল। ঠাকুর বললেন,

'ওঠো', তখন উঠল। দোতলার বৈঠকখানায় নিয়ে এসে বসাল সবাইকে।

ঠাকুর দেখলেন একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। বললেন, 'ওটাকে সরিয়ে নাও। ওটাতে শুধু বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা। শুধু কূটকচাল।'

ঠাকুরের অমৃতকথা শুনতে-শুনতে সবাই বিভোর হয়ে রয়েছে। রাত যে কত হয়ে গেছে তার খেয়াল নেই।

হঠাৎ গিরিশ হরিপদকে বললে, 'ও ভাই হরিপদ, একখানা গাড়ি যদি ডেকে দিস—থিয়েটারে যেতে।'

'দেখিস যেন আনিস।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে।

সকলে হেসে উঠল।

হরিপদ বললে, 'আমি আনতে যাচ্ছি—আমি আর আনবো না!'

গিরিশ কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'দেখুন কী কর্মবন্ধন! আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইদিক-উদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। ইদিক-উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই।'

'না, না, ও বেশ হচ্ছে।' বললেন ঠাকুর, 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।'

নরেন বিদ্রূপ করে উঠল। মৃদুস্বরে বললে, 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'হ্যাঁ, এই তো মজা। একদিকে ঈশ্বর, আরেকদিকে সংসারকর্ম। একদিকে রাম, আরেকদিকে কাম। আর', বলছেন ঠাকুর, 'কাম না থাকলে তো ঈশ্বর-কামনাও থাকবে না।'

'কাজ করো আর কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখো।'

'কিন্তু আমরা যে পাপী, আমাদের কী হবে?'

'তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়।' বললেন ঠাকুর, 'দেহবৃক্ষে পাপ-পাখি। তাঁর নামকীর্তন আর কিছুই নয়, যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখি পালিয়ে যায়, তেমনি নামকীর্তনে দেহের পাপ চম্পট দেয়। মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকোয়, তেমনি নামকীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জলও আপনা-আপনি শুকিয়ে যাবে।'

ঈশ্বর যাকে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করবার ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন সংসারে, তাকে সদাগরী আফিসে কে আটকে রাখবে? হিসেবনিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল গিরিশ। পার্কারের চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দি। সামান্য স্মৃতিচিহ্ন।'

ছোট একটা বাক্স। গিরিশ খুলে দেখল তাতে একটি হীরের আংটি।

দেবেন মজুমদারের ভাই সুরেন মজুমদারের লেখা হাসির নাটক নিয়ে

প্রতাপচাঁদের থিয়েটার খোলা হল। জমল না, চলল না। তখন গিরিশ নিজেই গীতিনাট্য লিখলে—মায়াতরু। গানের ঝড় বইয়ে দিল। গায়িকা বিনোদিনী আর বনবিহারিণী। বিনোদিনী ফুলহাসি আর বনবিহারিণী ফুলধুলা।

'না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি!' বিনোদিনীর গাওয়া এই গান সবাইকে মাতিয়ে দিল। 'সাধের' নয়, কথাটা ছিল 'স্বাধীন', কিন্তু যেহেতু বিনোদিনী ভুল করে 'সাধের' গেয়েছে তখন 'সাধের'ই থাকবে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত গানের প্রশংসা করে গেলেন। গায়িকাকে তত নয় যত রচয়িতাকে।

একটা বুঝি বা আধ্যাত্মিক গান ছিল : 'পবিত্র সঙ্গীতরসে মাতাও হৃদয়।' রাজনারায়ণ বসু শুনে বললেন, 'সন্দেহ নেই, রচয়িতা একজন উঁচুদরের কবি, আর আমার বিশ্বাস, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হবেন।'

পর-পর অনেকগুলি নাটক লিখল গিরিশ। একটার নাম 'আনন্দে রহো'। 'আনন্দে রহো'র প্রধান চরিত্র বেতাল। তার বৈশিষ্ট্য—জীবনের সকল অবস্থাতেই সে আনন্দে থাকবার পরামর্শ দিত। প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে অঘটন ঘটায়। সুখে দুঃখে লাভালাভে সমভাব, সে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী।

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে হয়কে নয় করতে পারে গিরিশ।

থিয়েটারের সামনে হঠাৎ একদিন 'কামিনীকুঞ্জে'র লেখক গোপাল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা।

'কি হে গোপাল, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেল কিসে?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'আর বোলো না। অম্বলের ব্যারামে ভুগছি।'

'তাই প্রথমে চিনতেই পারিনি। কীরকম অম্বল?'

'সাবু-বার্লি খেলেও অম্বল হয়।' গোপাল হতাশ মুখে বললে, 'এখন উপোস করে আছি। মরতে আর দেরি নেই।' নিশ্বাস ফেলল গোপাল : 'এখন মলেই বাঁচি।'

'সে কি কথা!' গিরিশ গর্জে উঠল : 'এখুনি—এখুনি তোমার অসুখ আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

এ কী পরিহাস! গিরিশের মুখের দিকে চেয়ে কষ্টে হাসল গোপাল : 'সারিয়ে দিচ্ছ?'

'এই মুহূর্তে সারিয়ে দিচ্ছি। দেখ না আমার উইল-ফোর্সের কী ফল!' গিরিশ আবার গর্জে উঠল : 'দেখ না আমার ওষুধ খেয়ে।' বলে এক ঠোঙা গরম কচুরি কিনে আনল। বললে, 'খাও।'

'এই ওষুধ?'

'হ্যাঁ, এই ওষুধ। পরিতোষ করে এই এক ঠোঙা কচুরি সাবাড় করো।'

'মরে যাব।' প্রায় কেঁদে ফেলল গোপাল।

'গেলে যাবে। এই তো বলছিলে মলেই বাঁচি। না-খেয়ে মরতে, এখন না-হয় খেয়েই মরবে। আমার কথায় বিশ্বাস করো। আজ তোমার মৃত্যুর দিন নয়,

আরোগ্যের দিন।'

গিরিশের মুখের দিকে অভিভূতের মত তাকাল গোপাল। দিব্যি খেতে লাগল কচুরি। পুরো ঠোঙাটা শেষ করল।

গিরিশ বললে, 'নাও, ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল খাও। তারপর হাঁটা দাও বাড়ির দিকে। দেখবে আর তোমার অসুখ নেই।'

গোপালের আর খোঁজও নিল না গিরিশ।

একদিন থিয়েটারে গোপাল নিজেই এসে হাজির।

'এ কী, তোমাকে আর চেনা যায় না যে!' উল্লাসে লাফিয়ে উঠল গিরিশ।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে গোপাল। হাসিমুখে বললে, 'তোমার ওষুধে অসুখ সেরে গিয়েছে।'

॥ আট ॥

ঘুমোবার আগে গা-হাত-পা টিপিয়ে নেয় গিরিশ। আর, একবার ঘুমিয়ে পড়লে পাথর। কেউ হঠাৎ ঘুম ভাঙালে আর তার রক্ষে নেই। তার অদৃষ্টে মার আছে বেপরোয়া।

নতুন চাকর গা টিপছে গিরিশের।

গিরিশ বললে, 'দরজায় খিল দে। কেউ না হঠাৎ দোর খুলে আমার ঘুম ভাঙায়। আমি ঘুমুলে তুই বেরিয়ে যাস আস্তে-আস্তে।'

চাকর গা টিপতে লাগল। আরামে ঘুমিয়ে পড়ল গিরিশ।

এখন চাকর বেরোয় কী করে! দরজায় খিল যে। আর বাবুর হুকুমেই খিল লাগানো! তবে উপায়? এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কোথাও আর কোনো ছিদ্র-রন্ধ্র নেই।

'বাবু!' মৃদুস্বরে ডাকল চাকর।

গিরিশ ঘুমে গভীর!

'বাবু!' আবার ডাকল চাকর।

ঘুমে তবু এতটুকু আঁচড় নেই।

'বাবু!' এবার ডাকল তারস্বরে।

মারমূর্তি হয়ে লাফিয়ে উঠল গিরিশ : 'তবে রে, তুই—তুই—'

বেপরোয়া হাত-পা চলবার আগেই চাকর কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, 'আমি বেরোই কী করে?'

'তার মানে?' গর্জে উঠল গিরিশ।

'আপনি বললেন, আমি ঘুমিয়ে পড়লে বেরিয়ে যাস। কিন্তু বেরুব কোনখান দিয়ে? দরজায় যে খিল—'

কৌতুকের দিকটা বুঝল গিরিশ। বললে, 'জানলা নর্দমা দিয়ে বেরুবার

চেষ্টা করেছিলি?'

'করেছিলুম। পারিনি বেরোতে।'

'যা, বেরো।' খিল খুলে দিল গিরিশ।

কিন্তু নিজের ঘরের দরজা খুলে নিজের বেরিয়ে যাওয়া চারটিখানি কথা নয়।

স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসেছেন রামকৃষ্ণ। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বসেছেন বক্সে। একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে, যবনিকা পড়েছে। বালকস্বভাব রামকৃষ্ণের খিদে পেয়েছে। লুচি-তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছে গিরিশ।

দেড়খানা লুচি খেয়েছেন, গিরিশ এসে হাজির। মদে টুপভুজঙ্গ।

বললে, 'আমাকে একটা বর দাও।'

'বর? কী বর?' খেতে-খেতে তাকালেন ঠাকুর।

'তুমি আমার ঘরে পুত্র হয়ে জন্মাবে।'

'সে কী, তোর বয়েস হয়েছে কত?'

'তা যাই হোক না, তুমি ছেলে হবে কিনা বলো।' চেয়ারের হাতল ধরে গিরিশ ঝুঁকে দাঁড়াল।

'আমার বয়ে গেছে।'

'বটে?'

'তুই একটা থিয়েটারের লোক, মাতাল, লম্পট, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোর ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাচ্ছি!'

'তবে তুমি বেরোও, বেরোও আমার থিয়েটার থেকে।' গিরিশ গর্জন করে উঠল।

'সে কী, চলে যাব?'

'আলবৎ চলে যাবে। তবে তোমাকে থিয়েটার দেখিয়ে আমার লাভ কী!' বলে গিরিশ গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল।

আর সে কী গালাগাল!

হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। টলছে, সামলাচ্ছে, লাল চোখ গোল করে ঘোরাচ্ছে।

'এ কী উঠছ না? ওঠো বলছি।' প্রায় ঘাড়ে হাত রাখে গিরিশ: 'এটা তোমার বাপকেলে থিয়েটার নয়।'

সঙ্গের লোকেরা উঠে পড়ল। পাছে আরো অপমানিত হন সেই ভয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ঠাকুরকে।

রাম দত্তের গাড়িতে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন ঠাকুর।

শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর কত দূর? তা মন্দ কী! সারা রাস্তা ঠাকুর একটাও কথা কইলেন না। পাথর হয়ে রইলেন। সঙ্গের লোকেরাও চুপ করে রইল। কী যে বলা যায় কে বলবে। এ সহ্যের অতীত দুঃখ, সান্ত্বনার অতীত লাঞ্ছনা।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে মুখ খুললেন ঠাকুর। আর্তস্বরে বললেন, 'নোটো

নেচো গিরিশ আমাকে দেড়খানা লুচি খাইয়ে থিয়েটার থেকে বার করে দিলে গা?'

'দেবেই তো।' সঙ্গের কে একজন বললে, 'আপনি ওই লম্পটটার কাছে যান কেন?'

'যাই কেন? বাঃ, তাই বলে ও আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ করবে?'

'ঠিক করেছে, উচিত কাজ করেছে।' বলে উঠল রাম দত্ত।

'তুমি এ কথা বলছ?' ভ্যাবাচাকা খাবার মতন মুখ করলেন ঠাকুর : 'উচিত কাজ করেছে?'.

'একশোবার উচিত।' রাম দত্ত বললে জোর গলায়।

'তার মানে?'

'মানে সেই কালীয়দমন। কালীয় যখন বিষ ঢেলে সমস্ত যমুনার জল নষ্ট করে দিল আর সেই জল খেয়ে কৃষ্ণের রাখাল আর গরু যখন মরে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে মারবার জন্যে তেড়ে গেলেন। বললেন, হতভাগা, তুই বিষ ঢেলে আমার এতগুলো রাখাল-গরু মেরে ফেললি, তখন কালীয় কী বলেছিল?'

কী বলেছিল! ঘরের দেয়াল প্রতিধ্বনি করে উঠল।

'বলেছিল, ঠাকুর, তুমি আমাকে কি সুধা দিয়েছ যে সুধা ঢালব? তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ তাই ঢেলেছি। তেমনি আপনি গিরিশকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে ও আপনার সেবা করেছে।'

'তা হলে বলতে চাও ওর বাড়িতে আমি আর যাব না?'

'ককখনো না।' সকলে একবাক্যে ঘোষণা করে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ঠাকুর। পরে গম্ভীর স্বরে ডাকলেন রামকে। বললেন, 'রাম, গাড়ি জোতো। আমি গিরিশের বাড়ি যাব।'

'কার বাড়ি?'

'আর কার! গিরিশের বাড়ি।'

'যাবেন? এত গালাগাল অপমানের পরেও যাবেন?'

'যাব।'

'এখন রাত যে অনেক।' আরেকজন কে বললে।

'তা হোক। সব রাতই ভোর হয়। এও না হয় যেতে-যেতে ভোর হবে।'

কিন্তু কেন, কী হল, কেন হঠাৎ সমস্ত নির্যাতন ভুলে, গলে গেলেন গিরিশের প্রতি? গিরিশ কী মন্ত্র পাঠাল বাতাসে যাতে তার এত বড় রূঢ়তাও ক্ষমার্হ বলে মনে হল?

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, গিরিশের বাড়ির দরজায় ঠাকুরের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

কড়া নড়ে উঠল। গিরিশ, গিরিশ, আমি এসেছি।

ধড়মড় করে উঠে বসল গিরিশ। কে এল? কে ডাকে?

দরজা খুলে দেখল, এ কী। যাকে বার করে দিয়েছিল সেই এসে

আবির্ভূত হয়েছে। যাকে অপমান করেছিল সেই এসে দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে।

ঠাকুরের পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়ল গিরিশ।

এও হয় নাকি? কী করব বলো, গিরিশ যে অন্তরে বসে কেঁদেছে। দয়া চেয়েছে। ক্ষমা চেয়েছে। চেয়েছে পদচ্ছায়া।

যতক্ষণ থিয়েটারে ছিল, অভিনয়ে ছিল, মাতাল হয়ে ছিল, ততক্ষণ ভুলে ছিল ঠাকুরকে। ততক্ষণ ঠাকুরও কথা বলেননি, শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর সারা পথ নিঃসাড় হয়ে ছিলেন। যেই বাড়ি ফিরে এসে গিরিশ মুখের রঙ তুলে স্বাভাবিক হয়েছে, নেশায় ভাঁটা পড়েছে, ফিরে পেয়েছে নিজের পরিমাপ, অমনি হাহাকার করে উঠেছে—এ আমি কী করলাম! কাকে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম। আর সেই সদানন্দ শিশু, সে ধুলো গায়ে মাখল না, হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁদতে লাগল গিরিশ। অনুতাপের আগুনে পুড়তে লাগল দেহমন।

যেই গিরিশ কেঁদেছে অমনি শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। বলে উঠেছেন, রাম, গাড়ি জোতো, আমি গিরিশের বাড়ি যাব।

যেই শুনেছেন আর্তি, আন্তরিকতার ছোঁয়ালাগা আকুলতা, অমনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছেন। এক পলক কালহরণ করবারও সময় নেই।

বলছেন, ঈশ্বর কানখড়কে। যত কান্না কেঁদেছিস যত ডাক ডেকেছিস তিনি শুনে রেখেছেন, টুকে রেখেছেন। কান্নার মধ্যে আন্তরিকতার বহ্নিস্পর্শ সঞ্চারিত হয়নি বলেই তিনি সাড়া দেননি। যে মুহূর্তে ডাক আন্তরিক হয়েছে সেই মুহূর্তেই, যে ডাকছে সে যতই অধম হোক অক্ষম হোক পাপী হোক কামার্ত হোক, যাঁকে ডাকছে তিনি ক্ষমাই শুধু বহন করে আনবেন না, নিজে এসে দাঁড়াবেন চোখের সামনে।

অন্তরের অস্ফুট সে কান্না তিনিই শুধু শুনতে পান।

অনন্ত মাধুর্যের নিকেতন শ্রীরামকৃষ্ণই চলে আসেন সশরীরে। সংসার-সময়-সাগরে যিনিই একমাত্র ভেলা।

গিরিশ ভেবেছিল, ভোর হলেই নিজে গিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে আসবে। সে পথও ঠাকুর অবরোধ করে দাঁড়ালেন। হয়তো ভোর হলে, গিরিশের আবার মতিচ্ছন্ন হত, দক্ষিণেশ্বরের নাম করে বেরিয়ে উঠত গিয়ে হয়তো থিয়েটারে বা বারাঙ্গনার বাড়িতে, আর যাওয়া হত না দক্ষিণেশ্বর।

সেই বিপদের পথও আবৃত করলেন। গিরিশের পালিয়ে যাবার আর পথ কই? সমস্ত লজ্জামোচনের আচ্ছাদন হয়ে দাঁড়ালেন। শরণাগতি না নিয়ে আর গিরিশ করে কী। যায় কোথায়?

রামও সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। গিরিশই লিখেছে তার 'রাবণ-বধ' নাটকে, নিজে অভিনয়ও করেছে রামের ভূমিকায় :

শুন শুন জনকনন্দিনী
রঘুকুলবধূ তুমি
করিলাম দুষ্কর সমর—

রাখিতে বংশের মান;
ছিলে দশ মাস রাক্ষসের ঘরে
অযোধ্যা নগরে
না পারিব লইতে তোমারে
না পারিব কুলে দিতে কালি,
যথা ইচ্ছা করহ গমন।

বিনোদিনী সীতা সেজেছে। উত্তরে বলছে :

কোন দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ, অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
কহি চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী করি—
সাক্ষী মম দিবস-শর্বরী
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর।
সাক্ষী পবননন্দন হনু
সাক্ষী বিভীষণ—
সাক্ষী, নাথ, তোমার অন্তর।

তবু, কই, সীতাকে গ্রহণ করল না রাম। প্রত্যাখ্যান করে দিল।

'রাবণ-বধে'র পর 'সীতার বনবাস' লিখল গিরিশ। নাটকখানা বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করল : 'গুরুদেব দীননাথ, মাতৃভাষা জানি না বলা ভালো নয়, মন্দ। মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।'

'সীতার বনবাসে'ও রাম গিরিশ। বিনোদিনী এবার লব, কুসুমকুমারী কুশ। ভীষণ জমল থিয়েটার, স্ত্রী-দর্শকদের আসন বাড়াতে হল। সবচেয়ে বেশি মাতিয়েছে লবকুশ।

প্রতাপ জহুরি খুব খুশি। গিরিশকে বললে, 'পরে যখন আবার কিতাব লিখবেন তখন ওই দুই ছোকরাকে ঢুকিয়ে দেবেন।'

'কোন দুই ছোকরা?'

'ঐ আমাদের বিনোদ আর কুসুম। মানে ঐ লবকুশ।'

'যে নাটকই লিখি না, লব-কুশ ঢোকাতে হবে?'

'মানে, ঐ আর কি, বিনোদ আর কুসুমকে ছোকরা সাজিয়ে ছেড়ে দেবেন স্টেজে।' সমজদারের মত হাসল প্রতাপ : 'সিধে ছুকরির চাইতে ছোকরার পোশাকে ছুকরি বেশি খুবসুরৎ। তাছাড়া বিনোদ আমার জাদুকরী।'

কিন্তু বেশিদিন টিকল না জাদুবিদ্যা।

তবলা বাজায়, বিধুমৌলি বাগচি, থিয়েটারেই একখানা ঘর নিয়ে থাকে। কী খেয়াল হল প্রতাপচাঁদের, হুকুম দিল অভিনয় বা মহড়ার পর কেউ থাকতে পারবে না থিয়েটারে।

ফলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হল বিধুকে।

আর যায় কোথা!

সন্ধেয় এসে প্রতাপ দেখে থিয়েটার ফাঁকা, কোনো অভিনেতারই দেখা নেই।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার বিধুমৌলি।

গিরিশের বাড়িতে ছুটে এল প্রতাপচাঁদ। এ যে দেখি আরেক রকম ভেলকি। ভরা-ভরতি থিয়েটার একদম খাঁ-খাঁ করছে।

চাকরকে জিগগেস করলে প্রতাপ, 'বাবু ঘরমে হ্যায়?'

'বাবু নেই হ্যায়।'

চাকর নয়, কে আরেকজন উত্তর দিল। আর উত্তর দিল মুখোমুখি নয়, উপর থেকে যেন আকাশবাণী হল।

উপর দিকে তাকাল প্রতাপ। দেখল, ভেলকির উপর ভেলকি, উপরের বৈঠকখানার জানলা থেকে মুখ বের করে স্বয়ং গিরিশই বলছে, 'বাবু নেই হ্যায়।'

'বা, সে কী! আপনি সশরীরে বর্তমান আর আপনিই বলছেন, নেই হ্যায়।' প্রতাপচাঁদ মুখভঙ্গি করে উঠল।

'নেইই হ্যায় তো।' গর্জে উঠল গিরিশ : 'আমি কি বাবু?'

'বা, আপনি আমার থিয়েটারের ম্যানেজার না?'

'ম্যানেজার, না, মুণ্ডু। সত্যিকার ম্যানেজার হলে আমার পরামর্শ না নিয়েই আপনি তাড়াতে পারতেন বিধুবাবুকে? যান, আমি ম্যানেজার-ট্যানেজার কেউ নই। আমি ঘরমে নেই হ্যায়।' জানলা বন্ধ করে দিল সজোরে।

প্রতাপ তখন কাকুতি-মিনতি করতে বসল।

আগে তবে বিধুকে তার পুরোনো ঘরে থাকতে দাও, তাকে নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এস।

তাই সই। বিধুকে ঘরছাড়া করব না। কথা দিল প্রতাপচাঁদ।

তবে গিরিশ গেল। আলো জ্বলল থিয়েটারে।

কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারল না গিরিশ। প্রতাপকে বললে, দেখুন, থিয়েটার খুব ভালো চলেছে, অনেক কামাচ্ছেন আপনি, এবার য়্যাক্টর-য়্যাকট্রেসদের মাইনে বাড়িয়ে দিন।

প্রতাপ কেবল হবে-হচ্ছে করে।

'আর কত দিন গড়িমসি করবেন? নিজে একাই পকেট বোঝাই করবেন আর যাদের জন্যে আপনার এত জমজমাট তাদের ম্লান করে রাখবেন এটা ঠিক নয়।'

প্রতাপের তবুও গয়ংগচ্ছ।

গিরিশ প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও বেরিয়ে এল।

এস দেখি নতুন থিয়েটার খোলা যায় কিনা। কোনো শাঁসালো লোকের

খবর আছে কারু কাছে?

বিনোদিনী যার কাছে বাঁধা সে এক সুদর্শন ধনী যুবক, সম্ভ্রান্ত তো বটেই, তার উপর অবিবাহিত। কিন্তু গোড়াগুড়ি থেকেই তার ইচ্ছে নয় বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চের রঙ্গিনী হয়।

'কত টাকা দেয় তোমাকে থিয়েটার? হিসেব করো। আমি সেই টাকাটা বাড়তি দেব।' যুবক বলে দৃঢ়স্বরে।

'বা, তুমি তো বেশ লোক।' বিনোদিনী কোমল কটাক্ষ করে: 'আমার এত বড় একটা গুণ মাঠে মারা যাবে? গুণ আছে বলেই তো রূপে এত জৌলুস। রঙ্গিনী বলেই তো সঙ্গিনী করেছ! নইলে চাও কি আমি তীর্থে-তীর্থে ঘুরি, নীলাচলের সমুদ্রপারে চুপ করে বসে থাকি।'

যুবক অস্থির হয়ে ওঠে, বলে, 'না, না, থিয়েটার করতে চাও করো, কিন্তু য়্যামেচার হয়ে। মাইনে নিতে পারবে না।'

'বা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করব, মাইনে নিতে পারব না?'

'না, যা মাইনে বলে ঠিক হবে, বলো তো আমি দেব। আর হাড়ভাঙা পরিশ্রম, তাতে তোমার আপত্তি হবে কেন? সে তোমার আর্টের জন্যে যাকে তুমি ভালোবাসো জীবন দিয়ে।'

'পাওনা টাকা মাঠে মারা যাবে?'

'যা মাঠে মারা যাচ্ছে না তারও অনেক আমাদের পাওনা নয়।'

বিনোদিনী গেল তার মার কাছে।

সে কি, মাইনে নিবি নে কেন? ও বাবু কত দিন? ছাড়াছাড়ি একদিন তো হবেই, হয় তুই ওকে ছাড়বি নয়তো ও তোকে ছাড়বে। তখন যাবি কোথায়? পাওনা টাকা কেউ খেলাপ করে? এত দিন মুজরো খেটে আজকে য়্যামেচার? কখনো না। যার লক্ষ্মী যেখানে। তোর লক্ষ্মী যদি থিয়েটারে হয় সে থিয়েটারকে তুই অমান্য করবিনে।

বিনোদিনী গেল এবার গিরিশের কাছে।

সমাধান কঠিন কী! কত আর টাকা আছে ও ছোঁড়ার? ওকে ছেড়ে দিলেই তো চুকে যায়।

বুঝল এতে বিনোদিনীরই ব্যথা বেশি। যুবককে ছাড়ার কথা তো উঠতেই পারে না, আবার থিয়েটার ছাড়া, থিয়েটারকে খাটো করাও অসহ্য।

'তা হলে এক কাজ কর।' বললে গিরিশ, 'তোর মাইনের টাকা আমি নেব। আমি নিয়ে তোর মার হাতে দিয়ে আসব।'

'কিন্তু উনি যদি জিগগেস করেন?'

'বলবি, মাইনে নিই না।'

বুকে যেন বিষম বাজল বিনোদিনীর। যে তাকে এত ভালোবাসে তাকে সে মিথ্যে বলবে?

গিরিশ হাসল। সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখল। বললে, 'কখনো কখনো কোনো কোনো মিথ্যে কথা সত্যের চেয়েও সুন্দর।'

॥ নয় ॥

কিন্তু সত্য কি সুন্দর? সত্য নৃশংস।

বিনোদিনীর বাবু সেই যুবক দেশে ফিরে গিয়ে দিব্যি বিয়ে করে বসল।

বুক ভেঙে গেল বিনোদিনীর। থিয়েটার থেকে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে কাশী চলে গেল।

এত ম্রিয়মাণ হবার কী হয়েছে! বিনোদিনী ঠিক করল আর পাপের পথে যাব না। দেহপণ্যে আর বিক্রীত হব না কারু কাছে। ভগবান যখন আমাকে অভিনয়ের শক্তি দিয়েছেন, স্বাস্থ্য দিয়েছেন, আমি তাই খাটিয়ে জীবিকার্জন করব।

কাশী থেকে ফিরে এলে প্রতাপচাঁদ বললে, 'ছুটির মাসের মাইনে পাবে না।'

'সে কী কথা!' বিনোদিনী বসে পড়ল।

'তুমি তো কাজ করনি। কাজ করবে না অথচ মাইনে নেবে এটা কোন আইন?'

বাক্যব্যয় না করে বিনোদিনী চলে এল থিয়েটার ছেড়ে।

গিরিশ গেল তাকে বোঝাতে। বললে, "দ্যাখ বিনোদ, এখন গোলমাল করিসনে। কটা দিন একটু থাক ধৈর্য ধরে।'

অর্থ খোঁজবার জন্যে বিনোদিনী গিরিশের চোখের দিকে তাকাল।

'শোন, এক ভদ্রলোক নতুন একটা থিয়েটার খুলতে চাইছে। মস্ত বড়লোক, টাকার তিমি মাছ।' আশ্বাস দিল গিরিশ : 'কটা দিন চুপচাপ থাক, তারপর সেই থিয়েটারে গিয়ে উঠবি। আমি তোর সঙ্গ নেব। প্রতাপের সঙ্গে আমারও ঠিক বনছে না।'

থিয়েটারকে ভালোবাসে বিনোদিনী। থিয়েটারই তার জপতপ, তার জল-বায়ু। তাই থিয়েটার ছেড়ে দেবার কোনো মানে হয় না। বরং মাইনের দাবি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে গিয়েই উঠি। যদি সত্যিই নতুন একটা থিয়েটার তৈরি হয়, স্টেজ-ছুট হয়ে থাকাটা ভুল হবে। সুতরাং বিনোদিনী থিয়েটারেই ফিরে এল গুটিগুটি।

কিন্তু নতুন যে থিয়েটার খুলবে তার নাম কী? বাড়ি কোথায়?

নাম গুরুমুখ রায়। মুখে মুখে গুর্মুখ রায়। অবাঙালি।

'নতুন থিয়েটার খুলতে যত টাকা লাগে সব দেব।' গুর্মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল : 'কিন্তু বিনোদিনীকে চাই।'

'বা, বিনোদিনী তো নতুন থিয়েটারে আসবার জন্যে ব্যস্ত।' বললে সকলে।

গুর্মুখ দুর্মুখ। বলল, 'তার জন্যে আমি ব্যস্ত নই। আমি বলতে চাইছি বিনোদিনী আমার রক্ষিতা হবে।'

জ্বলে উঠল বিনোদিনী। ওর আস্পর্ধার মুখে নুড়ো জেবলে দিই।

'যত টাকা চাও তত টাকা দেব। অগাধ চাও তো অগাধ।' গুর্মুখ বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকাল।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল বিনোদিনী।

কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। সেই মল তো একদিন খসাবিই তবে মিছিমিছি আর লোক হাসাচ্ছিস কেন? একটা নতুন থিয়েটার যদি হয় দেশে কী ভীষণ একটা কাণ্ড হবে বল দেখি।

তাই বলে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে ধরব? আগের বাবু তো বিয়েই শুধু করেছে, বিনোদিনীকে এখনো পরিত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার বিয়ে করাটাই কি বিনোদিনীকে প্রতারণা নয়?

কে জানে! হয়তো অভিভাবকদের উৎপাতে বাধ্য হয়েছে বিয়ে করতে। বিয়ে করলেই বা কী। আসলে বিনোদিনীই হয়তো তার ভালোবাসার বস্তু। তার হৃদয়ের মাংস।

না, না, যাব না গুর্মুখের কাছে। রাতের নিঃসঙ্গ বিছানায় ছটফট করে বিনোদিনী।

কিন্তু যাই বলো একটা থিয়েটার হয়। কলকাতা গমগম করে ওঠে। একটা বারনারীর দেহের আর দাম কী। তার চেয়ে তার শিল্পীসত্তা মর্যাদা পাক, মূল্যবান হোক।

আর বলতে গেলে, ভালোবাসা না শ্মশানের ছাই! আনকোরা নতুনকে ভুলে সে কিনা আসবে এই প্রাক্তনীর দুয়ারে।

রাজী হয়ে গেল বিনোদিনী। আর সব যাক, থিয়েটার হোক। প্রেমিক যুবক নতুন বউ পেয়েছে, বিনোদিনী নতুন থিয়েটার পাক।

ভোরবেলায় একবার উঠে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিনোদিনী।

'অ কী মেনি, এত ঘুম কিসের?'

মেনি! ধড়মড় করে উঠে বসল বিনোদিনী।

দেখল তার সেই প্রণয়ী যুবক। যে তাকে চলতি 'বিনি' না ডেকে একটু গাঢ় করে 'মেনি' বলে ডাকত।

কিন্তু এ তার কী সাজসজ্জা! একেবারে একটা মিলিটারি পোশাক পরে এসেছে। কোমরে জ্বলছে একটা খাপে ঢাকা তলোয়ার।

ভয় পেল বিনোদিনী। শুকনো মুখে বলল, 'তুমি? এই অসময়ে?'

'মৃত্যুই অসময়ে আসে। শোনো,' যুবক এগুলো খাটের দিকে, বললে, 'এই দশ হাজার টাকা নাও, গুর্মুখকে ছেড়ে দাও।'

শুধু টাকা! শুধু দেহের উপর প্রভুত্ব!

সঘৃণে তাকিয়ে রইল বিনোদিনী।

'কত দিয়েছে, কত দেবে তোমাকে গুর্মুখ?' যুবক আরো এগিয়ে এল : 'বেশ, দশে না মন ভরে কুড়ি নাও। কুড়ি হাজার। গুর্মুখকে ল্যাং মারো।'

'না। তুমি টাকার অঙ্ক দেখিয়ো না।' বিনোদিনী বললে দৃঢ়স্বরে, 'তুমি ফিরে যাও।'

'ফিরে যাব?'

'হ্যাঁ, গুর্মুখকে আমি কথা দিয়েছি। কথা যখন দিয়েছি তখন আর তার নড়চড় হবে না।'

'দেখি হয় কিনা।' খাপ থেকে বিদ্যুৎঝলকে তলোয়ার বের করল যুবক। শুধু ভয় দেখাবার জন্যে নয়, সত্যি সত্যি আঘাত করবার জন্যেই চালাল তলোয়ার। আর একেবারে বিনোদিনীর মাথা লক্ষ্য করে।

পলকে বসে পড়ল বিনোদিনী। তলোয়ারের ঘা তাকে আড়াল করা টেবিল-হারমোনিয়ামের উপর গিয়ে পড়ল।

আবার তলোয়ার তুলেছে, যুবকের উদ্যত হাত বিনোদিনী ধরে ফেলল সাহস করে। বললে, 'আমাকে খুন করায় বীরত্ব কী। আমার কলঙ্কিত জীবন শেষ হয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার কী হবে? একটা বারাঙ্গনাকে হত্যা করে ফাঁসি যাচ্ছ তাতে কী মুখোজ্জল হবে তোমার? তোমার স্ত্রীর? তোমার পরিবারের?'

তলোয়ার খসে পড়ল হাত থেকে। দুহাতে মুখ ঢেকে যুবক বসে রইল অভিভূতের মত। তারপর কখন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিনোদিনীও কলকাতার বাইরে গা ঢাকা দিল।

গুর্মুখ বললে, 'বিনোদিনী আমার কব্জায় না এলে আমি থিয়েটার-ফিয়েটার কিছু করতে পারব না।'

বিনোদিনী খবর পাঠাল : 'আগে থিয়েটার পরে আর সব।'

অগত্যা বিডন স্ট্রিটে থিয়েটারের জন্যে জমি ইজারা নিলে গুর্মুখ।

বিনোদিনী ফিরে এল কলকাতা।

খবর পেয়ে গুর্মুখ এল দেখা করতে। বললে, 'বিনোদ, কী হবে ছাই থিয়েটারে? তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই, তুমি একেবারে আমার হয়ে থাকো।'

'কত দেবে বললে?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

চোখে যেন ঝাপসা দেখল বিনোদিনী। কিন্তু থিয়েটার? তার স্বপ্নের অলকাপুরী?

'থিয়েটারে আরাম কী! শুধু চেঁচানো, শুধু মেহনৎ। হাজার রকমের ঝামেলা। তার চেয়ে রুপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুয়ে ঘুমোনো, সে অনেক ভালো।'

অসম্ভব। তোমার পঞ্চাশ হাজারে আমার রুচি নেই। আমার থিয়েটার, আমার শিল্পতীর্থ, আমার ধ্যানজ্ঞান, আমার আরাধনা।

পঞ্চাশ হাজারের লোভ ছেড়ে দিল বিনোদিনী। পারল ছেড়ে দিতে। তার জীবসত্তা থেকে তার জীবনসত্তা বড় হয়ে উঠল।

থিয়েটারের বাড়ি উঠতে লাগল ক্রমে-ক্রমে। বিনোদিনীর আনন্দ দেখে কে। উৎসাহে সে কতদিন নিজেই ঝুড়ি করে মাটি বয়ে এনেছে।

বিনোদিনী

থিয়েটারের বাড়ি তৈরি হল। এখন তার কী নাম রাখা যায়?

সবাই বললে, বিনোদিনীর ত্যাগের উপরই এই থিয়েটারের সৌধ। সুতরাং থিয়েটারের নামের সঙ্গে যেন বিনোদিনীর কিছু যোগ থাকে।

অনেক মাথা খাটিয়ে হোমরাচোমরারা বললে, নাম রাখা হোক বী থিয়েটার। বী মানে ভ্রমর। আর সেই সঙ্গে ইংরিজিতে বিনোদিনীর নামের আদ্যাক্ষর।

বী থিয়েটার। তার মানেই 'বিনোদিনী থিয়েটার।' নামের স্বপ্নে বিভোর বিনোদিনী।

টাকা যেমন হল না, নামও হল না। নাম হল স্টার থিয়েটার। একটা গণিকার নামে কি থিয়েটার হয়? না তা হলে কি চলে?

গণিকা অচল। অচল তো লক্ষহীরা বৈষ্ণবী হয়ে যায় কী করে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কী করে এই বিনোদিনীর মাথায়ই আশীর্বাদের হাত রাখেন?

কলকাতার রাস্তায় গাড়ি করে যাচ্ছেন, দেখতে পেলেন দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে কতগুলি পণ্যাঙ্গনা দাঁড়িয়ে আছে। হাসাহাসি করছে।

তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বলছেন, 'মা আনন্দময়ী, আনন্দে থাকো।'

হাঁ, গণিকাও মহামায়া। তার মধ্যেও শুদ্ধ নিরঞ্জন আনন্দ।

'বেশ্যারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলই বা।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপনা হয়।'

রতির মার বেশে কালী দেখা দিল ঠাকুরকে।

বলছেন, 'আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম করছে এ মন্দের ভালো। মল্লিকের মা, চেনো তো? খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে। বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞেস করলে ওদের কি কোনোমতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা। তাই বুঝি মনে ডাক দিয়েছে। আমি বললুম, হ্যাঁ, হবে, যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে, আর করব না। শুধু হরিনাম করলে কী হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে।'

বিনোদিনী কি আন্তরিক কাঁদেনি? আর গিরিশ?

বললে, 'ঠাকুর, আমি পাপের পাহাড় করেছি।'

ঠাকুর হাসলেন, বললেন, 'পাহাড় করেছিস নাকি রে? ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে উড়ে যাবে।'

'মা বলব?'

'হ্যাঁ, আর কী নাম আছে মায়ের মত? এই একাক্ষর মন্ত্রই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।' অভয়প্রসন্ন স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মায়ের সন্তান কি কখনো পাপী হয়? মায়ের সন্তান বড় জোর দুঃখী হয়। মায়ের ছেলে কখনো ফেল করে না, মায়ের ছেলেকে মাস্টার কম নম্বর পাইয়ে দেয়। মায়ের ছেলে কখনো বকে যায় না, পাড়ার পাঁচটা ছেলে তাকে বকিয়ে দেয়। মারই তো আরেক নাম অহেতুকী কৃপা। নিশাচর ছেলে কখন বাড়ি ফেরে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে বাপ ঠ্যাঙা নিয়ে বসে আছে সদরে। আর মা? মা কখন খিড়কির দরজার ছিটকিনিটা আলগোছে খুলে রেখেছেন ছেলে যাতে নিঃশব্দে চলে আসতে

পারে চুপিচুপি।'

সুতরাং কোনো ভয় নেই। ছেলে শান্ত হলেও মার সন্তান, দুরন্ত হলেও মারে সন্তান। মা তাকে ফেলবেন কোথায়?

কিন্তু মা কই?

'তুমি কী রকম, মা?' জয়রামবাটিতে গিরিশ একদিন জিজ্ঞেস করল সারদামণিকে।

সারদামণি উত্তর দিলেন : 'আমি সত্যি মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি মা।'

আবার বললেন, 'আমি কি শুধু সতের মা? আমি অসতেরও মা।'

এই মাকেই গিরিশ একদিন দেখেছিল স্বপ্নে। কলেরা হয়েছে, নাড়ী প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে। আত্মীয়স্বজনেরা কান্নার রোল তুলেছে। মূর্ছাহত গিরিশ স্বপ্ন দেখল কে এক দেবীমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লাল পেড়ে শাড়ি, চুল খোলা আর আকর্ণবিস্তৃত বিশাল চোখে কী অগাধ শ্যামস্নেহ!

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গিরিশের দিকে। বললেন, 'তোমার জন্যে পুরীর জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছি। নাও, হাঁ করো।'

গিরিশ হাঁ করল। মা তার মুখে একটু মহাপ্রসাদ ফেলে দিলেন।

অলৌকিকের খেলা। গিরিশ ক্রমে ক্রমে ভালো হয়ে উঠল।

'সে কোন দেবী? কার ঘরনী?' জিজ্ঞেস করলে কেউ-কেউ।

'আমি তার কী জানি!' গিরিশ উত্তর দিল হাসিমুখে : 'আমি কি আগে কখনো দেখেছি? আমার সঙ্গে কি তার চেনাজানা আছে?'

'তবে দেবী বুঝলে কী করে?'

'দেবী না হলে কি অমনটি দেখতে হয়? আসার সঙ্গে সঙ্গে অমন আলো হয়ে উঠে ঘরদোর?'

কী জানি কী দেখেছে! করাল ব্যাধি যে সারল এই যথেষ্ট।

কিন্তু গিরিশ দেখে কী করে? কোন সুবাদে? এত দূর যে নষ্ট আর পানাসক্ত তার কী করে দেবীদর্শন হয়?

কতবার কামকে বলি দেবার জন্যে কালীঘাটে গিয়েছে গিরিশ। হাড়কাঠের কাছে বসে মা-মা বলে ডেকেছে, আর্তনাদ করেছে। মন্দিরচত্বরে কি আর জায়গা নেই, হাড়কাঠের কাছে কেন? কত শত ছাগ বলি হচ্ছে এ হাড়কাঠে। মৃত্যুকালে নিরীহ পশুগুলির অসহায় কান্না শুনে মা নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকায়। যদি আমার কান্নাকে বিপন্ন ছাগশিশুর কান্না বলে ভুল করে আমার চোখে চোখ রাখে। যদি দয়া হয়। যার চোখের আলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সে আলো যদি আমার চোখের উপর ঠিকরে পড়ে।

জয়রামবাটিতে এসেছে গিরিশ নিরঞ্জন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে। খোকা-মহারাজও আছে। কামারপুকুর থেকে পালকি করে এসেছে গিরিশ আর সকলে পায়ে হেঁটে। মার যাতে কিছুটা সুবিধে হয় গিরিশ ঠাকুর-চাকর সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর মুটের মাথায় চাল-ডাল।

'আগে তালপুকুরে গিয়ে স্নান করুন।' গিরিশকে বললে মহারাজেরা, 'তারপর মাকে দর্শন করবেন।'

তালপুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়েই চলে এল গিরিশ। হাতে একটি পাকা আম। মা'র বাড়িতে এসেই উঠোনে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম! কোথায় মা?

এই তো সামনে।

'তুমি? তুমি?' বিস্ময় বিগাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল গিরিশ : 'কবে সে স্বপ্ন দেখেছিলাম দেবীমূর্তি প্রসাদ দিচ্ছেন। তুমিই সেই দেবীমূর্তি?'

আশ্বাসভরা হাসি হাসলেন শ্রীমা। আমিই সেই আমিই সেই।

চোখের জল এসে নয়নের নিমেষকে আচ্ছন্ন করে ধরল। চোখের জলকে শাসন করতে চাইল গিরিশ। এখন তুই দূরে থাক, মাকে দেখতে দে। হায়, জল যে আনন্দেও আসে।

কিন্তু আর কী চাই! মা তো চোখের দিকে তাকিয়েছেন!

এক ভক্ত ছেলে মাকে গিয়ে বললে, 'মা, আমার বড় অশান্তি।'

মা হাসলেন : 'কেন অশান্তি কিসের?'

'মা, মন বড় চঞ্চল।'

'কিসের জন্য চঞ্চল?'

ভক্ত ছেলে নির্ভয়ে বললে, 'কামের জন্যে। কাম কিছুতে যায় না।'

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন!

ছেলে ফিরে এল। মনে কঠিন আত্মগ্লানি এল। ছি ছি, ওসব কথা কেন মাকে বলতে গেলুম। ওসব কি গুরুজনকে বলতে আছে?

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে সোজা মাস্টার মশায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রণাম করে বললে, 'আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথা বড্ড গরম, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন।'

'সে কী, আপনি মার কাছে উদ্বোধনে যাননি?'

'গিয়েছিলাম। কিছু হল না।'

'হল না মানে? মা কি আপনাকে চেয়েও দেখেন নি?'

'না, না, চেয়ে দেখেছেন বৈকি।' ভক্ত ছেলে বললে অনুতপ্ত কণ্ঠে, 'কিন্তু একটিও কথা বললেন না। আমার ব্যাধির কোনো প্রতিকার করলেন না।'

'সে কী? আপনার দিকে তাকিয়েছেন তো? চোখে চোখ রেখেছেন?'

'তা রেখেছেন। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।'

'তবে আর কী!' মাস্টারমশাই উৎফুল্ল হয়ে গান গেয়ে উঠলেন : 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'

গানের কলিটা তিন-তিনবার গাইলেন।

ভক্ত ছেলে তখন বুঝল মার অমনি চেয়ে থাকার অর্থ কী। নিষ্কলঙ্ক মমতা-দ্রব চোখদুটি বুঝি আবার মনে পড়ল। শান্ত হল ছেলে। স্নায়ুমণ্ডলী ঠান্ডা হল। কী যেন পেল শক্ত করে এঁটে আঁকড়ে ধরবার মত। মার মুখ মার চোখ,

মার কেশদাম।

এবার একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে মার কাছে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। বললে, 'মা, তোমার সঙ্গে একটু একান্ত হতে চাই।'

মা নির্জনে নিয়ে এলেন মেয়েকে। বললেন, 'কী ব্যাপার? কী চাই?'

'মা আশীর্বাদ করো, আমাদের যেন আর ছেলে পিলে না হয়।' অপরাধীর মত মুখ করে কুণ্ঠিতস্বরে মেয়ে বললে, 'আমাদের ভোগলালসা একেবারে কাটিয়ে দাও।'

মা হাসলেন। হাসিতেই তার সমস্ত যন্ত্রণার নিবারণ করে দিলেন। বললেন, 'সে কী কথা মা? তোমাদের ঘরে ছেলে না হলে আমার ভক্ত সংখ্যা বাড়বে কী করে?'

যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যখন যেমন তখন তেমন। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন।

আবার আরেক ভক্তকে বলছেন, 'বাবা, বে করনি, শান্তিতে ঘুমুতে পারবে। যে বে না করে সে তো অর্ধমুক্ত।'

'কিন্তু তুমি?' আরেক ভক্তকে ইঙ্গিত করলেন মা, 'তোমাকে যে করতে হবে।'

'এই তো বললেন বিয়ে করলেই অশান্তি।'

'তা হোক গে অশান্তি, তোমার করতে হবে। আর তোমার যে সন্দেহ হচ্ছে তা বলি। বিয়ে করলেও সৎ হওয়া যায়। মন—মন দিয়েই সব। কেন, ঠাকুর কি আমাকে বিয়ে করেন নি?'

'মা, যত চেষ্টা করি, কিছুতেই কুচিন্তা দূর করতে পারি না।' আরেকজন বললে কাতর হয়ে।

মা অভয় দিলেন: 'ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে। জোর করে হঠাৎ কি ও ছাড়া যায়? সৎসঙ্গে মেশো, ঠাকুরকে ডাকো, ক্রমে সব হবে। আমিই তো রইলুম।'

'কত আর মনের সঙ্গে লড়াই করা যায়?' আরেকজন এসে আক্ষেপ করল, 'এক বাসনা যায় তো অন্য বাসনা ওঠে।'

'বাসনাকে ভয় কী! যতক্ষণ অহং আছে ততক্ষণ বাসনা থাকবেই। ও সব তোমাদের কিছু ভয় নেই। যে ঠাকুরে শরণাগত, তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।'

'মা, ধ্যান-টানে তো কিছুই হয় না।' এক নাছোড়বান্দা ছেলে মার কাছে এল ফরিয়াদী হয়ে।

মা তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'তা নাই বা হল। ঠাকুরের ছবি আছে ঘরে? ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে।'

দেখবে তো খানিকক্ষণ দেখ, অনিমেষে দেখ।

সেই অনিমেষেই দেখে মা গিরিশের সমস্ত সংশয় ব্যাধি হরণ করলেন।

'কতদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছি ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিছু বলেন নি, শুধু অপলকে তাকিয়েছেন চোখের দিকে। আমার রাঙা চোখ শাদা করে

দিয়েছেন। আমার দু বোতলের নেশা বিলকুল মাটি হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু এরা, এরা কারা আসে মার কাছে?

এরা থিয়েটারের অভিনেত্রী। তারাসুন্দরী আর তিনকড়ি।

এরা কেন আসে? গণ্যমান্য স্ত্রী-ভক্তের দল আপত্তি করে উঠল। এরা তো পতিতা।

'হোক।' মা বললেন, 'এদের ঠিক ঠিক ভক্তি। এরা যেটুকু ভগবানকে ডাকে, একমনে ডাকে। আর', মা উদ্দীপ্ত হলেন : 'এরা যদি পতিতা হয়, আমি পতিতপাবনী নই?'

তবু বুঝি আপত্তি নিবে যায় না, তুষের মত জ্বলতে থাকে!

তখন মা রাগ করে বললেন, 'ওদের যদি আসতে না দাও, তাহলে আমিও এখানে থাকব না। কেন, গিরিশ ঘোষ যায়নি ঠাকুরের কাছে? আর বিনোদিনী ঠাকুরের পায়ের উপর মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে কাঁদেনি আকুল হয়ে? কে ওদের রুখতে পেরেছে?'

আপত্তিকারীরা নিরস্ত হল।

গিরিশ মূর্তিমান বিশ্বাস আর বিনোদিনী? বিনোদিনী মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।

॥ দশ ॥

স্টার থিয়েটারে প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'। গিরিশের লেখা। আর অভিনয়ে দক্ষ গিরিশ, সতী বিনোদিনী।

গিরিশের অভিনয়ে, টঙ্কারে-হুঙ্কারে সমস্ত স্টেজ গমগম করে উঠল।

'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।' গিরিশের সে কী লম্ফঝম্প!

রামলালকে নিয়ে রামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসেছেন। গিরিশের কথা শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হবার ভাব করলেন। বললেন, 'এ শালা আবার বলে কি রে।'

গিরিশ আবার গর্জন করে উঠল : 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

'সে কি রে? শিবনাম ঘোচাবি কি রে?' বালকস্বভাব ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন : 'তোকে এতদিন তবে শেখালাম কী!'

সিন-এর পর গিরিশ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, 'আপনি ভাববেন না, আমি আবার শিবনাম নেব।'

'নিবি তো? দেখিস।'

দক্ষরূপী গিরিশ সতী-সাজা বিনোদিনীকে বলছে, 'অপমান—মান আছে যার। ভিখারীর মান কি রে ভিখারিনী?'

'দেখেছ, শালা যেন অহংকারে মট-মট করছে।' বলে উঠলেন ঠাকুর।

'না, এ দক্ষের অহঙ্কার, গিরিশের নয়।' রামলাল আশ্বস্ত করল।

স্টারে দ্বিতীয় নাটক, 'ধ্রুবচরিত্র।' এও গিরিশেরই রচনা।

এতে গিরিশের কোনো পার্ট নেই, বিনোদিনী সুরুচি।

তৃতীয় রচনা 'নলদময়ন্তী।'

স্টার থিয়েটার দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ গুর্মুখের কী খেয়াল হল, বললে, 'আমি থিয়েটার আর রাখব না। বেচে দেব।'

'কাকে বেচবেন?'

'এই থিয়েটার যার জন্যে তৈরি হয়েছিল, কিংবা বলতে পারো যার ত্যাগে তৈরি হয়েছিল, তাকে।'

'বিনোদিনীকে? তাকে টাকায় বেচবেন?'

'না, না, সে যদি নেয় তাকে অমনি দান করে যাব। যোল আনা না নেয়, অন্তত আট আনা। কিন্তু নেবে সে? চালাবে সে থিয়েটার?'

'দেখি, ডাকাই বিনোদকে।' গিরিশ বললে।

'বা, কেন সে নেবে না? কেন চালাবে না? থিয়েটারই তো তার সব, তার দেহ, মন—আত্মা—'

কিন্তু গিরিশের ইচ্ছে নয় বিনোদিনী থিয়েটারের মালিকানা পায়।

বিনোদিনীর মাকে গিরিশ বললে, 'বিনোদের মা, তোমরা ও সব ঝঞ্ঝাটে যেয়ো না। তোমরা মেয়েমানুষ, পারবে না সামলাতে।'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু—'

'ওর মধ্যে কিন্তু কী! বিনোদকে তো সেই থিয়েটারই করতে হবে। সে তো মালিকানা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। একদিকে আদার ব্যাপার, অন্যদিকে জাহাজের খবর, নাজেহাল হয়ে যাবে। তোমরা পারবে না অত ঝামেলা পোয়াতে।'

গিরিশের কথাই বজায় রইল। বিনোদিনী নিলে না মালিকানা।

থিয়েটার কিনে নিল চার সরিক, অমৃত বসু, অমৃত মিত্র, দাসু নিয়োগী আর হরিপ্রসাদ বসু। সবাই গিরিশকে পিড়াপিড়ি করতে লাগল : 'আপনিও টাকা আনুন। একটা অংশ নিন।'

গিরিশ বললে, 'ছোট ভাই অতুলকে কথা দিয়েছি কোনোদিন মালিক হব না থিয়েটারের। সেই কথা রাখব। তাছাড়া আমরা কাজ করবার লোক, বোঝা বইবার লোক নই।'

নতুন আমলে প্রথম নাটক 'কমলে কামিনী।'

বনবিহারিণী—ভুনী—সাজল শ্রীমন্ত, আর বিনোদিনী খুল্লনা।

'নাটকে যেমন সমুদ্রবর্ণনা করেছেন পুরীতে গিয়ে ঠিক-ঠিক সেই সমুদ্র দেখে এলাম।' বললে ভুনী, 'আপনি বোধ হয় সব নিজের চোখে দেখে মিলিয়ে নিয়ে লিখেছেন?'

গিরিশ হাসল : 'আমি এখনো সমুদ্রই দেখিনি।'

'তা কি কখনো হয়? স্বচক্ষে না দেখে কি অমনি হুবহু লেখা যায়?'

'বা, লিখলাম তো।'

'না, না, তা কী করে হয়!' ভুনী মানতে চায় না কিছুতেই।

'কল্পনার জোরে হয়।'

তারপর ক্রমে ক্রমে 'চৈতন্যলীলা' লেখা হল। বিনোদিনী নিমাই সাজল।

তার আগেই অবশ্য গিরিশের দেখা হয়েছিল রামকৃষ্ণের সঙ্গে।

প্রথম দেখা বোসপাড়া লেনে দীননাথ বসু এটর্নির বাড়ি। মস্ত বড়লোক। রাব-দাব অনেক।

গিরিশের যাবার কী দরকার পড়েছিল?

গিরিশের বড় অশান্তি। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, চারদিকে শত্রুতা, বিপদের বেড়াজাল। সবাই বলে, গুরুকরণ ছাড়া কিছু হবে না।

কিন্তু কে গুরু? কোথায় গুরু? 'গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে।'

কত দিন শিবের কাছে প্রার্থনা করেছে, পদব্রজে গিয়েছে তারকেশ্বর। দাড়িগোঁফ রেখেছে, নিত্য গঙ্গাস্নান করেছে, হবিষ্যান্ন করেছে। আমার সংশয় ছেদন করো, যদি গুরুর উপদেশ ছাড়া এ সংশয় না যায় তা হলে তুমি আমার গুরু হও।

শুধু গুরুতেও বুঝি গিরিশের তৃপ্তি নেই। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শন কি সম্ভব নয়?

অনবরত মা-মা বলছে আজকাল। কে শিখিয়ে দিল ডাকতে, তা কে জানে।

মা বলতে-বলতে গিরিশের বুক ফুলে ওঠে, মুখ জ্বলজ্বল করে। বেটিকে গাল ভরে বুক ভরে ডাকলে সাড়া পাবই পাব।

কিছু চাইব না? শক্তি? যশ? অর্থ?

না। কিছু চাইব না।

থিয়েটারের সবাইকে তাই বলে বেড়ায় গিরিশ। মাকে ডাকো কিন্তু কিছু চেয়ো না।

'সত্যি, কিছুই চাইবি না?' কে যেন গিরিশের অন্তরে বসে ডাক দিল।

না, চাইব, শুধু তোমার দর্শন চাইব। বলব, মা, একটিবার দেখা দে।

সেদিন নির্জনে অন্ধকারে বসে সকাতরে মাকে ডাকছে, গিরিশ হঠাৎ অনুভব করল, কে যেন বলছে, 'তুই আমাকে দেখতে চেয়েছিস, এই দ্যাখ, আমি এসেছি।'

'কই, দেখতে পাচ্ছিনা তো।' গিরিশ অন্ধকারে চোখ মেলল।

'জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আরাম আনন্দ বিসর্জন দে।' কে যেন আবার বলল মনের কানে-কানে : 'নিজে শব না হলে কেউ শব-শিবাকে দেখতে পায় না। আর, দেখতে পেলে ফিরে আসে না সংসারে। সুতরাং শব হয়ে আমাকে দেখতে প্রস্তুত হ, আমি এখুনি দাঁড়াচ্ছি তোর সামনে।'

'তার মানে, বলতে চাও, আমি মরে যাব?'

'তা ছাড়া আবার কী।'

'আমি এখুনি মরলে আমার ছেলেমেয়ের কী অবস্থা হবে? কত গরিব বন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে মাস-মাস, তাদেরই বা কী দশা?' গিরিশ চোখ বুজল : 'না মা, ঐরূপে দেখতে পারব না তোমাকে!'

'বেশ, দেখা না চাস, বর নে।' স্বর স্পষ্টতর হল : 'আমার আসা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। এ সংসারে যা তোর কাম্য তাই নে চেয়ে।'

ভীষণ মুস্কিলে পড়ল গিরিশ। কী চাইবে, কী চাইলে ঠিক হবে, ঠিক করতে পারল না। বললে, 'বর চাই না।'

'সে কী, বর নিবিনে? মিছিমিছি কেন তবে ডাকলি? তা হলে অভিসম্পাত নে।'

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল গিরিশের।

অশরীরী স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে, 'বল, আমার ঐ উদ্যত খড়্গ কিসের উপর ফেলব?'

আমার কামনার উপর? লালসার উপর? ছি ছি, নিজের মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল গিরিশ। দেবতাকে মন্দ জিনিস দেব? খড়্গ ফেলবেন বলে একটা তুচ্ছ জিনিস তাকে দিতে পারব না। যদি কাটবেনই, আমার ভালো জিনিসই কাটুন।

বললে, 'মা, সুনট—ভালো অভিনেতা—বলে আমার যে সুনাম আছে তার উপর তোমার খড়্গ পড়ুক।'

'তথাস্তু।'

তারপরে আর কিছু নেই। দেখারও নেই, শোনারও নেই।

ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ। দেবতার ক্রোধও বরের সমান। গিরিশের নট-খ্যাতি ক্রমেই ম্লান হতে লাগল। বাড়তে লাগল লেখক-খ্যাতি।

গিরিশ বলতে আর তত নট নয়, যত নাট্যকার।

গিরিশের কথায় অমৃতলাল বসুও মা-মা করে। মা কালী করালবদনী।

ডাকে বটে কিন্তু প্রাণ ভরে না। শুকনো লাগে। ফাঁকা ঠেকে।

'ওর চেয়ে না ডাকা ছিল ভালো।' রিহার্সালের পর স্টেজের উপর বসে আছে, অমৃতলাল বিরসমুখে বললে গিরিশকে।

সে কী, মা-মা করে ডাকো মনে আনন্দ পাও না?' গিরিশ অবাক হবার ভাব করল।

'না, কই আর পাই? বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে।'

স্টেজের পেছনে যে সিন খাটানো তার পেছনে চলে গেল গিরিশ। ডাকল অমৃতকে।

জায়গাটা অন্ধকার। অমৃত থমকে দাঁড়াল।

গিরিশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। বললে, 'এমনি বোসো আমার মুখো-মুখি।'

বসল অমৃত।

অমৃতের দুই উরুতে দুই হাত রেখে গিরিশ প্রচণ্ড-চণ্ডিকার স্তোত্র পড়তে লাগল। বললে, 'তুমিও এমনি আমার দুই উরুতে দুই হাত রাখো আর আমারই সঙ্গে পাঠ করো স্তোত্র।'

অমৃতও যথাদিষ্ট স্তোত্রপাঠ করতে লাগল।

ক্রমে, এ কী হল অমৃতের? সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলতে লাগল, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ।

হঠাৎ অমৃত গিরিশের পা আঁকড়ে ধরে উল্লাসে আর্তনাদ করে উঠল : 'আজ আমার কী আনন্দ, কী শান্তি, তুমি আজ সত্যি-সত্যি আমায় ডাকিয়েছ মাকে। এত সুখ এত পূর্ণতা আমি আর কোনোদিন অনুভব করিনি। তুমি, তুমিই আমার গুরু। শুধু আমার নাট্যকলার গুরু নয়, আমার মনুষ্যত্বের গুরু।'

নাট্যকলার গুরুকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে অমৃত :

'আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার॥
বিয়ার ফুরায় পুন আনায় বিয়ার।
তিনশত্রুবধ তবু চাগে না চিয়ার॥
উঠি-উঠি বাধা পড়ে—'আর এক পাত্র'।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র॥'

পরের গুরুগিরি করতে যাচ্ছি, নিজের গুরু কই? নরবেশে কোথায় সে প্রত্যক্ষীভূত?

ভাগলপুরে একবার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে গিয়েছে গিরিশ। কবেকার সে প্রথম যৌবনের কথা। বেড়াতে গিয়ে সবাই একটা পাহাড়ে উঠে পড়ল। দেখল কাছেই একটা গুহা। সবাই নেমে পড়ল গুহাতে। নেমে, পরে আর বেরুবার পথ পায় না। কী হল? বেরুবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না যে।

এখন উপায়?

বন্ধুরা সকলে গিরিশকেই দায়ী করতে লাগল। বললে, 'তুমি নাস্তিক, তোমারই জন্যে এই অঘটন।'

'তোমরা তো সব আস্তিক। তোমাদের খাতিরে এ অঘটনটা তো না ঘটলেও পারত।' গিরিশ ফিরিয়ে দিল অভিযোগ।

কিন্তু বন্ধুরা ওসব মানতে প্রস্তুত নয়। এস আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরকে ডাকি। 'তোমাকেও ডাকতে হবে।' গিরিশের উপরে সকলে তম্বি করে উঠল।

এখন আপত্তি করবার সাহস হবে কার? প্রার্থনা করলে কী হয়, কার কাছে প্রার্থনা করব এমন কোনো প্রশ্নই আর তুলল না গিরিশ। সবার সঙ্গে সেও বসল প্রার্থনায়।

হঠাৎ, কে জানে কী হল, মিলে গেল রাস্তা।

'সেই দিন থেকেই বুঝি আপনার ঈশ্বরে বিশ্বাস এল?' জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ।

'না। সেই দিন থেকে ঈশ্বরকে ডাকা একেবারে ছেড়ে দিলাম।'

'সে কী?'

'ঠিক করলাম, যদি কোনো দিন ডাকি, যেন ভয়ে নয়, যেন ভালোবাসায় ডাকি।' গিরিশ বললে তন্ময়ের মত : 'ভয় কি ডাক? ভালোবাসাই ডাক।'

সেই ডাক কি এল?

'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে গিরিশ নাম শুনেছে রামকৃষ্ণের। চলো দেখে আসি।

বেজায় ভিড়। ঐ বুঝি কেশব সেন।

'ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, খোল-কত্তাল ধরেছে, এবার এক পরমহংসও খাড়া করেছে দেখছি।' মনে-মনে ভাবছে গিরিশ : 'ভেলকি মন্দ নয়। খদ্দের বাগাবার মতলোব। কিন্তু এ কেমনতর পরমহংস?'

পরমহংস কী যেন উপদেশ দিচ্ছে আর উৎসুক হয়ে শুনছে তাই কেশব আর তার চেলারা।

কী এমন তত্ত্বকথা! শুনেও শুনল না গিরিশ।

সন্ধে হয়েছে। ঘরে আলো দিয়ে গেল।

হঠাৎ গভীর আচ্ছন্ন গলায় পরমহংস জিজ্ঞেস করলে, 'সন্ধে হয়েছে?'

কী আশ্চর্য। সন্ধে না হলে আলো কেন? লোকটার কি সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নেই?

আবার প্রশ্ন : 'হ্যাঁ গা, সন্ধে হয়েছে?'

লোকটার ঢং দেখ। একজন বলে দেবে তবে উনি বুঝবেন সন্ধে হয়েছে কিনা। সন্ধে হয়েছে কি না হয়েছে নিজের চোখ চেয়ে বোঝবার সাধ্যি নেই?

বিরক্তিতে তিক্ত হল গিরিশ।

আর কী হবে দেখে! যার সন্ধে-সকাল জ্ঞান নেই সে আবার কেমন পরমহংস?

বাড়ি ফিরল গিরিশ। তার পিসেমশাই সদরালা গোপীনাথ বসু জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন দেখলে হে?'

'স্রেফ বুজরুকি।' এক কথায় উড়িয়ে দিল গিরিশ।

কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় দেখা।

রামকান্ত বসু স্ট্রিটে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ আসবেন। অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশও বাদ পড়েনি। সেও চলল মজা দেখতে।

বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। কিন্তু এ কী? এ সমাবেশে স্ত্রীলোক কেন? গিরিশের চমক লাগল। কে ও?

চিনলে না? ও বিধু কীর্তনী। রামকৃষ্ণকে গান শোনাতে এসেছে।

ভিড় সরিয়ে বিধু একেবারে রামকৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত। নত হয়ে

প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! হাত জোড় করে নয়, একেবারে মাটিতে মাথা রেখে অত্যন্ত দীনভাবে রামকৃষ্ণ নমস্কার করলেন বিধুকে।

শুধু বিধুকে নয়, যেই পায়ে প্রণাম রাখছে তাকেই মাথা দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন।

এমন অভিনব পরমহংস তো কোথাও দেখিনি। পরমহংসরা তো জানতাম কারু সঙ্গে কথা বলেন না, কাউকে নমস্কার করেন না, শুধু পদসেবা নেবার আগ্রহে মাঝে মাঝে পা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এ'র তো দেখছি দৈন্যের ভাব, বিনয়ের ভাব, অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। সকলকে সমানজ্ঞানে নমস্কার বিতরণ করছেন।

শুধু তাই নয়, বিধুর সঙ্গে পরিহাসসরস স্বরে কথা বলছেন।

গিরিশের আগের দিনের এক ইয়ারবন্ধু দৃশ্য দেখে ব্যঙ্গ করে উঠল। বললে, 'বুঝলে না হে, বিধু ওঁর আগের আলাপী, তাই একটু রঙ্গ হচ্ছে।'

কেন কে জানে, বন্ধুর কথাটা ভালো লাগল না গিরিশের।

'চলো হে গিরিশ, আর কী দেখবে?' পাশ থেকে বলে উঠল শিশিরকুমার। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার।

গিরিশের ইচ্ছে ছিল আরো একটু দেখে। কী কথা হয় না হয় শোনে। কিন্তু শিশিরকুমার ভীষণ জেদ করতে লাগল। আর দেখে না। দেখবার কিছু নেই এখানে।

চলে গেল গিরিশ।

আরো কিছু দিন ধরে স্টারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় হচ্ছে, বাইরের প্রাঙ্গণে পাইচারি করছে গিরিশ, এমন সময় মহেন্দ্র মুখুজ্জে এসে উপস্থিত।

'পরমহংস দেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন।' বললে মহেন্দ্র, 'তাঁর টিকিট লাগবে?'

'তিনি একা এসেছেন, না, সঙ্গে লোক আছে?'

'তা আছে কয়েকজন।'

'পরমহংসদেবের লাগবে না, কিন্তু আর-আরদের লাগবে।' বলে গিরিশ নিজেই এগিয়ে গেল অভ্যর্থনা করতে।

কে কাকে অভ্যর্থনা করে। ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই গিরিশকে নমস্কার করলেন। গিরিশ নমস্কার ফিরিয়ে দিল। সে কী! ঠাকুর দেখি আবার নমস্কার করছেন। কী করা, গিরিশ আবার ফিরিয়ে দিল। এমনি চলল কতক্ষণ প্রতিযোগিতা। তবু, কী আশ্চর্য, নিরস্ত হন না ঠাকুর। আবার নমস্কার।

প্রতিযোগিতায় হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের।

গিরিশ বললে, 'কিছুতেই দক্ষিণেশ্বরের ত্যাড়া ঘাড় সিধে করতে পারলাম না। হেরে গেলাম।'

উপরে নিয়ে এসে রামকৃষ্ণকে বক্সে বসিয়ে দিল গিরিশ। একটা পাখা-

ওয়ালাকে বললে হাওয়া করতে। শরীর খারাপ ছিল তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পালাল।

এদিকে ঠাকুর অভিনয় দেখছেন আর ঘন ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন।

কে, কে নিমাই সেজেছে?

প্রথম অভিনয়ের দিন সকালে বিনোদিনী গঙ্গাস্নান করেছে। একশো আট বার দুর্গা নাম লিখেছে। মহাপ্রভুর উদ্দেশে কাতরে প্রার্থনা করেছে, হে গৌরহরি, যেন এই মহাসংকটে কূল পাই, যেন তোমার কৃপা আমাকে না ছাড়ে। তুমি আমার দেহে-মনে স্ফুরিত হও।

প্রথম দিন থেকেই চৈতন্যলীলা ভীষণ জমে গেল। গিরিশ বললে, 'কত-কত প্লেই তো বিনোদিনী করেছে আর কত প্রশংসাই না সে কুড়িয়েছে এত দিন। কিন্তু চৈতন্যলীলায় তার নিমাইয়ের অভিনয় সব চেয়ে সেরা। এ একেবারে ভাবুকচিত্তবিনোদন।'

অভিনয়ের শেষে কত লোক ছুটে এসেছে বিনোদিনীর পায়ের ধুলো নিতে। দেশের কত অগ্রগণ্য মানুষ জানিয়ে গেছে অভিনন্দন।

'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়।' গাইতে গাইতে নিজেই আকুল হয়ে কাঁদছে বিনোদিনী। কতদিন ভাবাবেগে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। 'প্রভু, কেবা কার। সকলই সেই কৃষ্ণ।' অধ্যাপকের সঙ্গে তর্কে নিমাইয়ের আর অহংকার নেই। বিনোদিনীও তেমনি আত্মহারা। কেউ কারু নয়, একমাত্র কৃষ্ণই সমস্ত।

অভিনয়ের শেষে বিনোদিনী দেখা করতে এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে। আনন্দময় ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন, নাচতে নাচতে বললেন, "হরিগুরু, গুরুহরি, বল মা, হরিগুরু, গুরুহরি।'

বললে তাই বিনোদিনী।

বিনোদিনীর মাথার উপর দু হাত রেখে ঠাকুর বললেন, 'মা, তোমার চৈতন্য হোক।'

॥ এগারো ॥

'স্টার থিয়েটারে যাবেন কী!' ভক্তেরা কেউ-কেউ ঠাকুরকে বাধা দিতে চাইল : 'ওখানে বেশ্যারা অভিনয় করে। ভাবতে পারেন, নিমাই নিতাই পর্যন্ত ওরা সেজেছে।'

'তা হলই বা।' রামকৃষ্ণ উদার হাস্যে উড়িয়ে দিতে চাইলেন : 'আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখব। শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়। মেঘ বা ময়ূরকণ্ঠ দেখলে শ্রীমতী কৃষ্ণময়ী হয়ে উঠত।'

থিয়েটারে যাবার রাস্তায় হাতীবাগানে মহেন্দ্র মুখুজ্জের ময়দার কলে

খানিক বিশ্রাম করে যাচ্ছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে তামাক সেজে দিয়েছে।

'আর কিছু নয়, সন্ধে কি হয়েছে?' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর : 'তা হলে আর তামাকটা খাই না। সন্ধে হলেই আর কিছু নয়, সব কর্ম ছেড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে।'

দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসেছেন ঠাকুর। ঠাকুরকে হাওয়া করবার জন্যে লোক লাগিয়েছে গিরিশ।

'বাঃ, এখানে বেশ! এসে বেশ হল।' চারদিকে লোকজন আলো দেখে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, 'অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মাস্টার সায় দিল।

'আচ্ছা, এখানে কত নেবে?'

'কিছু নেবে না।' মহেন্দ্র আশ্বস্ত করল : 'আপনি এসেছেন তাইতে ওদের খুব আহ্লাদ হয়েছে।'

'আহাহা, কেমন দেখ।'

ড্রপ উঠে গেছে। মুনি ঋষিরা গান গাইছে :

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী॥'

মাস্টারকে বললেন ঠাকুর, 'দেখ যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং মনে করবে।'

নিমাইয়ের টোলের শিক্ষক, গঙ্গাদাস, বলছে শ্রীবাসকে, 'আমরাও তো বিষ্ণুপূজা করে থাকি। আপনারা সবাই মিলে সংসারটা ছারখার করলেন!'

'দেখলে তো, এ সংসারীর শিক্ষা।' বললেন ঠাকুর, 'এও করো ওও করো। সংসারী যখন শিক্ষা দেয় তখন দুদিক রাখতে বলে।'

নিমাই বলছে, 'আমি ইচ্ছে করে সংসারধর্ম উপেক্ষা করিনি। আমার বরং ইচ্ছে যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—কোন হেতু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি কি করি; ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি। প্রাণ ধায়, বুঝালে না ফেরে, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।'

ঠাকুর বললেন, 'আহা।'

খড়দার নিত্যানন্দবংশের এক গোস্বামী এসেছে, দাঁড়িয়েছে ঠাকুরের চেয়ারের পিছে। তাকে দেখে ঠাকুরের মহা আনন্দ। তার হাত ধরে বললেন, 'এখানে বোসো না। তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।'

নিমাই শচীমাতাকে সন্ন্যাসের কথা বলছে : 'মা গো, হরিপ্রেমে হইবে সন্ন্যাসী।'

শচী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছা দেখে দর্শকেরা হাহাকার করছে। ঠাকুর নির্বিচলে দেখছেন এক দৃষ্টে। দুচোখে জল উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

অভিনয় শেষে গাড়িতে উঠছেন, এক ভক্ত জিজ্ঞেস করল ঠাকুরকে, 'কেমন দেখলেন?'

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

থিয়েটারে ঠাকুরের এই প্রথম আসা। নটনটীর জীবন পুণ্য হয়ে গেল, ধন্য হয়ে গেল রঙ্গালয়।

অমৃত বোস লিখল : 'বখাটে নট ও অখাঁটি নটী দ্বারাই দেশে ধর্মপ্রচার হল! ছি ছি, এ কথা মনে এলেও মুখে স্বীকার করতে নেই, তাতে যে মহা পাপ। কিন্তু কে জানে কেন, এ নগণ্য সম্প্রদায়কে জঘন্য বেদীতে বসে কৃষ্ণ-মহিমাকীর্তন করতে শুনে বীর ধর্মধ্বজেরা ভয় পেল আর ধর্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জেগে উঠে ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করতে আরম্ভ করল। নগরে গ্রামে পল্লীতে সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছেয়ে গেল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও সগর্বে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আর লজ্জিত হল না।'

শিলা হীরক হয়ে গেল। নাট্যশালা তীর্থের চেহারা নিলে।

'লিখিলা চৈতন্য লীলা, হীরক হইল শিলা,
নাট্যশালা হল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার।'

অমৃতলাল বসু আরো লিখলে :

'বাজে শিঙা বাজে খোল রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।
ছুটিল নামের বন্যা ধরনী হলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণ-পায়॥
গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে।
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে
সেই ইষ্টে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত বক্ষে॥
জপতপ পূজাকর্ম জ্ঞান ভক্তি ধর্মাধর্ম
মর্মের নৈবেদ্য পদে ধীর ধরিলেন ডালি।
দেখে রাম রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ স্রষ্টাসৃষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ কালী॥'

বাড়ির কাছে চৌরাস্তার রকে বসে আছে গিরিশ, ঠাকুর যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বলরাম বোসের বাড়ি যাবেন বুঝি!

ঐ গিরিশ ঘোষ রকে বসে। ঠাকুরের সঙ্গে যাচ্ছে নারান, দেখিয়ে দিল।

গিরিশের সঙ্গে চোখোচোখি হল ঠাকুরের। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর নমস্কার করলেন।

গিরিশ ফিরিয়ে দিল নমস্কার।

সেদিন আর নমস্কারের প্রতিযোগিতা হল না। কিন্তু কোনো কথাও হল না। ঠাকুর দক্ষিণ দিকে চললেন। যেমন বসে ছিল গিরিশ তেমনি বসে রইল।

কিন্তু বসতে দিচ্ছে কই স্থির হয়ে? মনে হচ্ছে কে যেন বুকে বসে টানছে দক্ষিণে।

প্রাণ চাইছে আমিও সঙ্গ ধরি। যাই তাঁর পিছু-পিছু। উঠি-উঠি করেও উঠল না শেষ পর্যন্ত। কেন যাব? কেন উঠব? কই আমাকে তো তিনি ডাকেন নি। সামান্য একটা ইশারা পর্যন্ত করেন নি।

কত দিন থেকে গুরুর সন্ধান করছে গিরিশ। একবার তারকনাথ দয়া করেছিলেন, সেই তারকনাথকে ডাকলেই তো চলে যায়। তবে সবাই বলে কেন গুরু ছাড়া উপায় নেই। তারকনাথকে যে ডাকবে, সবাই বলে, গুরু ছাড়া ডাকায় জোর পাবে না, সব এলোমেলো হয়ে যাবে। গুরু জুটলে ঠিক-ঠিক হবে, তাড়াতাড়ি হবে, হাতে-নাতে হবে। বটে! গুরুকে যে ঈশ্বর জ্ঞান করতে হবে, তেমন মানুষ কোথায়? মানুষ তো আমার মতই মানুষ। তাকে ঈশ্বর ভাবি কী করে? আর যাই করি ভণ্ডামি করতে পারব না। আমার গুরুটুরু মিলবে না কোনোদিন।

সেই গুরুভক্ত চিত্রকরের কথা মনে পড়ল।

নাটকে দৃশ্যপট আঁকে চিত্রকর। তার গৌরভক্তি আছে বলেই দৃশ্যপটে বুঝি এমন সজীব পেলবতা এসেছে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল গিরিশ, 'তোমার গৌর কী করছেন?'

'কী আর করবেন!' বললে চিত্রকর, 'ভোগের রুটি খেয়ে যাচ্ছেন!'

'খেয়ে যাচ্ছেন! বলো কী আশ্চর্যের কথা!'

'আর কী বলব! সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌরহরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। পরে দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে দাঁতের দাগ।'

'তোমার কী ভাগ্য!' গিরিশ তার হাত চেপে ধরল : 'কী করে এটা হয় বলতে পারো?'

'গুরুকরণ ছাড়া এ হবার নয়।' চিত্রকর গম্ভীর হল : 'গুরুর নিকট উপদিষ্ট হলেই এ সম্ভব!'

'গুরু—গুরু কোথায় পাব?'

গিরিশ বাড়ি গিয়ে ঘরে দোর বন্ধ করে কাঁদতে বসল। হে অন্তর্যামী, যদি গুরু ছাড়া এ অন্ধকার না কাটে তাহলে কৃপা করে গুরু মিলিয়ে দাও। নয়তো তুমি নিজেই গুরুরূপে অবতীর্ণ হও।

'পরমহংসদেব আপনাকে ডাকছেন।'

চমকে উঠল গিরিশ। তাকিয়ে দেখল চোখের সামনে নারান দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

'কোথায়?' গিরিশ উথলে উঠল।

'বলরামবাবুর বাড়ি।'

এক নিশ্বাসে উপস্থিত হল গিরিশ। বৈঠকখানায় এক ধারে বসল নীরবে।

বলরাম পীড়িত, তবু উঠে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

'বাবু, আমি ভালো আছি—বাবু, আমি ভালো আছি।' হঠাৎ বলে উঠলেন ঠাকুর।

এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা? বলরাম পীড়িত হতে পারে কিন্তু আমি সুস্থ, আমি প্রকৃতিস্থ। আমি বিকৃতিশূন্য।

বলতে-বলতেই ঠাকুরের কীরকম ভাবান্তর হল।

গিরিশের কি মনে হল, এ এক ঢং?

'না, না, এ ঢং নয়, ঢং নয়।' আপনমনে বলে উঠলেন ঠাকুর। যেন বা গিরিশকেই শাসন করলেন।

কী আশ্চর্য, মনের কথা টের পেলেন কী করে?

এগিয়ে বসল গিরিশ। জিজ্ঞেস করল, 'গুরু কী?'

'গুরু আর কী! কুটনী। যে মিলন ঘটায়। বলতে পারো ঘটক।'

'আমার গুরু মিলবে কবে?'

'তোমার ভাবনা কী! তোমার তো গুরু হয়ে গিয়েছে।' ঠাকুর হাসলেন।

'হয়ে গিয়েছে!' স্তব্ধ হয়ে গেল গিরিশ। খানিক পরে জিজ্ঞেস করলে, 'মন্ত্র কী?'

'শুধু ঈশ্বরের নাম। যে কোনো নাম। যাতে মন খুশি তাই। কবীর কী করে নাম পেল জানো?' বলতে লাগলেন ঠাকুর : 'গঙ্গার ঘাটে শুয়ে ছিল কবীর। প্রাতঃস্নান করতে এসে রামানুজ অন্ধকারে কবীরের দেহ মাড়িয়ে দিল। সমস্ত দেহেই রাম বর্তমান এই জ্ঞানে রামানুজ 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করল। সেই শব্দ কানে গেল কবীরের। আর সেই শব্দকেই সে মন্ত্র করলে। রাম নাম জপ করেই তার সিদ্ধি হল।'

তা হলে আমার সিদ্ধি কে আটকায়? গিরিশ আনন্দে ভরে উঠল। 'তোমার গুরু হয়ে গিয়েছে!' তবে আর কার কথা শুনি?

রামকৃষ্ণ গিরিশের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। দম্ভ ছাড়া আর কী! দম্ভের জন্যেই তো মানুষকে গুরু করতে সে রাজি ছিল না। মানুষ হয়ে মানুষের সামনে হাত জোড় করে থাকব, পদসেবা করব, কথায়-অকথায় ওঠবোস করব? সেই দম্ভেই তো কঠিন হয়ে ছিল। রামকৃষ্ণ তাকে নরম করে দিলেন। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কোথাও যেতে হবে না। তোমার গুরু হয়ে গিয়েছে।

বলরাম এক থালা সন্দেশ এনে ধরল ঠাকুরের সামনে। একটা ভেঙে সামান্য একটুখানি নিলেন ঠাকুর। উপস্থিত অনেকেই প্রসাদ নিল। গিরিশ পারল না হাত বাড়াতে। সে কি লজ্জায়? না, এখনো তার অহঙ্কার!

অহঙ্কার কি সহজে উচ্ছিন্ন হবার?

বেরিয়ে আসছে, ভক্ত হরিপদ জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন দেখলেন?'

'বেশ ভক্ত।' উত্তর দিল গিরিশ : 'বেশ বিনয়ী।'

চিত্তের দারিদ্র্য কি সহজে আরোগ্য হবার?

ঠাকুর আবার এসেছেন থিয়েটারে।

সাজঘরে বসে আছে গিরিশ, দেবেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে, 'পরমহংসদেব এসেছেন।'

'বেশ তো।' গিরিশ বললে, 'বক্সে নিয়ে গিয়ে বসান।'

'সে কি, আপনি তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবেন না?'

'কেন?' বিরক্ত হল গিরিশ : 'আমি না গেলে কি তাঁর গাড়ি থেকে নামাও অসম্ভব?'

তবুও গেল গিরিশ। ঠাকুরের মুখখানি দেখে তার মনে ধিক্কার জাগল। অমন যাঁর মুখভাব তাঁর প্রতি আমি নির্দয় হয়েছি!

কী হল কে জানে, নিজের থেকেই গিরিশ ঠাকুরের পা স্পর্শ করে প্রণাম করল। হাতে একটি গোলাপফুল ছিল, দিয়ে দিল ঠাকুরকে।

ঠাকুর ফুলটি নিলেন। নিয়ে আবার তখুনি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফুল দিয়ে আমি কী করব? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার!'

'দুজনের অধিকার।' বললেন ঠাকুর, 'এক দেবতার, আরেক ফুল-বাবুর।'

স্টার থিয়েটারের দোতলায় ড্রেস সার্কেলের দর্শকদের বসবার জন্যে আলাদা একটা কামরা ছিল, সেই কামরায় ঠাকুর এসে বসলেন চেয়ারে। আরেকটা চেয়ারে গিরিশ বসল। দেবেন মজুমদারসহ অনেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তারা কেউ বসল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। দেবেনকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'বসুন না।' তবু দেবেন নিস্পন্দ।

গিরিশের বুঝি তখনো আসেনি নম্রতা। গুরুর সঙ্গে যে সমান আসনে বসতে নেই জাগেনি সে মূল্যবোধ।

এটা-ওটা বলতে লাগলেন ঠাকুর। গিরিশের মনে হল একটা স্রোত যেন তার মাথা থেকে মেরুদণ্ডে ওঠা-নামা করছে।

একটি বালক ভক্তের সঙ্গে ঠাকুর ভাবাবস্থায় খেলা করতে লাগলেন।

এ আবার কোন ঢং! গিরিশের মনে নিন্দার ছোঁয়াচ লাগতেই ঠাকুরের ভাবভঙ্গ হল। গিরিশের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার মনে বাঁক আছে।'

তাতে আর সন্দেহ কী! বাঁক কি একটা? বাঁক অসংখ্য।

'কিন্তু এ বাঁক যায় কিসে?'

'বিশ্বাসে।' সহজ করে বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বিশ্বাস করা কি এতই সহজ?

সেদিন, বেলা প্রায় তিনটে, থিয়েটারে আছে গিরিশ, একটা চিরকূট হাতে এল। চিরকুটে লেখা, মধুরায়ের গলিতে রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেব আসবেন। কে দিল এ চিরকুট? কোত্থেকে এল? কেউ বলতে পারে না। তা রাম দত্তের বাড়িতে আসবেন তো আমার কী। চিরকুটে তো আমার নাম লেখা নেই।

তবু গিরিশের বুকের মধ্যে বসে কে টানতে লাগল। সেই টানের কাছে

বুঝি কোনো যুক্তিই টেঁকে না।

অজানা বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাব? ভাবতে-ভাবতে অনাথবাবুর বাজার পর্যন্ত চলে এল গিরিশ। আমাকে সেখানে কে চেনে? সেখানে পরমহংসদেব এসেছেন তো আমার কী! ভাবতে-ভাবতে একেবারে রাম দত্তের বাড়ির দুয়ারে এসে উপস্থিত।

দোরগোড়ায় সুরেশ মিত্তির বসে। গিরিশকে দেখে অবাক হবার ভাব করল : 'একী, আপনি এখানে কী মনে করে?'

গিরিশ পস্টাপস্টি বললে, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করতে।'

গিরিশকে ধরে সুরেশ মিত্তির, কাছেই, তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। শুনুন আমাকে তিনি কী দারুণ কৃপা করেছেন!

সে সব জেনে গিরিশের কী লাভ! গিরিশ যদি কৃপা পায় তা হলেই সে বরং চরিতার্থ।

'শুনে কী হবে? চলুন দেখি, প্রত্যক্ষ করি।'

গিরিশই টেনে নিয়ে গেল সুরেশকে। দেখল উঠোনে রামবাবু খোল বাজাচ্ছেন আর নাচছেন রামকৃষ্ণ। গান হচ্ছে। 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কে বলে এ রাম দত্তের অঙ্গন? এ টলমল করা নদীয়া। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য এ আনন্দ থেকে গিরিশ বঞ্চিত। সে না পারছে গাইতে না বা বাজাতে। নৃত্য করা তো দূরস্থান।

কিন্তু প্রণাম করতে বাধা কী!

নৃত্য করতে-করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ভক্তেরা প্রণাম করতে লাগল। গিরিশের ইচ্ছে হল, কাছে যাই, নত হই, কিন্তু লোকলজ্জায় পারল না এগোতে। লোকে কী ভাববে সে ভাবনাই বড় হয়ে রইল।

ঠাকুর বুঝি বুঝলেন তার মনের ভাব। সমাধিভঙ্গে আবার নৃত্য সুরু করলেন। আর এবার গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন সমাহিত ভঙ্গিতে। গিরিশের আর এগিয়ে যাবার পরিশ্রম করতে হবে না। ইচ্ছে হলে একটু নুয়ে পড়েই সে ঠাকুরের চরণস্পর্শ করতে পারে।

আশ্চর্য, লোকলজ্জাকে আর ভয় নেই। ঠাকুর নিজের থেকেই অনেক এগিয়ে এসেছেন। আর নত হতে পরিশ্রম নেই। গিরিশ অসঙ্কোচে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করল।

সঙ্কীর্তনশেষে ঠাকুর বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন।

গিরিশের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। জিজ্ঞেস করলে, 'সেদিন যে বাঁকের কথা বললেন, আমার সে বাঁক যাবে তো?'

'যাবে।' বললেন ঠাকুর।

'যাবে?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না গিরিশ।

'যাবে।'

'সত্যি যাবে?' গিরিশ প্রায় উচ্ছ্বসিত।

'যাবে।'

কাছেই ভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিল, সে ধমকে উঠল : 'যাও না, উনি বললেন, যাবে, তবু মিছিমিছি কেন ত্যক্ত করছ?'

অন্য সময় হলে মনোমোহনকে ছেড়ে কথা কইত না গিরিশ। আজ, আশ্চর্য, মনের মধ্যে কোনো রূঢ়তাই খুঁজে পেল না। সত্যিই তো, বিরক্তই তো করছি। ঠাকুর তো একেবারে বলেইছেন যে যাবে, তবে তাঁকে একশোবার বলাবার চেষ্টা কেন? যাঁর এক কথায় আমার বিশ্বাস নেই তাঁর একশো কথায়ও আমার বিশ্বাস হওয়া উচিত নয়। মনোমোহনের দোষ নেই। আসলে আমিই পাপী। আমিই অবিশ্বাসী।

থিয়েটারে ফিরে যাচ্ছে গিরিশ, দেবেন সঙ্গ ধরল। বললে, 'কেমন দেখলেন?'

'কী বলব। কিন্তু, বলুন তো, আমার প্রতি তাঁর কৃপা হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। আপনি একবার দক্ষিণেশ্বরে যান।'

যাব। কিন্তু যখন জানবেন আমি কত বড় পাপাত্মা, কত বড় দুরাচার, তখন নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু, যাই বলি, ওঁর মুখে তো শুধু শান্তি আর ক্ষমা, শুধু প্রশ্রয়-আশ্রয়। কাউকে নিন্দা করছেন, প্রত্যাখ্যান করছেন এমন তো একটাও কোথাও কুটিল রেখা নেই। সব বলব তাঁকে। আত্ম-পরিচয় দেব। বলব সব ব্যর্থতার কাহিনী। তিনি না শুনবেন তো কে শুনবে। তিনি না তুলবেন তো কে তুলবে।

'ও মশাই, কাল আপনার জন্যে একটা চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন?'

পরদিন থিয়েটার যাবার পথে একজনের সঙ্গে দেখা।

গিরিশ দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

আমাকে চিনবেন না। আমার নাম তেজচন্দ্র মিত্র।

'তা আপনি চিরকুট পেলেন কোথায়? কে দিল?'

'কে আবার দেবে! ও তো আমার হাতেই লেখা। থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতেই লিখলাম চিরকুট।'

'কিন্তু চিরকুটের সংবাদটুকু আপনাকে দিল কে?' গিরিশ ঝাঁজিয়ে উঠল।

'কে আবার! স্বয়ং ঠাকুর দিলেন। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দাও আমি এসেছি।'

'স্বয়ং ঠাকুর বললেন?' গিরিশ বিহ্বল হয়ে গেল : 'কিন্তু আমাকে কেন ডাকলেন বলতে পারেন!'

'তার আমি কী জানি।' তেজচন্দ্র স্তব্ধনেত্রে তাকাল : 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে সে কৈফিয়ৎ আমার জানা নেই।'

॥ বারো ॥

হোমিওপ্যাথি করে কত লোকের অসুখ সারায় গিরিশ কিন্তু তার নিজের অসুখ সারায় কে?

শীতের রাত, আড়াইটে, থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরে শুয়েছে, গিরিশ শুনতে পেল রাস্তায় কে কাঁদছে। চাকরকে পাঠিয়ে দিল, দ্যাখ তো কে কাঁদে।

চাকর এসে বললে, একটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান।

'কী হয়েছে?'

'জ্বর।'

'রাস্তায় কেন?'

'ঘরবাড়ি নেই। গরুর গাড়ির নিচে শুয়ে কাঁপছে। গায়ের উপর একটা চাদর পর্যন্ত নেই।'

বিছানায় ছটফট করতে লাগল গিরিশ। মনে হল তার বিছানার এই গরম এই যেন এক জ্বর আর এই নরম আরাম এ এক কণ্টকস্তূপ।

টিঁকতে পারল না। গিরিশ উঠে পড়ল। লোকটাকে একটা কম্বল দিল। দিল ওষুধ। বললে, 'যা, ভয় নেই, এই এক দাগ ওষুধেই তোর জ্বর সেরে যাবে।'

'সংসার যে সাগর এ কথা ঠিক, কূলকিনারা নেই।' বলছে গিরিশ, 'ভ্রান্তি' নাটকে রঙ্গলালের মুখ দিয়ে : 'কিন্তু অভ্রান্ত একটি ধ্রুবতারাও আছে। সেটি মানুষের দয়া, মানুষের মমত্ববোধ।'

যোগেনের ভীষণ মাথা ধরেছে, বলরাম বোসের বাড়িতে একটা ঘরে তক্ত-পোশের উপর পড়ে আছে। তুই যা তো মহীন, গিরিশবাবুকে বল তো একটা কিছু ওষুধ দিক।

'কেন মাথা ধরা তা কিছু বলব?'

'কেন আবার কী। কদিন অনবরত জপ করছি, রাত্রেও বিশ্রাম নেই, হয়তো তাই মাথাব্যথা।'

পাশের ছোট গলি দিয়ে মহীন ছুটে চলে এল গিরিশের কাছে।

'শিগগির চলুন। যোগেনের সাংঘাতিক মাথা ধরেছে।'

গিরিশ স্নান করতে যাচ্ছিল, থামল। বললে, 'আমি এখুনি যাচ্ছি। তুই গিয়ে যোগেনকে একটু ফিকে চা করে খাইয়ে দিগে যা, তা হলেই মাথার যন্ত্রণা ভালো হবে।'

'বলেন কী!' মহীন বিমূঢ় মুখে বললে, 'যোগেন যে চা খায় না।'

'তা আমি জানি।'

'সে কী! চা খেলে যে তার মাথা ধরে।'

'সেই জন্যেই তো বলছি ফিকে চা খেলে উপকার হবে। আমি পরে গিয়ে যা ওষুধ দেবার দিচ্ছি।'

দুধ-চিনি না দিয়ে ফিকে করে চা খাইয়ে দিল মহীন।

গিরিশ এসে দেখল তাকিয়া কোলে নিয়ে তাতে দু কনুই চেপে তক্তপোশে বসে যোগেন গল্প করছে।

'কী রে, মাথাব্যথা কেমন আছে?' গিরিশ হুমকে উঠল।

যোগেন হাসল। বললে, 'ফিকে চা-টা খেতে মাথাব্যথা ছেড়ে গিয়েছে।'

'দেখলি শালা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণ দেখলি?' গিরিশও আপন মনে হাসতে লাগল।

'তুমি কী চিকিৎসা করছ হে?' ডাক্তার কাঞ্জিলাল বললে একদিন গিরিশকে, 'প্যাথলজি না জানলে কখনো চিকিৎসা করা যায় না।'

মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র, খ্যাতিমান অস্ত্র-চিকিৎসক, সে একথা বলতে পারে বৈ কি।

'কিন্তু তুমি যে এত কাশছ, আমাদের একটা দীনহীন ওষুধ খেয়ে দেখ না।' মৃদুরেখায় হাসল গিরিশ।

'খেতে পারি, কিন্তু যদি সেরে যাই, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে সেরে গেল বলতে পারব না।'

'সেরে গেলে তবে কী বলবে?'

'বলব এমনিই সেরে গেছে।'

'তাই বোলো।' হাসল গিরিশ : 'ওষুধের গুণ তোমাকে স্বীকার করতে হবে না। তোমার সেরে গেলেই হল।'

ওষুধ খেয়ে বাড়ি চলে গেল কাঞ্জিলাল।

পরদিন আবার এসেছে গিরিশের বাড়ি।

'কী হে, রাত্রে কেমন ছিলে ওষুধ খেয়ে?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'রাত্রে আর কাশি হয়নি বটে, কিন্তু তা তোমার ওষুধের গুণে নয়—ওষুধ না খেলেও আর কাশি হত না।'

'প্যাথলজি হত।' হাসতে লাগল গিরিশ।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা প্রহসনে ডাক্তার নন্দীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছে গিরিশ : 'বদ্যি হাকিম হোমিওপ্যাথ—এরা রোগের কী জানে! প্যাথলজি পড়েছে?'

লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করে গিরিশ।

বাল্যবন্ধু নৃপেন বোসের পুত্রবধু স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছে। লক্ষণ কী? ঘুমুলে পর কালো-কালো কুকুরের বাচ্চা স্বপ্ন দেখে। বার্লির জল পর্যন্ত হজম করতে পারে না, ডাক্তার শশীঘোষের বোনের উপসর্গ, শশা খাবার ইচ্ছে। আর শৈলেশ্বর বসুর ছোট ছেলে আমোশায় ভুগছে, কিন্তু বায়না ধরেছে আদা খাবে। লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করে সমস্ত রোগের আরাম করল গিরিশ।

এবার আমার রোগের আরাম করো।

তোমার রোগের লক্ষণ কী?

তিন লক্ষণ। মদ। কাম। আর অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মদ খাচ্ছিস তো খা না। কতটুকু খাবি? আর কত

দিন খাবি? তুই এ নেশা করছিস আরেক নেশার খবর পাসনি বলে। তোকে যখন সে নেশা পেয়ে বসবে, তখন এ নেশা কোন ছার!'

ও মদ খায় এ আমাদের ভালো লাগে না। ভক্তরা কেউ-কেউ আপত্তি করে ঠাকুরের কাছে।

'ও মদ খায় তাতে তোর কী!' ধমকে ওঠেন ঠাকুর : 'তুই তোর নিজের কাজ দ্যাখ, পরের ব্যাপারে তোর মাথাব্যথা কেন? ও শূরভক্ত, বীরভক্ত, মদে ওর দোষ হবে না।'

'হবে না?'

'না, ওর ভৈরবের অংশে জন্ম, তাই মদ্যপানে এত আসক্তি।' ঠাকুর পূর্বকথা স্মরণ করলেন : 'তখন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে মায়ের জন্যে খুব কাঁদছি, একদিন দেখতে পেলাম এক উলঙ্গ উগ্র বালকমূর্তি নাচতে নাচতে এসে মন্দিরে প্রবেশ করল। তার মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, কোমরে রূপোর পৈটি, বাম কুক্ষিতে সুরাপাত্র, ডান হাতে সুধাভাণ্ড। জিজ্ঞেস করলাম, কে তুই? বললে, আমি ভৈরব। এখানে এসেছিস কেন? উত্তর দিল, আপনার কাজ করতে এসেছি। এই সেই ভৈরব। এই গিরিশই সেই ভৈরব। ওর ভয় কী। মদ ওকে বিপথ-গামী করবে না। ও মদ-মাতাল আছে মন-মাতাল হয়ে যাবে।'

আর কাম?

'দেহ ধরেছিস, কাম থাকবে না?' বললেন ঠাকুর, 'কাম না থাকলে তো ঈশ্বর-কামনাও থাকবে না। একটু বেঁকিয়ে দে, কামকে প্রেম কর।'

আর অহঙ্কার?

অহং কার? যখন এ বুদ্ধি জাগবে যা নিয়ে জাঁক করছি সে আমার কৃতিত্ব নয়, আরেকজনের কৃপা, তখন আর অহঙ্কার কোথায়?

মদ যাবে স্মরণে-মননে। কাম যাবে প্রেমে-ভক্তিতে। আর অহঙ্কার শরণা-গতিতে, সর্বসমর্পণে।

ঠাকুর তাঁর ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় একখানা কম্বলের উপর বসে আছেন। পাশে বালক ভক্ত ভবনাথ।

'আসবে হে আসবে।' বলছেন ঠাকুর, 'ঠিক আসবে। না এসে যাবে কোথায়? আমি ষোল আনা চেয়েছিলুম, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

ঠিক তখুনি গিরিশ এসে উপস্থিত। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু আবৃত্তি করছে মনে মনে।

'এসেছিস?' ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : 'আমি জানি তুই আসবি। মাইরি জিজ্ঞেস কর, একে,' ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন : 'এতক্ষণ তোর কথাই বলছিলাম। বোস, পাশে এসে বোস।'

পাশে বলস গিরিশ। বললে, 'আমি কিন্তু উপদেশ শুনব না। নিজে ঢের-ঢের লিখেছি উপদেশ—ওসবে কিছু হয় না, হবার নয়। আমার যদি কিছু করে দিতে পারেন তাই করুন।'

'আমার কিছু করে দিতে হবে না। তোরটা তুই নিজেই করে নিতে পারবি।' ঠাকুর হাসলেন। রামলালকে উদ্দেশ করে বললেন, 'রাম, কি রে সেই শ্লোকটা, বল্ তো—'

শ্লোক আবৃত্তি করল রামলাল। তার অর্থ, নির্জনে পর্বতগহ্বরে বসলেও কিছুই হয় না। বিশ্বাসই একমাত্র পদার্থ।

'তোমার তো বিশ্বাস আছে গো।' বললেন ঠাকুর, 'আর তবে কী চাই?'

'বিশ্বাস আছে!'

'বিশ্বাস না থাকলে কি ওসব জিনিস কলমে আসে!'

তা হলে শুধু বিশ্বাসেই হবে? গিরিশ সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করল সে পাপী নয়, সে নির্মল নিষ্কলুষ।

এমন ভাবনা ভাবাতে পারে কে এই আশ্চর্য পুরুষ!

জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'কে আপনি যার পায়ে আমার মত দাম্ভিকের মাথা নত হল! এক নিমেষে একেবারে ভয়শূন্য হয়ে গেলাম!'

'আমায় কেউ বলে রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ', হাসিভরা মুখে বললেন ঠাকুর, 'আমি এইখানেই থাকি।'

প্রাণ ঢেলে প্রণাম করল গিরিশ।

ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। গিরিশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দর্শন পেলাম, এখন আমি কী করব?'

'কী করবি। যা করছিস তাই কর।'

'মানে, থিয়েটার?'

'তা কর না।'

স্বধর্মে ঠিক অবস্থিত রাখলেন। ভাব নষ্ট করলেন না।

চৈতন্যলীলার পর গিরিশ প্রহ্লাদচরিত্র লিখলে। নামল স্টারে, অমৃত মিত্র হিরণ্যকশিপু, বিনোদিনী প্রহ্লাদ।

দু অঙ্কের ছোট নাটক, তার সঙ্গে লেজুড় জুড়ল অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট।' ঠাকুর দেখতে এসেছেন। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম আর নারায়ণ।

'বা, তুমি বেশ সব লিখছ!' গিরিশকে বললেন ঠাকুর।

'শুধু লিখছিই। কিন্তু ধারণা কই?' গিরিশের স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

'না, তোমার ধারণা আছে।' আশ্বস্ত করলেন ঠাকুর : 'ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না।'

'কিন্তু মনে হয়', গিরিশ বললে, 'থিয়েটারগুলো আর করা কেন?'

'না, না, ও থাক। ওতে লোকশিক্ষা হবে।'

রঙ্গমঞ্চে প্রহ্লাদকে দেখে ঠাকুর প্রহ্লাদ-প্রহ্লাদ বলে ডেকে উঠলেন। প্রহ্লাদকে হাতির পায়ের তলায় ফেলছে, ঠাকুর কেঁদে খুন। অগ্নিকুণ্ডে

ফেলছে, আবার কান্না। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ দেখে সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে গিরিশ তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, 'এবার কি বিবাহ-বিভ্রাট দেখবেন?'

'না, না, প্রহ্লাদচরিত্রের পর ওসব কী!' ঠাকুর আপত্তি করে উঠলেন: 'বেশ ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছিল, এখন আবার কিনা সংসারের কথা! যা ছিলুম তাই হলুম! আমি ওসব বিভ্রাট দেখব না।'

'আচ্ছা, বলুন, আমার আর কর্মই বা করা কেন?' জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'না, কর্ম ভালো।' বললেন ঠাকুর, 'জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে। যাঁরা জ্ঞানী, আপ্তসার, তাঁদের শুধু আমার হলেই হলো। কিন্তু যাঁরা প্রেমী তাঁরা ঈশ্বর লাভ করেও আবার লোকশিক্ষা দেন। তাঁরা কিন্তু পরের জন্যে রাখেন। তুমিও পরের জন্যে রাখবে।'

'আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন।' নত হল গিরিশ।

'তুমি মার নামে বিশ্বাস করো, হয়ে যাবে।'

'এ পাপীরও হয়ে যাবে?'

ঠাকুর গান ধরলেন:

> 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে।
> নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে।
> ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—
> ভরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে॥'

আবার বলছেন: মহামায়া দ্বার ছাড়লে তবে দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব—সন্তানভাব, দাসীভাব আর সখীভাব। দাসীভাবে সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। সন্তানভাব খুব ভালো। বীরভাব ভালো নয়। নেড়া-নেড়ীদের ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা। এভাবে প্রায়ই পতন—

গিরিশ বললে, 'একসময়ে আমার ঐ ভাব এসেছিল।'

ঠাকুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন গিরিশের দিকে।

'আপনার কাছে লুকোব কী, ঐ আড়টুকু আছে। এখন উপায় কী বলুন।'

ঠাকুর বললেন, 'উপায় আর কী। তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা করবার তা করুন। কিন্তু, কী জানো, রজোগুণ না গেলে শুদ্ধ সত্ত্ব না এলে ভগবানে মন স্থির হয় না। তাঁর উপরে আসে না ভালবাসা।'

'কিন্তু আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন।'

'করেছি নাকি?' ঠাকুর তাকালেন সরল চোখে: 'তবে বলেছি, হ্যাঁ, আন্তরিক হলে হয়ে যাবে।' বলেই উচ্চকিত হয়ে উঠলেন: 'শালারা গেল কই?'

বাবুরাম আর নারায়ণ কোথায় কী দেখছে, মাস্টার তাদের ডেকে আনল।

ঠাকুর উঠি-উঠি করছেন, একজন এসে বললে, 'সে কী, বিবাহ-বিভ্রাট

দেখবেন না?'

'এটা কী করলে?' ঠাকুর গিরিশকে লক্ষ্য করলেন, 'প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ-বিভ্রাট? আগে পায়েসমণ্ডি তারপর সুক্তনি?'

ঠাকুর উঠে পড়লেন। গিরিশ নটীদের ডেকে আনল। প্রণাম করো ঠাকুরকে।

নটীরা একে-একে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। কেউ কেউ বা স্পষ্ট পায়ে হাত দিয়ে।

ঠাকুর বলছেন, 'থাক মা, থাক।' পরে বলছেন ভক্তদের দিকে তাকিয়ে: 'সবই তিনি, এক-এক রূপে।'

স্টারে প্রহ্লাদচরিত্র জমল না। বেঙ্গল থিয়েটারেও নামিয়েছে প্রহ্লাদচরিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা। পূর্ণাঙ্গ নাটক, প্রচুর সঙ্কীর্তনে বোঝাই, তাছাড়া ষণ্ড ও অমর্কের নিম্নস্তরের হাস্যরস। আর প্রহ্লাদের ভূমিকায় নতুন অভিনেত্রী কুসুমকুমারী গানের জৌলুসে টেক্কা দিল বিনোদিনীকে। কুসুমকুমারীর নাম হয়ে গেল 'প্রহ্লাদকুশী'।

গিরিশ তারপর 'নিমাই সন্ন্যাস' লিখল। শিশির ঘোষ বলে দিলেন, এবার এ নাটকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা একটু প্রকট করো।

এবারও বিনোদিনীই নিমাই।

এবারও ঠাকুর এলেন দেখতে। দেখে এত ভাবাবিষ্ট হলেন যে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করে ধরলেন গিরিশকে।

হরিপদ চাটুজ্জে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাস?'

'প্রায়ই যাই।' বললে হরিপদ, 'আমাদের বাড়ির কাছে যে বাড়ি।'

'হ্যাঁ রে, নরেন যায়?'

'কখনো কখনো দেখি নরেনকে।'

'আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ এখানকার সম্পর্কে যা বলে তাতে নরেন কী বলে?'

'নরেন তর্কে হেরে গেছেন।'

'না, না, তর্কে তাকে কে হারায়!' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধস্বরে, 'নরেন বললে, গিরিশ ঘোষের যখন এত বিশ্বাস তখন আমি কেন কথা বলতে যাব?'

'গিরিশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন।' হরিপদ বললে তন্ময়ের মত: 'এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন। কত কী দেখেন!'

'তা আশ্চর্য কী।' বললেন ঠাকুর, 'গঙ্গার কাছে গেলেই তো অনেক জিনিস দেখা যায়। নৌকো, জাহাজ, কত কী।'

'গিরিশ ঘোষ বলেন, এবার কর্ম নিয়ে থাকব। সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত-কলম নিয়ে বসব আর সমস্ত দিন লিখব।'

'যা বলে তা পারে?'

'পারে না। আমরা যাই আর আমরা গেলেই এখানকার কথা বলে।' হরিপদ বললে গম্ভীর হয়ে, 'আপনি নরেনকে পাঠাতে বলেছিলেন, গিরিশবাবু বললেন, বেশ তো, আমি নরেনকে গাড়ি করে দেব।'

গিরিশের বাড়িতে নরেন এসেছে। গুন গুন করে গান গাইছে :

'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥'

গান শুনে গিরিশের ছোট ভাই অতুল আনন্দবিহ্বল। বললে, 'এ গানটা নতুন শুনছি। এটা কার গাঁথা? মেজদার?'

মেজদা গিরিশ বললে, 'মেজদার সাধ্য নেই এমন গান বাঁধে। এ স্বয়ং নরেনের রচনা।'

'তুমি কী যে বলো।' নরেন বললে, 'তোমার গানের কি তুলনা আছে? চৈতন্যলীলার কত গান বাঙালির মন-প্রাণ আকুল করে রেখেছে। আমিও কত গেয়েছি আর কেঁদেছি। 'তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ। কত পাষণ্ড তনয়, কত কথা কয়, তবু নাকি প্রেম যেচেছ॥'

সেদিন নরেন যে এল, কী রকম এল বিভোর অবস্থায়, দেহের হুঁস নেই, বাস্তব সংসারকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। এসে রাস্তার দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। বললে, 'দেখ জি-সি, আমার ভগবান পাওয়া হল না। সব ত্যাগ না করলে লাভ হয় না ভগবান। দেখ, আমি সব ত্যাগ করেছি কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ঐ পাগলা বামুনটাকে ছাড়তে পারছি না। ওই যত আমার কণ্টক হয়েছে।'

শুনে গিরিশ চুপ করে রইল।

'সে কি, তুমি কিছু বলছ না যে।'

'আমি এর আর কী বলব।' দুই চোখ ছল ছল করে উঠল গিরিশের : 'তুমি কাকে ছাড়তে পারছ কি পারছ না তার আমি কী জানি।'

গিরিশও কি থিয়েটার ছাড়তে পারছে?

বেশি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্যে 'নিমাই সন্ন্যাস' তেমন চলল না। তারপর গিরিশ লিখলে 'প্রভাসযজ্ঞ'। দেখাদেখি বেঙ্গল থিয়েটার নামাল 'প্রভাসমিলন'।

স্টারের প্রভাসযজ্ঞে তিনকড়ি নিল যশোদার পার্ট। আর বিনোদিনী সত্যভামা সাজল। হিঙ্গনবালা ও সুশীলাবালাকে দেখ রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায়।

'চল লো বেলা গেল লো, দেখব রাধা শ্যামের বামে।' সকলের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল এ গান। কাপড়ের পাড়ের উপরও উঠল ছাপা হয়ে।

॥ তেরো ॥

তারপর গিরিশ বুদ্ধদেবচরিত লিখল।

অমৃত মিত্র সাজল সিদ্ধার্থ আর বিনোদিনী গোপা। আর পুত্রহারা মাতা ক্ষেত্রমণি।

চৈতন্যলীলায় যদি প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস, বুদ্ধদেবচরিতে শান্তরসের নির্ঝরিণী।

অন্তত একখানা গানের জন্যে বুদ্ধদেবচরিত অমর হয়ে থাকবে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে নরেনের। বাড়ির দালানে পাইচারি করছে আর উদাত্তমধুর স্বরে গান গাইছে। আশপাশের বাড়ির লোকেরা জেগে উঠে শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। যেমন প্রাণ দিয়ে লেখা তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া। বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেওয়া।

'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কি খেলায়? আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই।
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়
কেনবা এসেছি কোথা নিয়ে যায়
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি
যাই যাই কোথা—কূল কি নাই?'

গিরিশের বাড়ি এসেছে নরেন। থামে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে মেঝের উপর। ঔদাস্যের প্রতিমূর্তি।

কাছেই অমৃত মিত্র বসে। সারা রাত থিয়েটার করেছে, এখন এসেছে 'জ্যান্ত বুদ্ধের' সঙ্গ করতে।

'আরে, আসুন, আসুন।' কাকে দেখে গিরিশ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আগন্তুক ঘরে ঢুকতে পরিচয় করিয়ে দিল গিরিশ। ইনি একজন মুন্সেফ। আমার অনেক দিনের চেনা।

আর কারু পরিচয় নেবার দরকার নেই এমনি উদ্ধত নির্লিপ্ততায় এক পাশে বসলেন মুন্সেফবাবু। তাকালেন নরেনের দিকে। ন্যাড়া মাথা, খালি পা, কে এ হতচ্ছাড়া! একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সশ্রদ্ধ চোখে দেখছেও না ধর্মাবতারকে।

'হ্যাঁ হে,' গিরিশকে লক্ষ্য করলেন মুন্সেফবাবু, 'বুদ্ধ নাকি নাস্তিক ছিল? ইংরিজি বইয়ে অবশ্যি তাই লিখেছে। একেবারেই নাকি ভগবান মানত না।

ধরো না ওই বইটা—' বলে ইংরিজি বিদ্যে ফলাতে লাগল : 'তোমার কী মত?'

'আমার আবার মত কী! ওই ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।' গড়গড়া টানতে-টানতে নরেনের দিকে ইসারা করল গিরিশ।

'ও কে?' একটু বা বিরক্ত হলেন মুন্সেফ।

'একটা ভিখিরি। দুটো ভাতের জন্যে এখানে বসে আছে।' একমুখ ধোঁয়ার আড়ালে গিরিশ তার হাসিটি গোপন করল।

'ও আবার কী জানে!' মুখ-চোখে এমনি ভাব ফুটিয়ে মুন্সেফ তাকালেন নরেনের দিকে : 'কি হে, তুমি কিছু বলতে পারো? বুদ্ধ কি নাস্তিক?'

কাগজে চোখ নিবিষ্ট রেখে নরেন বললে গম্ভীর স্বরে, 'এই যে সামনেই বুদ্ধদেব বসে রয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করুন। সেই ভালো বলতে পারবে।'

অমৃত মিত্র হেসে উঠল। বললে, 'আমি থিয়েটারে নামি, পার্ট মুখস্ত বলি, ভাঁড়ামো করি, আমি কী বলব!'

'কী হে বলো না কী জানো?' নরেনের উপর প্রায় হুমকে উঠলেন মুন্সেফ।

'বুদ্ধ নাস্তিক ছিল।'

'তুমি তা কোথায় পড়লে? কোন বইয়ে? অথরের নাম কী?' একটা বেশ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নিয়ে মাততে পারবেন মুন্সেফ উৎসাহিত হলেন : 'কী বললে, কোন কাগজে লিখেছে?'

'হায়রে-মজা-শনিবার কাগজে লিখেছে।' কাগজে মুখ আড়াল করল নরেন।

'কি, কী বললে?' চটে উঠলেন মুন্সেফ। তিনি জানতেন হায়রে-মজা-শনিবারটা মাতালদের বুলি। 'হায়রে মজা শনিবার, বড় মজার রবিবার।' মেঝেতে লাঠি ঠুকলেন মুন্সেফ : 'বলি কাজকর্ম কিছু করো না কেন? বসে বসে গিরিশের অন্নধ্বংস করতে লজ্জা করে না তোমার? দেখছ সবাই হাসছে তোমাকে দেখে?'

'আমাকে দেখে কী?' নরেন মুখের থেকে কাগজ সরাল : 'না, আপনার পাণ্ডিত্য দেখে?'

'ভেভুড়ে ভিখিরি, তুমি তো তা বলবেই।' চোখ লাল করে চলে গেলেন মুন্সেফ।

কলকাতার বড় এক ডাক্তার 'বুদ্ধদেবচরিত' দেখতে এসেছে। দেখতে এসেছে শোকে সান্ত্বনা খুঁজতে। খানিকক্ষণের জন্যে যদি অন্যমনস্ক থাকা যায়। এই কিছু দিন হল একমাত্র পুত্র মারা গিয়েছে। নিজে ডাক্তার হয়েও পারেনি বাঁচাতে। চিকিৎসায় কম পড়ে গেছে।

এ কী, নাটকেও যে পুত্রহারা মা।

বুদ্ধদেবকে বলছে, 'আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলো।'

বুদ্ধদেব বললে, 'কিছু কৃষ্ণ তিল নিয়ে এস।'

রমণী যাচ্ছে তিলের সন্ধানে, বুদ্ধদেব ডাকল : 'শোনো, তেমন বাড়ি থেকে নিয়ে এস যে বাড়িতে মৃত্যু হয়নি।'

রমণী কোথাও পেলনা তেমন বাড়ি। ফিরে এল বুদ্ধের কাছে। মৌনমুখে নতনেত্রে দাঁড়াল!

'তবেই দেখছ মৃত্যুছাড়া জীবন নেই।' বললে বুদ্ধ, 'মৃত্যুই জীবনের ছায়া। শুধু ধৈর্য ধরো।'

রমণী বললে, 'পিতা তব উপদেশে
ধৈর্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার।'

আত্মহারা হয়ে ডাক্তার কেঁদে ফেলল সিটে বসে। 'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার।' ছুটে চলে এল গিরিশের কাছে। বললে, 'আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বুঝেছেন। হ্যাঁ, পুত্রশোকে ধৈর্য ধরব বৈ কি। ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কী করবার আছে! কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার।' হু-হু করে কাঁদতে লাগল ডাক্তার।

কোন এক অভিনেত্রীর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে গিরিশ। যতক্ষণই থাকুক, শেষ রাত্রির দিকে হলেও বাড়ি ফিরবেই, একবার নিজের শয্যায় শুয়ে নেবে। পুরো রাত কোনোদিনই গণিকালয়ে কাটাবে না, রাত ভোর হতে দেবে না সেখানে।

কিন্তু সেদিন কী খেয়াল হল গিরিশ ঠিক করল বাড়ি ফিরব না কিছুতেই। এই অপবিত্র আলয়েই থেকে যাব সারারাত।

ঘুমুচ্ছে গিরিশ, রাত প্রায় আড়াইটে, হঠাৎ মনে হল তাকে বিছেয় কামড়েছে। সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

'কী হল?' সঙ্গিনী প্রশ্ন করল।

'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'বাক্সর চাবি বৈঠকখানায় ফেলে এসেছি।' দরজা খুলল গিরিশ: 'আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে তবে তার শান্তি।

কী ব্যাপার, পরদিন গিরিশ সটান চলে এল দক্ষিণেশ্বর। কী জানি কেন, সকল কথা ব্যক্ত করল ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'শালা, তুই কি ভেবেছিস তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাবি? ও তোকে জাত সাপে ধরেছে, তিন ডাক ডেকেই তোকে চুপ করতে হবে।'

'এখন থেকে আমি তবে কী করব?' গিরিশ আকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

'কী আবার করবি! যা করছিস তাই করবি।'

'যা করছি মানে? এই বই লেখা, থিয়েটার করা?'

'মন্দ কী এই সব? বই লেখা থিয়েটার করাটাও তো কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবি কী করে? জমি পাট করে রুইলেই তো ফসল ফলবে।'

নতুন কিছুই করবার নেই?

'শোন,' ঠাকুর অন্তরঙ্গ হলেন: 'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল। তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবিনে?'

গিরিশ চুপ করে রইল।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন?'

'আমার মত বাউণ্ডুলে কি কেউ আছে যে কথা দেব?'

'কেন কী হল?'

'সংসারী লোকের কাছেই কথা রাখতে পারি না আর আপনার কাছে কী করে স্বীকার করি? যদি না পারি?'

'কেন পারবিনে? এই দ্যাখ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু ভগবানকে মনে করবি।'

'রোজ ঘুম ভাঙে নাকি সকালে?' গিরিশের মুখে আর্তি ফুটে উঠল: 'কত দিন ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর হয়ে যায়।'

'বিকেলে?'

'বিকেল যেখানে কাটে সে জায়গার নাম নাই শুনলেন। সেখানে আরেক রকম ঘুম। মোহঘুম।'

ঠাকুরের যেন নিজের কত গরজ তেমনি আকুলতা নিয়ে বললেন, 'বেশ, খাবার আগে?'

'খাবার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।' বললে গিরিশ, 'কতদিন যায় খাওয়াই হয় না। কতদিন গুচ্ছের শিঙাড়া কচুরি খেয়েই দিন কেটেছে থিয়েটারে। ও পারব না মশাই।'

'বেশ তো, শোবার আগে?'

'খুব ভালো সময়ই বের করেছেন যা হোক।' গিরিশই হাসল নিজের মনে: 'কোথায় শুই? কখন শুই? কোন বিছানায়?'

পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে গিরিশ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুক ভরে।

কিন্তু ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। এ যে কেউটের ছোবল।

বললেন, 'যা শালা, তোকে কিছুই করতে হবে না। আমাকে তুই বকলমা দে।'

বকলমা! সে আবার কী জিনিস! গিরিশ অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল।

তার মানে, তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দে। তোর হয়ে আমিই নাম করব, স্মরণ-মনন সমস্ত আমার। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে।

'তা হলে আর কী, আমার একেবারে ছুটি। আমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব।' আনন্দে লাফিয়ে

উঠল গিরিশ।

হালকা মনে বাড়ি ফিরল। যাক, কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াব। যা করবার উনি করবেন। যদি ধুলোয় গড়াগড়িও দিই, উনিই ধুলো মুছে নেবেন কোলে তুলে।

পরদিন, কেন কে জানে, হঠাৎ মনে পড়ল, ঠাকুর আমার হয়ে নাম করেছেন তো? কে জানে করেছেন কিনা! কত লোক আসছে-যাচ্ছে, চারপাশে কত ভিড়, বয়ে গেছে তাঁর গিরিশের কথা মনে করে রাখতে। কে না কে এক পাঁকের পোকা, তার জন্যে তাঁর মাথাব্যথা।

নাম করেছেন তো! এ দেখি এক দুর্ভাবনায় মধ্যে পড়ল গিরিশ! থেকে থেকেই উদ্বেগ, নাম করেছেন তো! সব ভার তাঁকে দিয়ে এসেছি, তবু কেন এই চাঞ্চল্য। এ তো আমি ছুটি পাইনি, আমি বাঁধা পড়লুম দ্বিগুণ শৃঙ্খলে।

বকলমার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত। এ তো ফাঁকায় আসিনি, এ যে ফাঁদে পড়েছি। নাম হচ্ছে কিনা, আবার ঠাকুর করছেন কিনা। শুধু নাম নয়, নামের সঙ্গে আবার ঠাকুরের মূর্তি। দুবার করে হচ্ছে।

'কে জানত এমনি প্যাঁচের মধ্যে পড়ে যাব।' নির্জনে আপন মনে বসে বলছে গিরিশ, 'এমনি সময় করে নিজে একটু নাম করলে এত ঝামেলায় পড়তাম না। তার একটা শেষ থাকত, এ যে একেবারে অশেষের মধ্যে এসে পড়লাম। কোথায় আর এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় ফাঁস জড়ানো। এখন যাই কোথা?'

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেই হাজির হল।

'কি হে কী মনে করে?' ঠাকুর সম্ভাষণ করলেন গিরিশকে।

'জানতে এলাম—'

'কী জানতে এলি?'

'সেই যে আপনাকে বকলমা দিয়ে এলাম, আপনি আমার হয়ে নাম করছেন কিনা।'

'করছি কি না করছি তাতে তোর কি রে শালা।' ঠাকুর রুষ্ট হবার ভাব করলেন : 'তুই আমাকে তোর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছিস, সর্বস্ব সমর্পণ করেছিস, তোর আবার কিসের বাদানুবাদ। সংসারে তোর সমস্ত অধিকার, সমস্ত স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন সমস্ত আমার হাতে।'

তবে তাই হোক। গিরিশ একপাশে বসল করজোড়ে।

ঠাকুর বললেন সান্ত্বনার সুরে, 'একবার শ্রীহরির শরণাগত হও, আর কিছু ভাবতে হবে না। শরণাগতকে তিনি ত্যাগ করেন না কখনো।'

গিরিশের চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি একমাত্র তোমাকে। তোমাকেই আমি বকলমা দিয়েছি। তুমিই আমার ভার নিয়েছ, আমার পাপের ভার, দুঃখের ভার, ব্যর্থতার ভার। আর আমার কী চাই।'

অশ্বিনী দত্ত এসেছে ঠাকুরের কাছে।

'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?' জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

'কোন গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?' অশ্বিনীর মুখে বুঝি বা একটু অসন্তোষের ভাব ফুটল : 'নাম শুনেছি, দেখিনি কখনো।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক। যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি।'

'শুনি মদ খায় নাকি?'

'তা খাক না। কত দিন খাবে?'

গিরিশ শেষ জীবনে বলছে নিজের কথা : এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ-গাঁজায় থাকত। কত কী ঠাকুরকে বলতাম কত গালাগাল দিতাম, তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, ওরে দ্যাখ, গাড়িতে কিছু আছে কিনা। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপশোষ করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে।

দুপুর রাত্রে এক বারাঙ্গনাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়েছে গিরিশ, বাগানবাড়ির উদ্দেশে।

এত রাত্রে কোথায় বাগানবাড়ি মিলবে? কোন বাগানবাড়ির দরজা খোলা আছে তাদের জন্যে?

'একমাত্র বুঝি রাসমণির বাগানবাড়ি খোলা আছে। চলো সেখানে যাই।'

হ্যাঁ, একমাত্র রাসমণির বাগানবাড়ি, রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরই খোলা আছে। গাড়ি থেকে নামল গিরিশ। দারোয়ান বুঝি পথ আটকায়, বন্ধ গেট খুলে দেবে না। না, ঠাকুর টের পেয়েছেন। চটি পায়ে তিনিই আসছেন এগিয়ে। ওরে গেট খুলে দে। গিরিশ এখানে ফুর্তি করতে এসেছে—এটাই তো ফুর্তির জায়গা।

গেট খুলে দিল দারোয়ান। ঠাকুর এক হাতে গিরিশের হাত অন্য হাতে বারাঙ্গনার হাত ধরলেন। বললেন, বল হরিবোল, বল হরিবোল। বলে নাচতে লাগলেন। কী আশ্চর্য, গিরিশ আর তার সঙ্গিনীও নাচতে লাগল।

নামের মদিরায় কামের মদিরা ধুয়ে গেল।

একটা পাগলী আসে ঠাকুরের কাছে। এসে গান শোনায়। কখনো ব্রহ্মসঙ্গীত। কখনো বা কালীর গান।

একদিন এসে গান না শুনিয়ে হঠাৎ শুরু করল কাঁদতে।

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

পাগলী বললে, 'মাথাব্যথা করছে।'

মাথাব্যথা না মনোব্যথা—ঠাকুর হাসতে লাগল।

আরো একদিন এসে হাজির।

'দয়া করলেন না?' করুণ নয়নে তাকাল ঠাকুরের দিকে : 'মনে ঠেললেন কেন?'

ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী ভাব?'

পাগলী বললে, 'মধুর ভাব।'

'কিন্তু আমার যে মাতৃযোনি। সব মেয়েরা যে আমার মা হয়।' বললেন ঠাকুর।

'তা আমি জানি না।' পাগলী মাথা নাড়তে লাগল।

কিছুতেই যায় না, ঠায় বসে থাকে।

রামলালকে ডাকলেন ঠাকুর, 'ওরে রামলাল, কী মনে ঠেলাঠেলি বলছে শোন দেখি!'

রামলাল এল। পাগলীকে তাড়িয়ে দিল।

সেদিন সে সব কথাই গিরিশকে বলছেন ঠাকুর। কিছুতেই যায় না কাছ ছেড়ে। তাড়িয়ে দিলেও ঘন-ঘন তাকায় ফিরে-ফিরে। আবার একদিন চলে আসে।

'দুঃখ হয় পাগলীটা এসে উপদ্রব করে। কিন্তু তার জন্যে সে নিজেও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কম সয় না।' রাখাল কাছে ছিল, রাখাল বললে।

সে কথা নিরঞ্জন শুনতে পেল। রাখালের উপর তম্বি করে উঠল : 'তোর মাগ আছে কিনা তাই তোর মন কেমন করে। আমরা ওকে বলিদান দিতে পারি।'

'কী বাহাদুরি।' রাখালও ঝলসে উঠল।

গিরিশ বললে, 'সে পাগলী ধন্য। পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে। সে যে ভাবেই করুক, তার কখনো মন্দ হবে না।'

এই পাগলীই গিরিশের 'বিল্বমঙ্গলের' পাগলিনী।

'ধরা মাঝে উন্মাদিনী ধাই।
তার দেখা নাই
কোথা পাই, কে আমারে বলে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী,
ব্যোম আচ্ছাদন, নাহিক মরণ
কত আর আছে তার মনে।'

বারোশ তিরানব্বই সালের আষাঢ়-মাসে স্টারে নামল বিল্বমঙ্গল। নাম-ভূমিকায় অমৃত মিত্র। চিন্তামণি বিনোদিনী। আর পাগলিনী গঙ্গামণি।

পাগলিনীর প্রথম প্রবেশ জগন্মাতার গান নিয়ে :

'ও মা, কেমন মা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা বলে তো ডাকব না আর

লাগে কিনা দেখব তোমার
বাবা বলে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে
দেখে নাকো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে॥'

ভিক্ষুক জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?'

'আমি বাছা পাগলিনীর মেয়ে।'

'হ্যাঁ গা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পাগলদের বাড়ি।' বলে পাগলিনী আবার গান ধরল :

'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের
নাম শ্যামা।
বাবা বব বম বলে, মদ খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢলে
শ্যামার এলোকেশ দোলে,
রাঙা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে
শোন না॥'

ভণ্ড সাধক বললে, 'এ পাগলীটাকে হাত কর, বেড়ে গায়।'

'ব্যাবসাটা শিগগির জমবে।' ভিক্ষুক সায় দিল।

'তোমার ভৈরবী করতে পার তো ভালো।'

'বটে, ওকে পেলে তো আমিও একটা দল করি।' আবার সায় দিল ভিক্ষুক।

॥ চৌদ্দ ॥

শ্রীমা বিল্বমঙ্গল দেখতে এসেছেন। গিরিশই উদ্যোগ করে এনেছে। বসিয়েছে রয়্যাল বক্সে।

সেদিন ভণ্ড সাধকের পার্টে গিরিশ নিজে নেমেছে।

সাধক বলছে থাকমনিকে, 'আমার বড় সাধ, তোমায় রাধাপ্রেম শেখাই।'

থাকমনি বললে, 'আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব না।'

সাধক। তবে মন দে শোন। বলি তরতে তো হবে। এ ভবসমুদ্র তরতে হবে।

থাক। তা বটে তো।

সাধক। তাই তোমায় বলছি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও, পাঁচজনের মুখ আর চেও না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই। যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়, আপনি

বুঝতে পারবেন। আমি হরিনাম না করে জল খাইনি, আর যে মানুষ অনুগ্রহ করে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মত দেখি, আর পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দ্যাখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পারছ না। রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা!

থাক। তা তো বটেই, তা তো বটেই। হাজার হোক আমি মেয়েমানুষ, ভালো করে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব।

সাধক। দ্যাখ এক কথায় বলি—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তারপর যা খুশি তা করো, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হতে পারবে?

থাক। আপনি আমায় ভালো করে বলুন, আমি বুঝতে পাচ্ছিনি।

সাধক। দ্যাখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান করবে, আমি পায়ে ধরে ভাঙব। আমি বাঁশি বাজাব—তুমি কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলে অধৈর্য হবে।

গিরিশের রঙ্গভঙ্গ দেখে মা ভারি মজা পাচ্ছেন। মৃদু হেসে বললেন, এ বয়সে আর কেন?

তারপর বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা দেখে মা একেবারে অভিভূত।

'এই দ্যাখ দড়ি দ্যাখ।' বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে নিয়ে এল দেয়ালের কাছে।

'কই দেখি।' চিন্তামণি আঁতকে উঠল : 'ওগো মা গো, এ যে অজাগর গোখরো সাপ।'

'অ্যাঁ, গোখরো সাপ?' বিল্বমঙ্গলও পিছিয়ে গেল।

ভিক্ষুক বললে, 'ওগো ঠাকরুন হয়েছে,—সাপে যদি গর্তে মুখ দ্যায়, ল্যাজ ধরে টেনে মুখ বার কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে। (স্বগত) উঃ, মানুষটা যদি চোর হত, সাত মহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বার করে আনতে পারত।'

ভিক্ষুক প্রস্থান করল।

থাকমনি নিজের মনে বললে, 'একেই বলি টান, একেই বলি মনের মানুষ। নৈলে হদে পোড়ার মুখো—খেংরা মারি,—খেংরা মারি।'

'একি, তুমি কালসাপ ধরে উঠেছিলে?' জিজ্ঞেস করল চিন্তামণি : 'তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে?'

'তোমায় দেখছি।' নিষ্পলকে তাকিয়ে বললে বিল্বমঙ্গল।

'কী দেখছ?'

'তুমি বড় সুন্দর।'

'তুমি নদী পেরুলে কী করে?'

'আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম, সাঁতরে পার হব, কিন্তু বড় তুফান—' বললে বিল্বমঙ্গল, 'মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ

হয়ে যেতে লাগল। এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—'

'তোমার গায়ে এত দুর্গন্ধ কিসের?' চিন্তামণি নাক সিঁটকালো।

'তা বলতে পারি না।'

সাপটা অনায়াসে ধরলে?' চিন্তামণির বিস্ময় তবু যায় না।

'চিন্তামণি,' বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে কান্না ফুটে উঠল : 'বোধহয় তুমি কখনো প্রাণ দাওনি। তা হলে বুঝতে, অতি তুচ্ছ, তা হলে জানতে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নেই।'

'তুমি কি উন্মাদ?'

'যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।'

'কী ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ?'

'দেখছি তোমার কথা সত্যি কি মিছে! আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি। তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে দশদিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে। এতেও কি বুঝতে পারো না আমি উন্মাদ কিনা? আমার সর্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্ছে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিছি। (সর্প দেখিয়ে) আমি উন্মাদ কিনা দ্যাখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্যাখ। সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর!'

'চলো, তুমি কি কাঠ ধরে এলে দেখব।'

'তোমার এখনো অবিশ্বাস!'

রাস্তায় টহলদারদের আবির্ভাব হল। তাদের মুখে বৈরাগ্যের গান :

'কি ছার! আর কেন মায়া
কাঞ্চন কায়া তো রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না তো
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে?
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কারু নয় দ্যাখ না চেয়ে—
কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি॥'

নদীতীরে বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি আর থাকমনি এসে দাঁড়াল।

বিল্বমঙ্গল বললে, 'সত্যি, সকলই মায়া, কই, কেউ তো আমার আপনার দেখিনি। যার জন্যে ঝাঁপ দিলুম, সেও তো আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে?'

'উঃ, এখনও নদী যেন রণমুখী!' বললে চিন্তামণি, 'নদী চার পো হয়েছে।

ঝাঁপ দিতে সাহস হল! কই কাঠ কই?'

'ওই।' দেখিয়ে দিল বিল্বমঙ্গল।

'একি। এ যে পচা মড়া!' সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল চিন্তামণি : 'দেখ আর আমার অবিশ্বাস নেই, তুমি সত্যই উন্মাদ। তোমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধরো, কাঠ বলে পচা মড়া ধরো। আমি বেশ্যা, তোমার এই মন যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হত। তুমি পচা মড়া ধরে রাত্তিরে নদী পার হয়ে এলে। গায়ে কাঁটা দেয়। সাপের ল্যাজ ধরে উঠলে—দেখ, আমাদের সকলই ভান বোধ হয়, কিন্তু এ যদি ভান হয়, এমন কিন্তু কখনো দেখিনি!'

গান করতে করতে পাগলিনী প্রবেশ করল।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে
কত রাখে আদরে॥
আজি জানতে এলেম তাই
কে বলে রে আপন রতন নাই
সত্যি মিছে দ্যাখ না কাছে
কচ্চে কথা সোহাগ ভরে॥'

'আমার কি কেউ নেই?' বলতে লাগল বিল্বমঙ্গল : 'অবশ্যই আছে, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। আছে—আমার কাছে-কাছে আছে। নৈলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হতে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় বলে দিলে, সংসারে আমার কেউ নেই? কে আমায় এখন বলছে, আমি তোমার আছি। কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর। দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে তুমি আমার কাছে-কাছে আছ, আমি অন্ধ, তোমায় দেখতে পাচ্ছিনি। কে আমায় চক্ষু দেবে?'

তন্ময় হয়ে শুনছে মা-ঠাকরুন। বলে উঠলেন, 'আহা! আহা!'

বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে মার কাছে। বলছে, 'আমার মনের চাঞ্চল্য দূর করে দিন, নয় তো ফেরত নিন আপনার মন্ত্র।'

এমন আকুল-করা কথা! মার চোখে জল এসে গেল। বললেন, 'বেশ, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।'

সে কি! ভীষণ ঘাবড়ে গেল বৈকুণ্ঠ। তাহলে কি মার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল? পাংশু মুখে সে বললে, 'মা, আমার সব কেড়ে নিলে? আমি কি তবে রসাতলে গেলুম?'

মা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে

যে এসেছে তার জন্যে মুক্তি বাঁধা হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই আমার ছেলে-দের রসাতলে ফেলে।'

গিরিশও তেমনি রসাতলে নয়, সে অতল রসে।

'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মায়ের কাছে চালান দিচ্ছি।' বললে বাবুরাম, 'মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অপার করুণা!'

'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।' সন্তানদের বললেন শ্রীমা, 'মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। মা থাকতে সন্তানের ভয় কী? যে যা খুশি করো না কেন, যে-ভাবে খুশি চলো না কেন, তোমাদের নিতে শেষকালে আসতেই হবে ঠাকুরকে। ঈশ্বর যে কালে হাত-পা দিয়েছেন, তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তো খেলবেই তাদের খেলা। তাতে ভয় কী?'

বিষ্ণুপুর হয়ে মা আসছেন কলকাতা। রাখাল বাবুরামকে বললে, 'একবার স্টেশনে গেলে হয় না? কত দিন পরে আসছেন বলতো?'

'মন্দ বলো নি।' সায় দিল বাবুরাম।

স্টেশনে এসে শুনল গাড়ি তিন ঘণ্টা লেট। তা হোক, যখন এসেছি প্রতীক্ষা করি। দারুণ গ্রীষ্ম। তা হোক, মায়ের চরণ দর্শন হলেই সমস্ত দাহের নিবারণ হবে।

মা ট্রেন থেকে নামতেই ভক্তের দল প্রণামের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সঙ্গে গোলাপ-মা ছিল, রাখালকে দেখে মুখিয়ে উঠল : 'তোমাদের কি একটু আক্কেল নেই? এই রোদে মা তেতে পুড়ে এলেন, আর তোমরা কিনা প্রণামের জন্যে বিভ্রাট বাধাও? তোমরাই যদি অবুঝ হও তাহলে অন্যের আর কথা কি?'

রাখাল নিবৃত্ত হল। বাবুরামও তাই। উপস্থিত অন্যান্য ভক্ত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

মা বাগবাজারে 'উদ্বোধনে'র দিকে রওনা হলেন।

বাবুরাম বললে, 'প্রণাম করতে না পাই, চলো গিয়ে দেখে আসি ব্যবস্থা সব ঠিকমত হয়েছে কিনা।'

মা উপরে আছেন, নিচে স্তব্ধমুখে বসে রইল দুজন।

এমন সময় গায়ে সামান্য একটা ফতুয়া, ঘর্মাক্ত দেহে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল গিরিশ। মা এসেছেন? কখন এলেন? কেমন আছেন? তিন ঘণ্টা গাড়ি লেট?

স্বাভাবিক গলায়ই কথা বলছে গিরিশ কিন্তু দরাজ আওয়াজ সহজেই উপরে গিয়ে পেঁছুচ্ছে। শোনাচ্ছে বুঝি কোলাহলের মত।

'বলিহারি যাই ঘোষজার ভক্তি দেখে?' উপরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গোলাপ-মা টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'মা তেতে পুড়ে এলেন, কোথায় একটু জিরোবেন, না, এখানেও এসেছে কিনা জ্বালাতন করতে?'

গিরিশ কানেও নিল না সে তিরস্কার, রাখাল-বাবুরামকে বললে, 'চলো,

ওঠো, উপরে গিয়ে মাকে দেখে আসি।'

গোলাপ-মা আবার রুখে উঠল।

'ঝাঁজা মেয়ে বলে কিনা মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি।' গিরিশও মুখিয়ে এল : 'কোথায় এত দিন পরে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, তা নয়, মায়ের থেকে ছেলেদের উনি সরিয়ে রাখছেন! কত উনি শেখাচ্ছেন মাতৃস্নেহ!'

গিরিশকে কে রোখে! সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেল উপরে, পিছে-পিছে বাবুরাম আর রাখাল।

ছেলেদের দেখে মা আনন্দে ঝলমল করে উঠলেন।

'শেষকালে গিরিশবাবু কিনা আমাকে এ রকম বললে।' মার কাছে এসে নালিশ করল গোলাপ-মা!

মা উলটে গোলাপ-মাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন : 'তোমাকে কত দিন বলেছি আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যেও না।'

মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিয়ে গিরিশ সগর্বে নেমে গেল। তার কেন এত জয় জয়কার? কিসে তার এই অবাধ স্বত্ব?

তার একমাত্র ধন স্বচ্ছতা, সরলতা। আর বিশ্বাসই এনেছে এই সারল্য। সমর্পণই এনেছে এই প্রাণায়াম।

অথচ প্রথম যখন বলরাম বোসের বাড়ির ছাদে মাকে দেখেছিল চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল গিরিশ, বলেছিল, 'না, না, আমার পাপনেত্র, পাপনেত্রে মাকে দেখব না লুকিয়ে।'

বিল্বমঙ্গলের পর 'বেল্লিক বাজার'। সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও বিকৃতচরিত্র স্বার্থান্ধের উপর কটাক্ষপাত করে এই নাটক। নতুন ধরনের পঞ্চরং।

তুমুল হট্টগোল উঠল। বাবুর দল ভেবড়ে গেল।

তার পরেই 'রূপ সনাতন'।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে চৈতন্যদেব ভক্তদের পদধূলি নিচ্ছেন, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখাল গিরিশ।

'প্রভু, এ করছেন কি?' এক বৈষ্ণব জিজ্ঞেস করল শ্রীচৈতন্যকে।

প্রভু বলছেন, 'আমি কৃষ্ণবিরহে কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, কৃষ্ণকৃপা হবে।'

এই দৃশ্যে গোস্বামীর দল বিরক্ত হল! ভক্তের পায়ের ধূলো প্রভু গায়ে মাখবেন এ কী করে হতে পারে? কটূক্তি করতে লাগল গিরিশকে।

বা, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি।

দেখেছ—কী দেখেছ?

দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের পায়ের ধূলো গায়ে মাখছেন। কীর্তন হয়ে যাবার পর বলছেন, হরিনাম হলে হরি স্বয়ং তা শুনতে আসেন। ভক্তের পাদস্পর্শে কীর্তন-অঙ্গনের ধূলো পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। বলছেন আর ধূলো কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে মাখছেন।

'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ।' গিরিশকে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'নরেন খুব ভালো। যেমন গাইতে বাজাতে তেমনি লেখা পড়ায়। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী। তার অনেক গুণ।' মাস্টারকে লক্ষ্য করলেন, 'কি গো, ঠিক নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ভালো।' মাস্টার সায় দিল।

'আর গিরিশ?' গিরিশকে আড়াল করে তাকালেন মাস্টারের দিকে: 'গিরিশের খুব বিশ্বাস আর অনুরাগ।'

গিরিশ বললে, 'নরেন অবতার মানেনা। বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা অনন্ত তার আবার অংশ কী? আকাশের কখনো অংশ হয়?'

'কিন্তু, ঈশ্বর অনন্ত হোন, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু মানুষের মধ্য দিয়ে আসতে পারে। আসেও। এটা উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না। এর অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।'

'নরেন বলে, যিনি অনন্ত তাঁর সমস্ত ধারণা হবে কী করে?'

'তাঁর সমগ্র ধারণা করা কী দরকার। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা হলেই তাঁকে দেখা হয়ে গেল।'

অনিমেষ চোখে গিরিশ তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে।

'যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সবটাই তার হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। যদি তোমার পা-টা ছুঁই, তোমাকেই ছোঁয়া হল।'

সবাই হেসে উঠল।

আবার বললেন, 'অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায়ই আছে, তবে কাঠে বেশি।।'

গিরিশ উদ্বেল কণ্ঠে বললে, 'যেখানে আগুন পাব সেখানেই বসে বড়ব। সেখান থেকে আর নড়ব না।'

'গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা।' বললেন ঠাকুর, 'তার বিশ্বাস ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না।'

'নরেন আমার কাছে তর্কে হেরেছে।' গিরিশ বললে।

নরেন ঠাকুরকে অবতার বলে মানতে চায় না, ঠাকুরের বিচারে তাতেও নরেনের দোষ নেই। নরেন যে তর্কে হারবে এও তাঁর ভালো লাগে না।

বললেন, 'না। নরেন আর তর্কই করতে চাইল না।' হাসলেন ঠাকুর, 'আমায় বললে গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, এখন আমি আর কি বলব। অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে যাওয়া বৃথা।'

শুধু বিশ্বাস—বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস। অসীম বিশ্বাসই অসীম শক্তি।

'বিশ্বাস, বিশ্বাস, অগ্নিময় বিশ্বাস।' স্বামীজি বলছেন, 'আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। জয় প্রভু। প্রভুই আমাদের নেতা। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। প্রভুর জয় দাও। পশ্চাতে তাকিয়ো না। কে পড়ল যেও না দেখতে। শুধু এগিয়ে চলো। চলো এগিয়ে।'

নরেনও একদিন এসেছিল বিল্বমঙ্গল দেখতে।

অভিনয় শেষ হবার পর নরেনকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এল গিরিশ। নর্তক-নর্তকীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। হলঘর নিরিবিলি, নরেন ভজন ধরল।

নট-নটীরা আর চাপল্য করবার অবকাশ পেল না।

এ কী গান! নরেনের দুই চোখ বোজা, গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। স্বর-সুগন্ধে ভরে উঠেছে সমস্ত ঘর। শুচিসুন্দর নটনাথ যেন নরনাথ হয়ে প্রমূর্ত হয়েছেন।

নট-নটীরা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে।

গিরিশ উদ্বিগ্ন হল। শেষ পর্যন্ত নরেনের না ভাব সমাধি হয়ে যায়। নরেনের হাত থেকে তানপুরা কেড়ে নিল। হাত ধরে টেনে নামাল মঞ্চ থেকে। নিজের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে এল বাগবাজার।

'কি, হচ্ছিল কী!' গিরিশ বললে নরেনকে, 'ওখানে কি ধ্যানস্থ হতে হয়!'

নরেন হাসল। বললে, 'শ্মশানে-ভবনে সর্বত্রই আসন। সর্বত্রই রামের অযোধ্যা।'

পরদিন থিয়েটারে এলে নর্তকীর দল গিরিশকে ঘিরে ধরল, 'আপনি করেছিলেন কী! এক বিরাট মহাপুরুষকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা যদি অজ্ঞানে চাপল্য প্রকাশ করে ফেলতাম! আমাদের ইহকাল গেছেই, পরকালও যেত সেই সঙ্গে।'

'এখন তো দেখছ, ইহকাল-পরকাল কিছুই যাবার নয়।' আশ্বাসভরা হাসি হাসল গিরিশ।

॥ পনেরো ॥

কলুটোলার মতি শীলের নাতি গোপাললাল শীল। বড় লোক, খেয়াল ধরল, থিয়েটার খুলবে। যে জমির উপর স্টার থিয়েটার তা ঝপ করে কিনে ফেলল। নোটিশ দিল, বাড়ি হটাও।

তার মানে বাড়িটাও বেচে দাও আমাকে।

বড়লোকের সঙ্গে কে ঝগড়া করবে, স্টারের মালিকরা ত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ি বেচে দিল গোপাললালকে। কিন্তু থিয়েটারের নামযশ বা গুডউইল বেচা হল না।

বিডন স্ট্রিট থেকে বিদায় নিল স্টার থিয়েটার।

শেষ দিন থিয়েটার দেখতে ভেঙে পড়ল কলকাতা। অভিনয়ের শেষে এত দিনের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা চাইল অমৃত বোস। বললে, যদি একখানা পর্ণকুটির তুলতে পারি আবার আপনাদের দেখা দেব।

টাকার জোরে গোপাললাল স্টার থিয়েটারের বাড়িটাই পেল। কিন্তু স্টার

তবু স্টার স্টার। তার জন্যে না লিখলে যে মন বুঝ মানে না। এমারেল্ড জীবিকা কিন্তু স্টারই তো জীবন।

স্টারের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নসীরাম লিখলে। শুধু লিখলে না, য়্যাকটিং পর্যন্ত শিখিয়ে দিলে। গোপাললাল যাতে টের না পায় তার জন্যে খাল-ধারে খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে রিহার্সেলের জায়গা হল। শাড়িসেমিজ পরা মেয়েমানুষ সেজে গিরিশ চলে আসে আর গভীর রাতে মহড়া বসে। কে ধরবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই 'নসীরাম' লেখা। আর নসীরামে পাহাড়ী বালকের ভূমিকায়ই তারাসুন্দরীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। আর মুখে শুধু একটিমাত্র কথা : ওরে হরি বল, নইলে কথা কি কইবে না?

এই একটি কথাতেই সে রঙ্গজগৎ মাতিয়ে দিল।

'মরতেও চাইনি বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়িও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীরসরও চাইনি, খুদকুঁড়োও চাইনি। ওসব ভাবিইনি, জানি একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছে, সুখ দুঃখ দু' শালাই সঙ্গের সাথী।'

নসীরামকে সকলে পাগল বলে।

'লোকের কী, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মত পাগল না হয়, আপন মজায় থাকে তারেই বলে পাগল।' বলছে নসীরাম, 'কোনো শালা ধনের কাঙাল, কোনো শালা মানের কাঙাল, কোনো শালা মেয়েমানুষের কাঙাল, কোনো শালা ছেলের কাঙাল, যে শালা এই ক্যাঙলাবৃত্তি না করে সে শালাই পাগল।'

'নসীরাম, তোমার সংসারে চাইবার কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করলে একজন।

'চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো সব ভুয়ো সব ভুয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ি পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে তার ঠিকানা নেই, টাকাকড়ি আজ বলছ তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার। না যদি খরচ করো তো দুহাতে দুমুঠো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।'

রাজকুমার অনাথনাথ জিজ্ঞেস করলে নসীরামকে : 'হরি কে? হরি কি আছেন?'

'তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?' বলছে নসীরাম, 'জল-জল করলে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাকল।'

'তা কি হয়?'

'হয় না হয় পরখ করে দেখলে বুঝতে পারো। হরি নাই বলে কারা জানো? যারা একবার হরি হরি করে, মনে করে হরিকে খুব কৃপা করেছি, তবু হরি কেন এসে তার বাপের বাগানের মালী হয় না? আর হরি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে না কারা জানো? যাদের হরিনাম করতে করতে প্রাণ ভরে যায়, যত হরি-হরি করে তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে জিজ্ঞেস করে, হরি, তুমি আছ কিনা। ততক্ষণ আরো দুটো হরিনাম করে।'

'তুমি হরিনাম করো?'

'হরিনাম করব না? মজা ওড়াব না? তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে ভাবব কী হবে কী করব।'

বেশ্যা সোনাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত নসীরামের নিবৃত্তি নেই। বলছে সোনাকে, 'সেই বেটার উপর ফেলে দে, আর তোর যাই খুশি করে বেড়া। তোর ভয়েও কাজ নেই ভরসায়ও কাজ নেই। ভয়-ভরসা দু' শালাই শত্রু। আর কথায়ও কাজ নেই, শুধু হরি-হরি কর।'

'আমি কেন হরিনাম করব?' আগুন হয়ে উঠল সোনা: 'আমায় বেশ্যা করলে কে? আমায় মদ খাওয়ালে কে? আমায় অনাথিনী করলে কে?'

কিন্তু কালক্রমে সোনাও চিন্তামণি হয়ে উঠল। নসীরামের আকর্ষণ কে এড়াবে? 'হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকার মুখে।'

নাটকের প্রারম্ভে গিরিশের একটি কবিতা পড়া হত স্টেজে। তার শেষ কটি লাইন:

হিন্দু প্রাণ কোমলতাময়
ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়—
ধর্ম—রঙ্গালয়॥

কিন্তু 'নসীরাম' পয়সার দিক থেকে সফল হল না। আর ওদিকে গোপাল-লালেরও থিয়েটারের সখ মিটে গেল। এমারেল্ডকে ইজারা দিয়ে কেটে পড়ল। ছাড় পেল গিরিশ, স্টারে এসে ম্যানেজারি নিলে।

এদিকে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর অসুখ। এই স্ত্রী থেকেই তার গুরুলাভ, অর্থলাভ, যশোলাভ—তার সর্বসৌভাগ্যের সমুদ্ভব। সেই কিনা এখন যেতে বসেছে।

দু' দুটো ঘা খেয়েছে। পর-পর দুটি মেয়ে মারা গেছে, দুটিই বিশ বছর বয়সে। তারপর একটি ছেলে হয়েছে। ছেলে প্রসব করার পর থেকেই এই অসুখ। কত শত চিকিৎসা, কোনোই সুরাহা নেই।

কেউ-কেউ বললে, গঙ্গার ধারে কোনো বাড়িতে তাঁকে রাখা হোক, গঙ্গার হাওয়ায় রোগের উপশম হবে।

রাধাকান্ত দেবের 'মুমূর্ষু নিকেতনে' রুগীকে রাখা হল।

মরেও না তরেও না, ভোগান্তি সার।

গিরিশের ভাই অতুল, আত্মীয় দেবেন বোসের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল।

'এর একটা বিহিত করো।' অতুল বললে সকাতরে।

'কেন, কী হয়েছে? কেমন আছে তোমার মেজবৌদি?'

'মৃত্যুমুখে পড়ে আছে, প্রাণ যাচ্ছে না।'

'ভালো হবার সম্ভাবনা নেই?'

'মনে হয় না তো। এখন যন্ত্রণার শেষ হয় এই রুগীর কামনা। তুমি যদি একবার মেজদাকে বলো!'

'কী বলব?'

'তার মন থেকে মেজবৌদিকে ছেড়ে দিতে।' বললে অতুল, 'তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন না বলেই মেজবৌদি যেতে পাচ্ছেন না। যন্ত্রণা দীর্ঘতর হচ্ছে। তুমি ভাই মেজদাকে বলো তাঁর দুটি পায়ের ধুলো দিন, তাই মাথায় নিয়ে যাত্রা করুন মেজবৌদি, তাঁর যন্ত্রণার অবসান হোক। মেজদাকে তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না রাজি করাতে। একবার দেখ না চেষ্টা করে।'

দেবেন সামনে এসে দাঁড়াতেই যেন বুঝতে পেল গিরিশ। জিজ্ঞেস করলে, 'কী অবস্থা?'

'তাঁর যন্ত্রণা আর দেখা যাচ্ছে না।'

'তা হলে, কী বলো, ছেড়ে দিই?' শূন্য চোখে তাকাল গিরিশ।

'আর কী হবে আটকে রেখে?' বললে দেবেন, 'তোমার দুটি পায়ের ধুলো দাও। দুর্গা বলে যাত্রা করুক।'

গিরিশের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকানো মাত্রই রুগী শেষ নিশ্বাস চুকিয়ে দিল।

'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

কিন্তু গিরিশের শোক করবার অধিকার নেই। সমস্ত সে ঠাকুরে সমর্পণ করে দিয়েছে। বকলমা দেবার পর সে তো সর্বস্বত্বশূন্য, সে নাবালক, সমস্ত কিছু ভার তার অছি-র হাতে, আমমোক্তারের হাতে। কথাটি বলার উপায় নেই।

কিন্তু অন্তর্দাহ যায় কিসে! গিরিশ শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। একবার পেন্সিল দিয়ে শ্লেট ভর্তি করে আবার শ্লেট মুছে ফেলে। অঙ্ক মেলে না। আবার সংখ্যা সাজায়। আবার মোছে।

চিত্ত স্থির করবার পক্ষে অঙ্কের মত জিনিস নেই।

নল-দময়ন্তী নাটকে শোকের সময় নল গণনা করতে বসেছে। যখন ঋতুপর্ণ তাকে গণনাবিদ্যা শেখায়, বলেছিল, 'চিত্তস্থৈর্য এ বিদ্যার মূল।'

এবার আধ্যাত্মিক নাটক ছেড়ে সামাজিক নাটকে এস। ইতিমধ্যে 'স্বর্ণলতা' অবলম্বন করে 'সরলা' হয়ে গেছে, গিরিশ 'প্রফুল্ল' লিখল।

পরে 'মিনার্ভায়' গিরিশ নিজে নেমেছিল যোগেশের পার্টে। তার মত আর কে বলতে পারবে আন্তরিক হয়ে : আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

এখন গিরিশের একমাত্র আকর্ষণ দ্বিতীয়া স্ত্রীর ফেলে-যাওয়া শিশুটা। এমন সুলক্ষণ যেন হতে নেই, ঘর যেন আলো করে আছে। ঠাকুরের কাছে বর চেয়েছিল, তুমি আমার ঘরে পুত্র হয়ে জন্মাও। কে জানে এই সেই বাঞ্ছিত পুত্র কিনা। মধু রায়ের গলিতে গ্যাস ছিল না, ঠাকুরের দেহের জ্যোতিতে সমস্ত গলি আলো হয়ে থাকত। তেমনি অন্ধকার ঘরে ছেলে এনে রাখলেই ঘর আলো হয়ে যায়।

তাই ছেলে যখন পেটে তখন তার মা থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠত : হরিবোল, হরিবোল! কুলবধূ এমনি উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে তিরস্কারও কম সহ্য করতে হয়নি তাকে। এ কে আমার পেটে এল? এ কে দুঃসহ গুরুভার?

যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু যে-সে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়াও, যাবে না। ঠাকুরের ভক্ত সন্তানেরা আসুক, একেবারে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠাকুরের মূর্তি এনে দাও তাই নিয়ে খেলা করবে। কখনো কখনো চোখ বুজে বসে থাকে। ওমা, চোখ বুজে বসে আছে কী? তাকিয়ে দেখে সামনে ঠাকুরের মূর্তি! আপোগণ্ড শিশু ঠাকুরের ধ্যান করছে।

একদিন তার কী কান্না! দেয়ালে রামকৃষ্ণের ফোটো টাঙানো, বারে বারে তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। সবাই বললে, ছবিটা চায়, ছবিটা নামিয়ে দাও।

ছবিটা নামালে দেখা গেল পিছনে অসংখ্য পিঁপড়ে। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলা হল আর অমনি ঠাণ্ডা হল শিশু।

কখনো-কখনো মাঠাকরুন আসেন গিরিশের বাড়ি। গিরিশের বোন দক্ষিণাই নিয়ে আসে। গিরিশের সাহস নেই মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তার ছেলে দিব্যি মার কোলের উপর চড়ে বসে। হাততালি দেয়। হাসে খিলখিল করে।

তিন বছর বয়েস, এখনো কথা কইতে পারে না। হাবভাবে সব দেখায়, উ-আ শব্দ করে।

বরানগরে সৌরীন ঠাকুরের বাড়িতে মা আছেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এসে বললে গিরিশকে, 'মাকে দেখবেন চলুন।'

'না, না, আমি মাকে দেখব কী!' গিরিশ আপত্তি জানাল।

'বা, সব ছেলেই তো মার ছেলে। শান্ত হলেও সে ছেলে, দুরন্ত হলেও সে ছেলে! এত দিনেও মাকে দেখেন নি সে কেমন কথা!'

পিড়াপিড়ি করতে লাগল। ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে চলল বরানগর। ছেলেই বুঝি তার ছাড়পত্র।

দোতলায় আছেন মা। ছেলে কোলে গিরিশ নিচের ঘরে এসে উঠল।

বারে বারে উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল। উ-আ শব্দ করে বোঝাতে লাগল, উপরে চলো।

প্রথমে কেউ বোঝে না। শিশু কেন অমন শব্দ করছে। পরে একজনের খেয়াল হল শিশু মাতাঠাকরুনের কাছে যেতে চায়।

সে তখন শিশুকে কোলে করে নিয়ে গেল উপরে। মাকে দেখেই কোল থেকে নেমে পড়ল শিশু, একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে প্রণত হল।

তারপর সে নিজেই নিচে নামল। গিরিশের হাত ধরে টানতে লাগল। চলো তুমিও উপরে চলো।

'ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কী! আমি যে মহাপাপী!' গিরিশ কেঁদে উঠল।

শিশু কিছুতেই ছাড়ে না। মার কাছে আবার পাপ-পুণ্য কী! চলো।

ছেলে কোলে নিয়ে গিরিশ উপরে উঠল। ছেলেকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। অমনি মায়ের পদতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল লুটিয়ে।

'মা, এ ছেলের দরুনই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।' চোখের জলে

ভাসতে লাগল গিরিশ।

তখনো সে মায়ের মুখ দেখেনি, শুধু চরণদুখানি দেখেছে।

সেই ছেলের ঘোর অসুখ করল। আর এমন অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি আস্কারা করতে পারল না। বলো কী করলে সারে, কিসে শিশু ভালো হয়! ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবারও তার আর অধিকার নেই। সে যে সর্বস্বভার সঁপে দিয়েছে ঠাকুরকে। তখন সে নরেনকে ধরল। বললে, 'নরেন, তুমি এই শিশুর কানে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়ে দাও। তা হলে যদি সে বাঁচে।'

নরেন গিরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে দিলে যদি ও বাঁচে।'

নরেন সম্মত হল। শিশুকে সন্ন্যাস দিল নরেন। তবু, তবু শিশু বাঁচল না।

॥ ষোলো ॥

ছেলের অসুখে গিরিশ জেরবার হয়ে যাচ্ছে, নিয়মিত যেতে পাচ্ছে না থিয়েটার। কর্তৃপক্ষ নিদারুণ অসন্তুষ্ট। কী এসে যায় যদি বাদ দেওয়া যায় গিরিশকে। ঠিকমত আসবে না, খাটাখাটনি করবে না, শুধু মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাবে, এ অসহ্য। এক জনের মাতব্বরি চিরদিন বরদাস্ত করতে হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখেনি। দাও ওকে বরখাস্ত করে।

স্টার গিরিশকে বরখাস্তের চিঠি পাঠাল।

সেই স্টার যাকে এক মুঠোয় ষোল হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিল। আত্ম-গোপন করে লিখে দিয়েছিল 'নসীরাম।'

স্টার থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেল গিরিশ।

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে। অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ, শরৎ বাঁড়ুয্যে বা রানুবাবু, প্রমদা, মানদা—প্রায় পনেরোজন নট-নটী। দলপতি নীলমাধব। তারা সবাই মিলে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে 'সিটি থিয়েটার' খুলল। অভিনয় করল বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেবচরিত।

আর যায় কোথা! গিরিশ আর নীলমাধবের বিরুদ্ধে স্টার মামলা ঠুকল হাইকোর্টে। বললে, ঐ সব নাটকের অভিনয়স্বত্ব স্টারের, সিটির অধিকার নেই কানাকড়ি।

গিরিশ তখন মধুপুরে, রুগ্ন ছেলের জন্যে হাওয়া বদলাতে এসেছে। খবর পেয়ে ছুটল কলকাতা।

চিরকাল শান্তিই তার একমাত্র কাম্য, স্টারের সঙ্গে রফা করল। মাসে একশো টাকা সে ভাতা পাবে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কোনো থিয়েটারে যোগ দিতে পারবে না। না, কোনো ভাবে সাহায্যও করতে পারবে না। যদি নাটক লেখে

তার খরিদের অগ্রাধিকার থাকবে স্টারের। যদি নাটক স্টারের অমনোনীত হয় তবেই গিরিশ তা বেচতে পারবে অন্যত্র। কিন্তু, খবরদার, খরিদদার দলকে অভিনয় শেখাতে পারবে না। কোনো পক্ষে চুক্তিভঙ্গ হলে পাঁচ হাজার টাকা খেসারত।

শান্তি চাই। যে কোনো দামে শান্তি কিনে নিল গিরিশ।

মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞানসভায় যোগ দিল। বিজ্ঞান যদি শান্তি দেয়। পড়তে লাগল বিজ্ঞানের বই। ঘাঁটতে লাগল যন্ত্রপাতি। লেবরেটরিতে শিশি পরিষ্কার করতেও বাধল না।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, ডাক্তার সরকার, হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকেছে। ঠাকুরের চিকিৎসা করছে। কী যে মজা ঠাকুরের সান্নিধানে, এসে আর উঠতে চায় না।

গিরিশ বললে, 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন কথা! আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর চিকিৎসা!' ডাক্তার সরকার নিশ্বাস ফেলল : 'যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল।'

কিন্তু ডাক্তার অবতার মানতে রাজি নয়।

'ঈশ্বর সব কিছু হতে পারেন, শুধু মানুষই হতে পারেন না, এ কথা কি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জোর করে বলতে পারি?' বললেন ঠাকুর, 'একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়।'

'যেটুকু ভালো বিশ্বাস করলুম।' ডাক্তার বললে সরল কণ্ঠে, 'ধরা দিলেই তো চুকে যায়, কোনো গোল থাকে না। নইলে বলুন, রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথমে দেখুন বালি বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলল। এ কি ঈশ্বরের কাজ?'

গিরিশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'এ মশাই ঈশ্বরের কাজ। এ কখনো মানুষে পারে?'

'তারপর দেখুন সীতাবর্জন।'

'এ কাজও ঈশ্বরেই সম্ভব। মানুষের অসাধ্য।' গিরিশ আবার হুমকে উঠল।

ঈশান মুখুজ্জে লক্ষ্য করল ডাক্তারকে : 'আপনি কেন মানছেন না? এই যে বললেন যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। আপনি ঈশ্বরই যদি মানলেন তবে অবতার মানতে বাধা কী।'

'মানতে বাধা যেহেতু ওঁর সায়েন্সে এ লেখা নেই।' ঠাকুর হাসলেন : 'বইয়ে লেখা না থাকলে এ কেমন করে বিশ্বাস হয়!'

পরে বললেন আপন মনে, 'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ আমি মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং।'

কিন্তু গিরিশ গর্জে উঠল : 'আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতেই হবে। কিছুতেই আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। হয় বলুন শয়তান নয় ঈশ্বর। কিন্তু মানুষ বলতে দেব না।'

মহেন্দ্র সরকার হাসতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থাকলেই নানা রকম সংশয় নানা রকম অহঙ্কার।'

'মশাই কী বলেন?' গিরিশ বাঁকা চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে : 'কুরুটের কি জ্ঞান হয়?'

'রাম বলো! তাও কখনো হয়?'

সরল যদি কেউ থাকে তো গিরিশ। তার ষোল আনা বিশ্বাস। কিন্তু ভক্তি বুঝি তারও চেয়ে বেশি। ভক্তি পাঁচ সিকে পাঁচ আনা।

সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশের বিজ্ঞানসভা নিয়ে কথা হচ্ছে।

বালকের মতন স্বচ্ছ কৌতূহলে ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গা, আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে?'

ডাক্তার বললে, 'তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কাণ্ড কারখানা দেখে।'

'সত্যি?' আনন্দে উজ্জ্বল ঠাকুরের চোখ।

'বিজ্ঞান যত বাড়বে বিস্ময়ও তত বাড়বে।' বললে ডাক্তার : 'আর আপনার নরেন বলে ঈশ্বরই প্রচণ্ডতম বিস্ময় আর তাঁকে জানাই মহত্তম বিজ্ঞান।'

কিন্তু ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? তিনি প্রত্যক্ষীভূত হতে পারেন? বললেই হল? যার অমন বিশ্বাস তার অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাসের দাম কী।

'অন্ধ বিশ্বাসটা কাকে বলিস আমাকে বলতে পারিস?' নরেনকে বলছেন ঠাকুর, 'বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কী! হয় বল বিশ্বাস নয় বল জ্ঞান। তা নয়, বিশ্বাসের আবার কতগুলো অন্ধ, কতগুলো চোখওয়ালা এ আবার কোন রকম?' জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বস্তু, যেমন তোকে দেখছি তেমনি, তুই যদি চাস তুইও দেখবি।'

গিরিশের 'কালাপাহাড়'-এ এরই প্রতিধ্বনি।

সাধু চিন্তামণিকে জিজ্ঞেস করছে কালাপাহাড় : 'মশাই, ঈশ্বর আছে?'

'খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু আছে কিনা জানি না।' উত্তর দিল চিন্তামণি।

'কোথায় ঈশ্বর?'

'ঐ তেঁতুল গাছে।'

'এ পাগল নাকি?'

'কেন, পছন্দ হল না? আচ্ছা, ভালো করে বলছি—তোমার কাছে, অন্তরে অন্তরে, সর্বত্র। এই যে, হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে।'

'অন্ধ বিশ্বাস।' কালাপাহাড় মুখ ফেরাল।

'আমায় বলছ অন্ধ বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে বসে আছি আর

তোমরা চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে ভূতের মত অন্ধকারে ঘুরছ। আমার অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি। আর চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মরছ।'

কালাপাহাড় কঠিন। বললে, 'যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হতে হয় হোক, আমি কখনো প্রত্যয় করব না।'

'আহাহা, কী যুক্তির চোট! যে বিশ্বাসে ভগবান পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কানা, তোমার মত ধানকানা না হলে কেউ বিশ্বাস করে না।'

কালাপাহাড় বিরক্ত হয়ে বললে, 'যাও আর বাক্যব্যয়ে কাজ নেই। যে কথার মাথামুণ্ডু নেই তা প্রত্যয় করব কেমন করে?'

'ঈশ্বর আছেন এই কথাটারই মাথামুণ্ডু নেই আর দুনিয়ার বাকি যত কথা আছে সব দশমুণ্ডু রাবণ। আচ্ছা, বেশ, তোমার থেকে একটা মুণ্ডু কথা জেনে নিই।'

'এই সূর্য উঠেছে, দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ।'

'সত্যি?' চিন্তামণি তাকাল সবিস্ময়ে।

'সত্যি না? সে কি, দেখতে পাচ্ছ না চোখের উপর?'

'কি করে জানব বলো। কাল রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলাম—হাতী চড়েছি, তার পর কোথায় বা হাতী কোথায় বা কি!'

'তুমি নিতান্ত নির্বোধ। স্বপ্ন আর জাগা বোঝ না।'

'না, চক্ষুওলা অবিশ্বাসে তো বোঝা যায় না। যখন স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন মনে করেছিলাম সত্যি দেখেছি। এখনো মনে করছি সত্যি দেখছি। দেখছি চক্ষুওলা অবিশ্বাসে দেখলে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বোঝা যায় না। তবে অন্ধ বিশ্বাস করতে বলো। সে এক আলাদা—'

'কি বলছ?' কালাপাহাড় অস্থির হয়ে উঠল।

'দেখ একটা কথা তোমায় বলি।' চিন্তামণি বললে শান্তস্বরে, 'এক ফকির ছিল, রোজ দিনের বেলা ভিক্ষে করত আর রাত্রে স্বপ্নে বাদশা হত। জেগে যেমন আজ এ বাড়ি ভিক্ষে করলে কাল সে বাড়ি করলে, স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দান নিলে কাল ওকে তালুক দিলে। বলতে পারো তার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে? তুমিও যদি স্বপ্নে সূর্য দেখ, দেখে মিথ্যে বলতে পারো—তাহলে বোলো তোমার সে সূর্য মিথ্যা এ সূর্য সত্য।'

'স্বপ্নে কি কখনো মনে হয় যে স্বপ্ন দেখছি?'

'জেগেও কি কখনো মনে হয়না মিথ্যে দেখছি? দেখ, চোখওয়ালা অবিশ্বাসে বড় ফ্যাসাদে ফেলে দিল।'

কালাপাহাড় সম্পর্কে চিন্তামণির কাছে নালিশ হচ্ছে : 'বলব কি বাবাজি, যেমন মড়া দেখলে শকুনি পড়ে তেমনি ছিষ্টির ছুঁড়িগুলো ওকে খাবার চেষ্টায় খালি ফেরে। 'কত বেটি কত ঠাট ঠমক করে কথা কইত, ও কিন্তু ফিরত না। কারুর কথায় কান দিত না, তাই বেটিরা বলত, কালা। আর ঠিক ঐ বসে ধ্যান করত, নড়ত না, তাই বেটিরা নাম দিয়েছিল পাহাড়। কিন্তু আজ তো পাহাড়

কাত—উন্মাদিনী নবাবনন্দিনী—'

কালাপাহাড় নিজেই গেল চিন্তামণির কাছে। জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, রমণীর কটাক্ষ কি কোনোদিন বিদ্ধ করেনি তোমাকে?'

চিন্তামণি বললে, 'বড় জোর করে ফোটাতে পারেনি, অমনি ভাসা ভাসা গিয়েছে। একে তো বেটিদের ভয়ে সরে বেড়াতুম, ভাবতুম কোনোদিন গলায় কাপড় দেবে—তারপর ভাবতুম, বেটিদের অত জোর কিসের? ঠাউরে দেখলুম, এক ফোঁটা রূপের। আমি মজা পেলুম আর কি। মনে মনে ঠিক করলুম যে, রোসো, যার খুব রূপ, তাকে নেব। গুরু বললেন, খুব রূপ এক ভগবানের। এই সুন্দর সাগরে ভাসলুম আর কি। ছটাকে রূপ আর নজরে এল না। কিন্তু এখনো বলছি আমার গা-ছমছমানি কমেনি।'

'কেন?'

'আরে বোঝ না, বেটি আর রূপ পেয়েছে কোথা? ও রূপ তা তাঁরই, ঈশ্বরের। ঐ ছটাকে রূপে তো জগৎ মজিয়ে রেখেছে। কাজ কি ওধার দিয়ে চলে? কেউ কাছে এলে রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়ে বসে থাকি।'

ঠাকুরেরই ভাবের প্রতিচ্ছায়া। ঠাকুর বলতেন, 'কামিনী চুম্বক পাথর—ছোট চুম্বক পাথর। ঈশ্বর সব চেয়ে বড় চুম্বক পাথর। কামিনী কী করবে?'

চিন্তামণির পার্টে স্বয়ং গিরিশ। আর কালাপাহাড় অমৃত মিত্র।

সিটি থিয়েটারের বিরুদ্ধে স্টারের নালিশ টিকল না। বাজারের চলতি নাটকের অভিনয় সব থিয়েটারেই হতে পারবে। একক কোনো অধিকার নেই স্টারের।

পাথুরেঘাটার প্রসন্ন ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখুজ্জে 'মিনার্ভা' থিয়েটার খুলল। সিটি থিয়েটারকে ডাকল প্লে করতে! নীলমাধব অংশ চেয়ে বসল। গিরিশ বললে, 'আগে নাগেন্দ্রবাবুকে থিয়েটার তৈরির খরচটা তুলতে দাও, পরে শেয়ার নিও।'

নীলমাধব রাজি নয়।

খেপে গেল গিরিশ। বললে, আমি নিজেই দল করব। অর্ধেন্দুশেখরকে ডাকো।

কিন্তু স্টারের সঙ্গে তার চুক্তির কী হবে? নাগেন্দ্র স্টারকে পাঁচ হাজার টাকার খেসারত দিল। চুক্তি খারিজ হয়ে গেল। ছাড় পেল গিরিশ। ম্যানেজার হল মিনার্ভার।

নতুন করে ম্যাকবেথ অনুবাদ করল। নামাল মিনার্ভায়। ম্যাকবেথ স্বয়ং গিরিশ। লেডি ম্যাকবেথ তিনকড়ি। আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী কী না সাজল—পোর্টার, ডক্টর, মার্ডারার।

বিল্বমঙ্গলে প্রথম নামে তিনকড়ি সখীর ভূমিকা নিয়ে। কথা নেই, শুধু পাখা নেড়ে হাওয়া করা। তারপর বিবাহ-বিভ্রাটে। সেখানেও নির্বাক বাসর-জাগাদের একজন। রূপসনাতনে প্রথম মুখ খোলে। সখী হয়ে গান গাইল: 'দেখ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল ভুজঙ্গিনী।'

গানে হাততালি পড়ল। থিয়েটারের কর্তারা খুশি হয়ে তিনকড়িকে পুরস্কার দিল। তিনটি টাকাও নয়—মাত্র এক টাকা। সেই টাকাটাই আজীবন বাঁচিয়ে রেখেছে তিনকড়ি। তার প্রথম পুরস্কার।

কিন্তু তিনকড়ির মায়ের ইচ্ছে নয় যে তিনকড়ি এই থিয়েটারেই বাঁধা পড়ে থাকে। মায়ের হিসেব মত বাঁধা পড়ার আরো ভালো জায়গা আছে।

'আপনি দুশো টাকা চেয়েছেন তা দেব। বেশ, থিয়েটারে যা ও মাইনে পায় তাও দেব।' বললে ভদ্রলোক, 'কিন্তু ওকে থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।'

'থিয়েটার আমি ছাড়তে পারব না।' ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে তিনকড়ি বললে সদর্পে।

'মেয়ে যেন ঢঙ!' মা ধমকে উঠল। ভদ্রলোককে বললে, 'তা কাল আসবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।' মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানল : 'থিয়েটার ছাড়ার জন্যে কিছু আটকাবেনা।'

'আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, আমি ছ মাসের টাকা অগ্রিম দিচ্ছি।' বললে ভদ্রলোক।

'বেশ, কাল আসবেন।'

'হ্যাঁ কাল সব টাকাকড়ি নিয়ে আসব। কাল সন্ধেয় আপনার মেয়ে যেন থিয়েটারে না যায়।'

মা অনেক প্রলোভন দেখাল মেয়েকে। সমস্ত গা একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। দালান বালাখানা করে দেবে শেষ পর্যন্ত, আর তোর থিয়েটারে আছে কী।

তবু পরদিন মার চোখে ধুলো দিয়ে থিয়েটারেই পালিয়ে গেল তিনকড়ি। সন্ধের সময় ভদ্রলোক এসে দেখল পাখি খাঁচায় নেই। খুব খানিক গালাগালি করে চলে গেল আগুন হয়ে।

তারও চেয়ে আগুন হয়েছে মা। রাতে বাড়ি ফিরতেই তিনকড়িকে বাঁকারি দিয়ে পিটতে লাগল। হতভাগী হারামজাদি যমের অরুচি—

মারের চোটে তিনকড়ি জ্বরে পড়ল। তিনদিন বেহুঁস হয়ে রইল। হ্যাঁ, মরব, তবু আমার সাধনার ধন, থিয়েটার ছাড়ব না। আমি আর যা হই না হই তা পরে কিন্তু প্রথমে ও প্রধানে আমি শিল্পী, আমি অভিনেত্রী।

'কে আপনি? কোত্থেকে আসছেন?' আগন্তুক ভদ্রলোকের প্রতি তিনকড়ি মুখিয়ে উঠল।

'আমি গিরিশবাবুর থেকে আসছি,' বললে ভদ্রলোক, 'তিনি মিনার্ভাতে আছেন। তিনি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যাবে?'

'যাব।' তিনকড়ি লাফিয়ে উঠল।

'তা হলে ঠিক থেকো। সন্ধের সময়ে গাড়ি আসবে।'

গাড়ি এল। তিনকড়ি গিরিশকে প্রণাম করে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ আলাপ করেই গিরিশ বুঝল এ মেয়েটির মধ্যে প্রতিভা আছে। আদর্শের প্রতি আনুগত্য আছে—হয়তো বা অনুরাগ।

থিয়েটারের কর্তাব্যক্তি একজনকে ডেকে গিরিশ বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে এক বছরের একটা এগ্রিমেণ্ট করে নাও আর কাল থেকে এর বাড়িতে যাতে গাড়ি যায় তার ব্যবস্থা কোরো।'

গিরিশের ঔদার্যে ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে গেল তিনকড়ি।

প্রমদার কিছুতেই লেডি ম্যাকবেথটা হচ্ছে না, ভুল দেখিয়ে দিলেও পারছে না শুধরে নিতে।

'ডাকো ঐ নতুন মেয়েটাকে ডাকো।'

প্রমদা মুখ ভার করে বসে রইল। আর যে পার্টটা সে যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করে উঠতে পারছে না তাই একটা নামগোত্রহীন পুঁচকে ছুঁড়ি আয়ত্ত করবে এ কল্পনারও বাইরে। থিয়েটারে শুধু আসছে-যাচ্ছে, পার্ট পাচ্ছে না, এই বলে তিনকড়ির যেটুকু অভিমান ছিল তা এই নিমন্ত্রণে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

'যাও না, ওঠো না, গিরিশবাবু ডাকছেন।' প্রমদার দলের একটা মেয়ে তিনকড়িকে ঠেলে দিল।

তিনকড়ি গিরিশের সামনে দাঁড়াল নত চোখে।

'আচ্ছা তুমি বলো দেখি, শুনি—'

পার্টের কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তিনকড়ি বললে স্নিগ্ধস্বরে, 'কাল বলব।'

তার বিনয়ে খুশি হল গিরিশ। বললে, 'তাই ভালো। আজ রাত্রে পার্টটা ভালো করে দেখে রাখো। কাল বলবে।'

সারা রাত ঘুম হল না তিনকড়ির। নটনাথের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। যেন সফল হই। আমার মধ্যে গিরিশবাবুর স্বপ্ন যেন সার্থক হয়।

বারে বারে পড়ে পার্টটা মুখস্ত করে ফেলল তিনকড়ি। কোথায়-কোথায় প্রমদার কী ভুল হচ্ছিল তাও শুধরে নিলে!

পরদিন রিহার্সালে বেজায় ভিড়। দেখি নতুন মেয়েটা কেমন বলে।

মনে-মনে নটনাথকে প্রণাম করে আরম্ভ করল তিনকড়ি।

গিরিশবাবুর কিছু বলবার আগেই থিয়েটারের লোকেরা এক বাক্যে বললে, 'বাঃ, বেশ হবে। পারবে। প্রমদার চেয়ে অনেক ভালো করবে।'

শুধু প্রমদাই মানতে চাইল না।

লেডি ম্যাকবেথের পার্টে নামল তিনকড়ি। তার জয়জয়কার পড়ে গেল।

'আমি নিরক্ষর নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা অধম মেয়ে, কিন্তু আমি আজ অভিনেত্রী বলে গণ্যমান্য—এ কার কৃপায়?' বলছে তিনকড়ি, 'এ শুধু গিরিশবাবুর কৃপায়! তাঁর কী সুন্দর মিষ্টি কথা, কী সরল ভাব! কী বিপুল পরিশ্রমে লোহাকে সোনা করার চেষ্টা! তাঁর মত আর গুরু কে! সুহৃদ কে!'

গিরিশের সাহচর্যে কি শুধু অভিনয়ের কলাকৌশলই শিখেছে, না, তার সংস্পর্শে শিখেছে কিছু ভক্তি, আর বিশ্বাস আর শরণাগতি?

'জানি কত অযোগ্য লোক আসে।' বলছেন সারদামণি : 'হেন পাপ নেই

যা জীবনে করেনি। কিন্তু আমাকে যখন মা বলে ডাকে তখন সব ভুলে যাই। যা হয়তো পাওয়া উচিত নয় তারও বেশি দিয়ে ফেলি।'

তিনকড়ি আর তারাসুন্দরীও এসেছে মার কাছে। ঐশ্বর্যের বেশে নয়, দীনহীনার মত। বসেছে মার পায়ের কাছে। মা প্রসাদ দিয়েছেন। প্রসাদ খেয়ে জায়গাটা নিজের হাতে নিকোল দুজনে। শালপাতা নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

হ্যাঁ, ভক্তিতেই হবে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। কী বলছেন ঠাকুর? 'ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।'

থিয়েটারেও নটনাথ। থিয়েটারেও ভক্তি।

ডাক্তার সরকার গিরিশের বুদ্ধদেবচরিত দেখে এসেছে। দেখে যারপরনাই আনন্দিত।

বললে গিরিশকে, 'তুমি বড় বদ লোক। আমাকে রোজ থিয়েটারে যেতে হবে।'

'কেন, এ কথা কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

ডাক্তার বললে, 'ওর থিয়েটার বড় ভালো লেগেছে।'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।' বললেন ঠাকুর।

ডাক্তার ফোঁস করে উঠল : 'সব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্যে তোমার কেন এত মাথাব্যথা?'

'বলাচ্ছেন তাই বলি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।'

'তুমি যদি যন্ত্র তো চুপ করে থাকো।'

গিরিশ রুখে উঠল : 'কিন্তু সাধ্য কী চুপ করে থাকি? তিনি করান তাই করি। সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেউ এক পা যেতে পারে?'

'ফ্রি উইল তিনি দিয়েছেন তো?' বললে ডাক্তার, 'আমি মনে করলে ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারি, আবার না করলে নাও করতে পারি।'

'যদি করেন তো ভালো লাগে বলে করেন।' গিরিশ পালটা বললে, 'আপনি করেন না, সেই ভালো লাগাটা করায়।'

'কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি।'

'সেও কর্তব্য কর্ম করতে ভালো লাগে বলে।' গিরিশ আবার পালটা ছাড়ল।

'মনে করো একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে—'

'ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয় তাই আগুনের ভেতর যান।' বললে গিরিশ, 'আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া।'

সকলে হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক তাই। সাধু গাঁজা তৈরি করছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ।'

॥ সতেরো ॥

তুমি কি কষ্টিপাথর যে কে ভালো সোনা কে মন্দ সোনা পরখ করে-করে বেড়াবে? তোমার পরখ কে করে?

'কারু নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না।' ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'

অদোষদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।

ঠাকুর যোগেনকে বললেন, 'আমার বাতি ফুরিয়ে গিয়েছে। বাগবাজারের গিরিশ ঘোষের কাছ থেকে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয় আমার নাম করে।'

একটা মোমবাতির জন্যে সেই বাগবাজার! যোগেন প্রায় হতভম্ব। কিন্তু গুরুর কথার উপর কথা কী! অবাক্যব্যয়ে তা মানতে হবে।

কিন্তু গিরিশ ঘোষ তো শুধু নামেই শোনা। চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই। বাগবাজারে কোথায় বাড়ি তাই বা কে জানে।

রাত হয়েছে, তা হোক, খুঁজে খুঁজে বাড়ি ঠিক বার করল। কিন্তু গিরিশ ঘোষ কোথায়? কোন শ্রাদ্ধ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে।

অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চুপচাপ বসে রইল যোগেন।

কতক্ষণ পরেই ফিরল গিরিশ। কিন্তু মদে একেবারে দুর্মদ হয়ে ফিরেছে। কাছা-কোঁচা বেসামাল, টলছে আর টলছে, এটা ধরছে, ওটা ধরছে।

আগন্তুক দেখে এক পলক থমকাল গিরিশ। জিজ্ঞেস করলে : 'কে? কে তুমি?'

'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে?' নিমেষে স্থির হল গিরিশ। উত্তর দিকে মুখ করে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করল।

'কেন? কী চাই?' যোগেনের দিকে তাকাল গিরিশ।

'একটা বাতি।'

'বাতি! বাতি দিয়ে কী হবে?' প্রায় তেড়ে এল গিরিশ।

'ঠাকুর চেয়েছেন।'

'ঠাকুর চেয়েছেন?' গিরিশ এবার একেবারে মাটির উপরে গড় হয়ে প্রণাম করল : 'আহা, কী দয়া! একটা বাতির জন্যে এতদূর পাঠিয়েছেন আমার কাছে? একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও। আজ আমার কী সৌভাগ্য!'

হঠাৎ, কোন খেয়ালে কে জানে, চাকা ঘুরে গেল। উলটো সুর ধরল গিরিশ। ঠাকুরের উদ্দেশে স্তবস্তুতি নয়, নির্জলা গালাগাল।

'বলি, বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? তোমার বরানগর আলমবাজারে বাতি মেলে না? সেখানকার দোকান সব উঠে গেছে? একেবারে আমার বাড়িতে ধাওয়া করেছ! কেন, পয়সা নেই কেনবার? আমি কি বাতির ব্যবসা করি? আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন?' বলে বস্তি-

পচা খিস্তি সুরু করল। মাতালের মহাপ্রসাদ।

আকাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল যোগেন।

একটা বাতি তার দিকে ছুঁড়ে দিল গিরিশ : 'নাও, পালাও, অন্ধকার আলো করতে বলো।'

বাতিটা কুড়িয়ে নিয়ে যোগেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। মাতালটা যে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়নি তাই ভাগ্যি।

হন্তদন্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এসে পড়ল যোগেন। বললে, 'কোন এক ত্রেপণ্ড্র মাতালের কাছে পাঠিয়েছিলেন—'

'কেন, কী হল?' ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন : 'দেয়নি বাতি?'

'বাতি দিয়েছে, কিন্তু কী বন্ধ মাতাল! খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়!'

'কাকে?' ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'আর কাকে? আপনাকে।'

এতটুকু ম্লান হলেন না ঠাকুর, বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'কী আবার করবে! এমন কদর্য গালাগাল কোনো ভদ্রলোকে করতে পারে, তাও আপনার সম্পর্কে, কল্পনা করা যায় না—'

'হ্যাঁ রে, আর কিছু করেনি?'

'সে সব কুকথা মুখে আনা যায় না।' উত্তেজনায় তখনো কাঁপছে যোগেন : 'এমন বন্ধ মাতালও কেউ হয়!'

কিন্তু ঠাকুরের এতটুকু বিকার নেই। দরদভরা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন আবার, 'হ্যাঁ রে, শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'হ্যাঁ, প্রথমে দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি বলে হাত তুলে নমস্কার করেছিল,' যোগেন বললে শান্তস্বরে, 'পরে আপনি পাঠিয়েছেন জেনে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল গড় হয়ে—'

'তবে?' আনন্দে উথলে উঠলেন ঠাকুর : 'তুই শুধু ওর মন্দটাই দেখলি, ভালোটা দেখলিনে? খালি মদ দেখলি, ভক্তি দেখলিনে? শুধু গালাগালই শুনলি, দেখলিনে আমার উপর কী টান, কী বিশ্বাস! শোন লোকের ভালোটাও একটু দেখিস, তাকে পুরোপুরি নিন্দের পাথারে ভাসিয়ে দিসনে।'

গিরিশ ঠাকুরের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বললে, আবার সেই কথা, 'আমি নিতান্ত পাষণ্ড। যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিই আপনাকে—'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো।—তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। বদরক্ত রোগ কারু কারু আছে। যত বেরিয়ে যায় তত ভালো।' সান্ত্বনায় বদান্য হলেন : 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময়ই কাঠ চড়চড় শব্দ করে। পুড়ে গেলে আর শব্দ নেই।'

'কি উপায় হবে আমার?'

'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে। দিন-দিন তোমার উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে।'

'হবে?' গিরিশ কাতরস্বরে বললে, 'আমি তো কিছুই করি না।'

'তোমার এমনিই হবে।' বললেন ঠাকুর, 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।'

আবার ডাক্তার সরকারের সঙ্গে গিরিশের সেই তর্ক। ডাক্তার অবতার মানে না, বলে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের আত্মা অনন্ত উন্নতির পথে চলেছে ঈশ্বরত্বের দিকে।

'অনন্ত উন্নতি। ইনফিনিট প্রোগ্রেস।' বললে ডাক্তার, 'তা না হলে বাকি জীবনটা বেঁচেই বা কী হবে। গলায় দড়ি দেব।'

'তাই দিন।' বললে গিরিশ।

'কিন্তু অবতার আবার কী! যে মানুষ খায়-দায় ঘুমোয় তার পদানত হব?'

'আপনাকে কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না—'

'তবে রিফ্লেকশান অফ গডস লাইট—যদি বলো, ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ হয়েছে, তা মানতে পারি।'

গিরিশ ব্যঙ্গ করে উঠল : 'কিন্তু আপনি তো ঈশ্বরের জ্যোতি, গডস লাইট দেখেননি—'

'আর তুমিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখছ না।' বললে ডাক্তার।

গিরিশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'আমি দেখছি। আই সি ইট। আমি আলোও দেখছি, প্রতিবিম্বও দেখছি। ইনি যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তা আমি প্রুফ করব। তা না হলে জিব কেটে ফেলব আমার।'

গিরিশের 'জনা'-তে সেই কথা। বিশ্বাসের জোরেই কৃষ্ণদর্শন।

লেডি ম্যাকবেথ ভালো চলল না। বিদগ্ধ মহল নিলেও সাধারণ দর্শক তৃপ্ত হল না। তখন কী আর করা? গিরিশ আবু-হোসেন লিখল। 'রাম রহিম না জুদা করো, দিলকি সাঁচ্চা রাখো জি।' এই গান ফিরতে লাগল মুখে মুখে।

তারপরেই 'জনা'। পুত্রশোকে করালিনী কালভুজঙ্গিনী জনা-র ভূমিকায় তিনকড়ি। আর-এক অভিনব চরিত্র বিদূষক, পেটুক, সরল, বিশ্বাসী—রাজা নীলধ্বজের প্রণয়মন্ত্রী। সেই ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর।

নীলধ্বজ অগ্নির কাছে প্রার্থনা করছে, যেন নবঘনকায় নররূপী নারায়ণের দর্শন পায়। অগ্নি বললে, মিটবে এ বাসনা।

'কি হে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?' বিদূষককে অগ্নি জিজ্ঞেস করল : 'তুমি কিছু চাইলে না?'

বিদূষক বললে 'আজ দেখছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি, তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম বললেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।'

'কেমন করে বল্লে যে হরিনামে সর্বনাশ হয়?'

'আমায় কি পেয়েছ ধানকানা, শুনবে তোমার হরির গুণপনা?' বললে বিদূষক, 'পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ দিশেহারা—আর রাধা? তার কাঁদা সার, একশো বছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কান দেন না কথায় কার, যেন কারু কখনো ধারেন না ধার—'

'ছি, ছি, তুমি কৃষ্ণনিন্দা করছ?'

'নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ।' বললে বিদূষক, 'যেখানে যান জ্বালান আগুন, যদি পদার্পণ হল মথুরায়, অমনি সেখানে উঠল হায়-হায়। পরে কৃপাময় হলেন পাণ্ডব সখা—বেজায় পীরিত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা গেলেন। তাই ভাবছি এমন সুখের এই পুরী, উদয় হয়ে শ্রীহরি না জানি কি কারখানাটা করবেন—'

'তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না।' অগ্নি বললে, 'হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন—'

'সে বহুকাল থেকে দেখে আসছি।' বিদূষক ব্যঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল : 'যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।'

'না, না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা, তুমি তাঁর রাঙা পায়ে স্থান পাবে।'

'তোমার সাতগুষ্টি সে স্থান পাক, তোমার দেবলোক উদ্ধার হয়ে যাক—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ, কৃষ্ণ ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না, তা নইলে তোমায় সাফ বলছি, আমি বামুনের ছেলে, হোম করতে তোমায় আবাহন করে ঘির বদলে জল ঢেলে দেব।'

'আচ্ছা। তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?'

'আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশবার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে তরে যায়। আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাবতে হবে না।'

বিদূষককে উদ্দেশ করে অগ্নি তখন বললে,

'ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম।
হরিভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভূবনে।
এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভবসাগর গোষ্পদ সমান তার।'

কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর অর্ধেন্দু হঠাৎ মিনার্ভা ছেড়ে দিল। এমারেল্ড ভাড়া নিয়ে নিজে আলাদা দল করে থিয়েটার চালাল।

তখন আর কী করা, গিরিশ নিজেই বিদূষক সাজল। তাতে আরো জমল যেন অভিনয়।

পুত্রশোকে উন্মাদিনী জনা। অর্জুনের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে পুরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর নীলধ্বজের প্রার্থনায় পুরীতে অর্জুন-সহ আসছেন শ্রীকৃষ্ণ।

প্রান্তর মধ্যস্থ শুষ্ক তরুতলে বিদূষক আর তার ব্রাহ্মণী এসে দাঁড়িয়েছে। এই অশ্বত্থ গাছ মা জনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে গিয়েছে।

'ওমা, এই ডাইনেখেগো গাছতলাটায় বসব কী গো!' ব্রাহ্মণী আপত্তি করল।

বিদূষক বললে, 'না রে, ডাইনেখেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল, বোধহয় শ্রীমধুসূদন মাঝে এর তলায় এসে বসতেন, তুই দেখছিস কী— বাস্তুবৃক্ষও থাকবে না।'

ব্রাহ্মণী অনুযোগ করল : 'হ্যাঁ গো, তুমি দিনরাত কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলো তো?'

'বুঝতে পারিনে, তোর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই বলে।' বললে বিদূষক, 'এই যে রাজবাড়িতে হাহাকার উঠে গেল, দেখলি নে? নামের গুণেই এইটুকু, এবার স্বয়ং উদয়! কে জানে কী হবে!' কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধতে লাগল বিদূষক।

'চোখে কাপড় বাঁধো কেন?' ব্রাহ্মণী উদ্বেগের সুরে বললে।

'তোমার বঙ্কিমনয়নের জ্বালায়।'

'আহা আমার আবার বঙ্কিমনয়ন কী!'

'তোমার নয়, তোমায় নয়, তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর আমি দেখিনি? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিমনয়ন, মুরলীবয়ান।'

'ওঃ! হরি তোমায় দেখা দেবার জন্য অমনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিনসেকে বাহাত্তুরে ধরেছে।'

'আরে রে থাম, থাম। ও নাম করিসনে। ওরে জানিস নে, ডাকলেই এসে উঁকি মারে। তোকে কৃপা কল্লেই বা আমায় রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস কোথা।'

'হতচ্ছাড়া মিনসের আক্কেল শোনো।' ব্রাহ্মণী ঝামটা দিয়ে উঠল : 'যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্ছে।'

'তুই কী বুঝবি বল।' বিদূষক বললে, 'মুরারি অবতার হয়ে এসেছেন, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন আর নগর ভেঙে মরুভূমি করছেন। ওরে, কেউ এড়াবে না রে—কেউ এড়াবে না, তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না করে ছাড়ে না তা বুঝিছি, তবে রয়ে-বসে একটু হাত গজায়, তাই চেষ্টা করছি।'

'চতুর্ভুজ হবেন! উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগী ঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে ধ্যান করে কিছু করতে পারে না আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন।'

বিদূষক সোল্লাসে বললে, 'আরে, রেখে দে তোর জপধ্যান, ও নামের ঠেলা জানিসনে।'

'তা তোমার কি, তুমি তো ভুলে ও নাম কর না।'

'আরে, ঝকমারি করে ফেলেছি বই কি। তোর মনে নেই, সেই যেদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে মোন্ডা তুলে রাখলি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলনুম, দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বামনীর হাতের খাড়ু খোলো, সেই অবধি আমার গা-ছমছমানি একদিনের তরেও যায় নি।'

ব্রাহ্মণী আবার ঝাঁজিয়ে উঠল : 'উনি একদিন হরি ডেকেছিলেন—ডেকে বৈকুণ্ঠে চললেন। চল মিনসে ঘরে চল, ন্যাকামো করিসনে।'

'তবে দেখবি? যা, তফাৎ গিয়ে একবার ডাক গে যা—যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খাব।'

'ওগো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠছে!' ব্রাহ্মণী প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'তোর কথা শনুনে আমি চোখ খনুলি, আর সব ভন্ডুল হয়ে যাক। একটা মধনুর শব্দ এখান অবধি আসছে, গাছ তো গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না।'

'ওগো, চোখের কাপড় খনুলে দেখ না ছাই। সত্যি সত্যি নতুন পাতা গজাচ্ছে।'

'সত্যি নাকি?' বিদনুষক বললে, 'তুই এদিকে-ওদিকে উঁকি মার, কেউ কোথায় নেই তো?'

'কে আবার তোমার এ ভুতুড়ে গাছতলায় আসবে?'

'কে আর বনুঝতে পাচ্ছিস নে?'

'বনুঝতে পেরেছি যে তোমার ঘাড় ভাঙবে।'

'এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছে পাতা অমন কত গজায়, তুই ওখানে চেপে বোস।' বিদনুষক চঞ্চল হয়ে উঠল : 'দ্যাখ দ্যাখ যেন কার পার শব্দ পাচ্ছি।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করল।

ব্রাহ্মণী বললে, 'ও একজন বনুড়ো বামনুন।'

'ভয় দেখা—ভয় দেখা,' বিদনুষক চেঁচিয়ে উঠল : 'সরে পড়নুক, নিদেন দনুবার গাছ-তলায় বসে হাই তুলে নাম করবে।'

'আপনি কে মশায়?' ছদ্মবেশী কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলে বিদনুষককে।

বিদনুষক পালটা জিজ্ঞেস করলে : 'আপনি কে আগে বলনুন।'

'আমি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।'

'আর আমি এক অন্ধ কন্ধকাটা।'

ছদ্মবেশী বললে, 'মশায়, আমি ক্ষনুধার্ত, আপনার বাস কি এই নগরে?'

'পনুর্বে ছিল, এখন অশ্বত্থ তলায় এসে বাস করছি।' বললে বিদনুষক।

'যদি কৃপা করে আমাকে কিছনু খেতে দেন।'

'বনুড়ো হলে তবনু একটনু আক্কেল হল না? শনুনছ না কার নাম করে ঐ গর্জন উঠছে, ঠাকুর যে স্বয়ং আসছেন রাজপনুরে। যদি ভালোই চাও নদী থেকে

দু' আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হয়ে যাও, নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।'

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বললে, 'আহা বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ বলো। তুমি বৈকুণ্ঠে যেতে চাও না?

'এক দম না।'

'কেন?'

'তোমার মতন অত সৌখিন নই, তোমার সখ থাকে তো নগরে গিয়ে সেঁধোও—'

'চোখে কাপড় বেঁধেছ কেন?'

'চোখের ব্যামো হয়েছে।'

'ওগো ও বামুন ঠাকুর,' ব্রাহ্মণী আকুলকণ্ঠে বললে, 'এ মিনসের কথা শোন কেন? পাছে কৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায় সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধেছে। খেপেছে গো খেপেছে, আমি ওকে কোন মতে নিয়ে যেতে প্যারছি না।'

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বিদূষকের দিকে এগিয়ে এল : 'সত্যি তুমি কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ? তুমি এমন কী পুণ্য করেছ যে কৃষ্ণ দর্শন পাবে?'

ব্রাহ্মণী বললে, 'উনি কবে একদিন হরিনাম করেছিলেন, তাই হরি এসে ওকে চতুর্ভুজ করবেন, ন্যাকা মিনসে—'

'হ্যাঁ ঠাকুর,' জিজ্ঞেস করলে ছদ্মবেশী : 'একবার হরিনাম করলে কি চতুর্ভুজ হয়?'

বিদূষক পুলকিত স্বরে বললে, 'তবে খোল খাড়ু বামনী, যা থাকে কপালে দিক হরি দেখা।'

শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিত মুরলীধর মূর্তিতে দেখা দিলেন। বললেন, 'দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি। দেখ তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থদেহ পল্লবিত হয়েছে, তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য।'

'তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যে।' গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদছে আকুল হয়ে।

ঠাকুর সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন, 'ওরে একে তামাক খাওয়া।'

'বড় খেদ রইল তোমার সেবা করতে পেলুম না।' মাথা তুলে বললে গিরিশ। সে শুধু নিজে কাঁদছে না, যে শুনছে সেও কাঁদছে। অন্তর দিয়ে মাখানো সেই আর্তি। বললে করজোড়ে, 'ভগবান, বর দাও, এক বছর তোমার সেবা করব। মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব করে দি। বলো এক বছর সেবা করতে দেবে?'

ঠাকুর বললেন, 'এখানকার লোকজন ভালো নয়, কে কী সব বলবে তোকে নিয়ে—'

'রেখে দাও লোকের কথা। বলো দেবে—'

'আচ্ছা, তোর বাড়িতে যখন যাব—'

'না তা নয়, এই খানে—এই খানে পূর্ণ ব্রহ্মের সেবা করব।'

গিরিশের জেদ দেখে নরম হলেন ঠাকুর। বললেন, 'আচ্ছা সে ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

'বেশ, তা হলে বলো, গলার অসুখ আরাম হয়ে যাক।'

'সে কী রে, তা কী করে বলি।'

'বেশ, না বলো, আমি ঝাড়িয়ে দেব।' বলে গিরিশ মন্ত্র বলার মত করে বললে, 'কালী, কালী!'

'ওরে আমার লাগবে।'

গিরিশ তা গ্রাহ্য করল না, শূন্যে হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগল : 'ফুঃ! ভালো হয়ে যা। ভালো হয়ে যা।'

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা বাপু, আমি ওসব বলতে পারিনে।'

'বলতে পারো না?'

'না। রোগ ভালো হবার কথা মাকে বলতে পারিনে। তবে, যা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।'

'আমায় ভুলোনো।' গিরিশ প্রায় ধমকে উঠল : 'তোমার ইচ্ছায় হবে। তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয় তা হলে সবই মিথ্যে।'

'ছি, ও সব বলতে নেই।' ঠাকুর নম্র মধুর কণ্ঠে বললেন, 'ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবতে চাও তা ভাবতে পারো। নিজের গুরু তো ভগবানই—তা বলে ও সব বলায় অপরাধ হয়।'

কিন্তু গিরিশ নাছোড়বান্দা। আবার বললে জোর দিয়ে, 'না, বলো, ভালো হয়ে যাবে।'

ভালো মানুষের মত ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা হয়েছে তা যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে আপন মনে গিরিশ বলছে, আশ্চর্য হচ্ছি, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কী তপস্যা করেছি যে আমি এই সেবার অধিকারী হয়েছি। আমার মতন ঘোর অপবিত্র আর কে আছে?

ঠাকুর বললেন, 'তুমি পবিত্র তো আছো। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।'

'ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝছ?' গিরিশ তাকাল চার দিকে, বললে, 'জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন তাদের উদ্ধার করবেন বলে।'

'গিরিশের পাপ নিয়ে আমার ব্যাধি।' এও তো ঠাকুরেরই কথা।

যা হয়েছে তা যাবে। তার মানে কি গিরিশের পাপ চলে যাবে? না, যে দেহ হয়েছে তা থাকবে না!

॥ আঠারো ॥

মিনার্ভায় 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্য নামাল গিরিশ।

'দিন গিয়েছে রাত হয়েছে ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা যায়নি নেশার ঘোর।'

মহেন্দ্র ডাক্তারকে বলছেন ঠাকুর, পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্যে আরেকটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্যে জ্ঞানকাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়।

'স্বপ্নের ফুল'-এ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করল গিরিশ।

'দেখলি কেমন মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা দিয়ে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে।'

তার মানে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হয়ে যাও। ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। পাপ পুণ্যের পার। ধর্মাধর্মের পার। শুচি-অশুচির পার।

'দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়ার পর কী থাকবে?' জিজ্ঞেস করলে শ্যাম বোস।

'নিত্যশুদ্ধ বোধরূপম।' ঠাকুর বললেন, 'তা তোমায় আমি কেমন করে বোঝাব?' গিরিশও গানে প্রতিধ্বনি করল।

'দুটো কাঁটা ফেলে দে দ্যাখ সেই সেই সেই রে।
দ্যাখ খুঁজে পেতে আর কি পাবি আমি তো কোথাও নেই রে॥'

এই তো সেই জীবন্মুক্তির ইঙ্গিত।

এই 'স্বপ্নের ফুল'-এই আবার লিখল গিরিশ :

'সাবধান সাবধান তোরে সদা বলি প্রাণ সাবধান কুটিল নয়ন।
যদি দেবীমূর্তি হয় চেও মাত্র রাঙা পায় সাহসে বদন তুলে দেখনা বদন॥'

তাই বুঝি শ্রীমার মুখের দিকে তাকায় নি গিরিশ। শুধু দুটি পায়ের উপর চোখ রেখেছে।

পুরোনো নাটক নামাল গিরিশ। পান্ডবের অজ্ঞাতবাস। কিন্তু পুলিশ সে নাটক বন্ধ করে দিল। অপরাধ? কীচকের পার্ট অশ্লীল।

অনেক তর্ক করল গিরিশ। অনেক যুক্তি দেখাল। কিন্তু পুলিশ কি যুক্তিতর্ক শোনে?

'বেকুবের একজাই' নামে যে পঞ্চরঙ লেখা ছিল তাও পুলিশ পাশ করলে না। তখন কেঁটে-ছেঁটে নতুন করে 'বড় দিনের বকশিস' নাম দিয়ে নামাল। কীচককে সভ্য-ভদ্র করলে। নিজেই গিরিশ নামল সে ভূমিকায়। পান্ডবের অজ্ঞাতবাসও চালু হল।

টাকার মুখ দেখল মিনার্ভা। কিন্তু সবই যেতে লাগল সুদের শোধে। কিছুতেই দড়ির দু-প্রান্ত একত্র করা যাচ্ছে না। নাগেন্দ্র তখন তার আট আনা

অংশ বেঁচে দিল যুবক প্রমথ দাসকে।

ধার আর ধার। উদ্ধারের পথ নেই। যারা থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম যোগান দেয় তাদেরও প্রাপ্য বাকি। কাঁহাতক চলে এমন বাকির কারবার! পাওনাদারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কি থিয়েটার চলে?

গিরিশ ক্যাশের ভার নিল। আবার এই নিয়ে নাগেন্দ্রের সঙ্গে বাধল মনান্তর। ফল কী হল? গিরিশ ছেড়ে দিল মিনার্ভা।

স্টারের নাটক লেখবার লোক নেই। এক ছিল রাজকৃষ্ণ রায়, সেও কাত হয়েছে। স্টার এবার গিরিশকে ধরলে। চলুন, ম্যানেজার না হোন, নাট্যচার্য হোন।

রাজি হল গিরিশ। আর লিখল 'কালাপাহাড়।'

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়া। প্রেমভক্তিই যে ঈশ্বর লাভের উপায় তাই নাটকের উপজীব্য। আর, ঠাকুরের সেই সর্বধর্মসমন্বয়। যত মত তত পথ।

সাধক চিন্তামণির পার্টে স্বয়ং গিরিশ। অমৃত মিত্র কালাপাহাড় আর দানী ঘোষ লাটু। আর, প্রমদাসুন্দরী চঞ্চলা।

সকলের জন্যে প্রাণ কাঁদে চিন্তামণির, সকলের পাপ-তাপ জ্বালাযন্ত্রণা নিজে টেনে নেবে বলে কেঁদে বেড়ায়। আর, শক্তির উপাসক যে বীরেশ্বর তাকেও বলছে, 'ভয় কি, তোর পাপ আমাকে দে।' তেমনি বাসনাদগ্ধা প্রতি-হিংসাব্যাকুলা চঞ্চলাকেও বলছে, 'ওরে যাস নে, যাস নে, তোর সব জ্বালা আমাকে দিয়ে যা।'

মানুষ দিনরাত ত্রিতাপে তপ্তখোলায় ভাজছে, একজন মানুষকে যদি সেই জ্বালা থেকে ত্রাণ করতে পারি তাহলে শত সহস্র জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজি আছি। এই হচ্ছে চিন্তামণির দর্শন।

এ সেই বিবেকানন্দের দর্শন। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম। আমি মোক্ষ চাই না নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে বারে আমি এই লোক-সংসারে ফিরে আসব, মানুষকে তার সত্তার এক অধ্যায় থেকে বৃহত্তর সত্তায় আরেক অধ্যায়ে নিয়ে যাব। নিয়ে যাব ঈশ্বরসত্তার দিকে। এই আমার লোকসেবা।

আমার মানবসেবাই মাধবসেবা।

কালাপাহাড়ের প্রতি চঞ্চলার অনুরাগ। কিন্তু কালাপাহাড় উদাসীন, নিস্পৃহ, নিশ্চল অথচ ইমানকে দেখে তার সঙ্কল্পের বাঁধ বুঝি ভাঙে।

ঘুরতে ঘুরতে চিন্তামণির সঙ্গে দেখা।

'কী করো?'

চিন্তামণি বললে, 'চুপ করে বসে মন ব্যাটাকে দেখি। ব্যাটা খালি ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফিরছে। কেন যে ফিরছে তা মনের কথা মনই বোঝে না। বলে সুখের জন্যে ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখ জুটিয়ে আনে।'

'তুমি জ্ঞানী।'

'তুমিও জ্ঞানী।' বললে চিন্তামণি, 'মন সুখের সন্ধানে ফেরে এই কথা

জানার নাম যদি জ্ঞান হয়, তা হলে দুনিয়ায় সবাই জ্ঞানী! কিন্তু দেখছ মনের ফাঁকি অসুখই খোঁজে, আবার অসুখের নামেই শেওরায়। অষ্টপ্রহর বলছে, ভারি অসুখ, আর পারিনে, আবার ঘুরে ফিরে সেই অসুখের কাজই করছে। এক পাগল সৃষ্টির ফেলা হাঁড়ি ভেঙে বেড়াত। হাঁড়ি ভাঙত আর বলত, আর পারিনে।'

কালাপাহাড়কে অনেক বোঝাল চিন্তামণি, কিন্তু কিছুতেই বৈরাগ্য আনতে পারল না। চঞ্চলা কৌশল করে কালাপাহাড় আর ইমানের মিলন ঘটাল। শাহজাদীর অন্তঃপুরে পুরুষ ঢুকেছে চঞ্চলা খবর পাঠাল নবাবের কাছে। কালাপাহাড় ধরা পড়ল, বন্দী হল কারাগারে। এমনি গ্রহের চক্রান্ত, চিন্তামণিও ছাড়া পেল না।

'তুমি ক দিক রাখবে বলো? একবার ঈশ্বরতত্ত্বে ঘুরছ, আবার রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালাচ্ছ। একবার পীরিত, একবার প্রতিহিংসা, একবার বাসনা, আবার বৈরাগ্য,' বললে চিন্তামণি, 'এ তো একটা মানুষে চলে না।'

'ও, তুমি? বড় বিপদে পড়েছি, যবনিকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি,' বললে কালাপাহাড়, 'কোনো রকমে ফেরাতে পারছি না।'

'ফেরাতে পারছ না, না ফেরাতে চাও না?'

'কত চেষ্টা করেছি, কোনোমতেই ভুলতে পাচ্ছিনে, কী সর্বনাশ হবে।'

'ভাবো সে তোমার শত্রু, তোমাকে ছল করে নিয়ে গিয়েছিল, কামিনী কামকলা তোমায় কামের দাস করেছে, তখন দেখ, মন কী বলে!'

'মুখখানি মনে পড়লেই অন্তর গলে যায়।'

'আচ্ছা, একটা উপায় বলি,' চিন্তামণি বললে, 'তিনদিন হরি-হরি করো, তা হলেই তাকে ভুলে যাবে।

'আমার অবিদ্যামন্ত্র তো আমাকে ছাড়ে না।'

'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলো।' বললে চিন্তামণি, 'প্রেমে রিপু জয় করো।'

ঘুরে-ফিরে সেই ঠাকুরের কথা।

'কিন্তু আর সব করো, ওঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করো না।' বললে ডাক্তার সরকার, 'এমন ভালো লোকটার মাথা খাচ্ছ সকলে।'

'তার কী আর করি বলুন।' গিরিশ বললে গম্ভীর মুখে, 'যিনি এ সংসার-সমুদ্র এ সংশয়সাগর পার করালেন তাঁকে আর কী করব বলুন।'

'কিন্তু পায়ে পড়া, পায়ের ধুলো নেওয়া কেন?'

'যার অহঙ্কার আছে, সে নেয় না।'

'অহঙ্কার? ভাবছ আমি এর পায়ের ধুলো নিতে পারি না? খুব পারি।' ডাক্তার ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল : 'এই দেখ নিচ্ছি।'

উল্লসিত হয়ে উঠল গিরিশ : 'দেবতারা স্বর্গ থেকে ধন্য-ধন্য করছেন!'

'শুধু ওঁর কেন সকলের নিচ্ছি।' ডাক্তার সমবেত সকলের পায়ের ধুলো নিতে লাগল : 'সবাই আমাকে কঠোর নির্দয় মনে করে।'

'না, না, সবাই তোমাকে ভালোবাসে।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি আসবে বলে

এরা বাসকসজ্জা করে জেগে থাকে।'

'সে কী কথা! সবাই আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে।' গিরিশ বললে অকপটে।

'কিন্তু সবাই মনে করে আমার স্নেহ-মমতা কিছু নেই। আমার স্ত্রী, আমার ছেলেও তাই ভাবে।' ডাক্তার বললে অনুশোচনার সুরে : 'আমার দোষ হচ্ছে আমি আমার ভাব চাপি, বাইরে প্রকাশ করি না।'

'কিন্তু মাঝে মাঝে মনের কপাট খোলা তো ভালো।' বললে গিরিশ, 'অন্তত আপনার বন্ধুদের প্রতি দয়া করে। নইলে তারা যে আপনাকে ভুল বুঝছে।'

'কিন্তু, কী বলব,' নরেনের দিকে তাকালো ডাক্তার : 'মাঝে মাঝে আমারও ভাব হয়। আমি একলা বসে-বসে কাঁদি।' বলেই ভাব গোপন করে ঠাকুরের দিকে শাসনের তর্জনী তুলল : 'দেখ, তোমার আর সবই ভালো, কিন্তু ভাব হলে যে লোকের গায়ে পা তুলে দাও এটা মোটেই ভালো নয়।'

'আমি কি জানতে পারি গা কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা।' নিষ্পাপ শিশুর মত বিহ্বল সারল্যে বললেন ঠাকুর।

'কিন্তু ওটা যে ভালো নয়, তা তো বুঝতে পারো।'

'আমার ভাবাবস্থায় কী হয় তা তোমায় কী করে বোঝাব! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়।' বললেন ঠাকুর, 'পরে কখনও এমন মনে হয়, এরই জন্যে বোধহয় রোগ হচ্ছে।'

ডাক্তার খুশি হয়ে উঠল। গিরিশ ও নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'দেখ ইনি মেনেছেন। কাজটা যে অন্যায় এ বোধ তাঁর আছে।'

ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নরেনকে বললেন, 'তুই তো খুব চালাক, বল না, একে বুঝিয়ে দে না।'

গিরিশ এগিয়ে এল। বললে, 'মোটেই উনি সে জন্যে দুঃখিত হন নি। এঁর দেহ শুচিশুদ্ধ পাপলেশহীন। জীবের মঙ্গলের জন্যে তিনি তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে তাঁর রোগসম্ভাবনা, এ কথাটা কখনো-কখনো তাঁর মনে হয়। তবু তৎসত্ত্বেও তাঁর কৃপাস্পর্শ বিতরণ করতে কুণ্ঠিত হন না। তার জন্যে তাঁর দুঃখ হবে?'

ডাক্তার কথা বলতে পারছে না।

'আপনার যখন শূলবেদনা হয়েছিল তখন আপনার দুঃখ হতে পারে কেন রাত জেগে অত পড়েছিলেন—' গিরিশ বললে উত্তেজিত হয়ে, 'তাই বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায়? শুনুন, রোগের জন্যে দুঃখ-কষ্ট হতে পারে, তা বলে জীবমঙ্গলের জন্যে স্পর্শ করাকে অন্যায় বলতে পারেন না।'

ডাক্তার বিনীতস্বরে বললে, 'তোমার কাছে হেরে গেলুম। দাও পায়ের ধুলো দাও।' বলে আবার গিরিশের পদধূলি নিল।

নরেন মুখ খুলল। বললে, 'আরেকটা দিক দেখুন। আপনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন—শরীরের অসুখ-বিসুখ

কিছুই গ্রাহ্য করেন না। ঈশ্বরকে জানা সব চেয়ে বড় বিজ্ঞান, গ্র্যান্ডেস্ট অফ অল সায়েন্সেস। সেই বিজ্ঞানের জন্যে শরীর যায় তো যাক—এ রকম মনোভাব তাঁর হতে পারে না?'

'যাই বলো, সকলেরই অহঙ্কার।' বললে ডাক্তার, 'সকল ধর্মাচার্যের। যীশু বুদ্ধ চৈতন্য—সমস্তের। বলে, আমি যা বললুম তাই ঠিক।'

গিরিশ তড়পে উঠল, 'এ দোষ তো আপনারও হচ্ছে।'

'আমার?'

'হ্যাঁ, তাঁদের অহঙ্কার আছে এ দোষটা যে আপনি ধরতে যাচ্ছেন এটাও অহঙ্কার। যেন আপনিই সমস্ত বুঝেছেন তাঁদের, আপনিই এক প্রকাণ্ড বোদ্ধা।'

ডাক্তার চুপ করে গেল।

নরেন শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এঁকে আমরা পূজা করি আর সে পূজা ঈশ্বরপূজার কাছাকাছি।'

ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরের বাড়িতে, কালীপূজার ঠিক আগের দিন ভক্তদের বললেন, 'কাল পুজো হবে, সব উপকরণের জোগাড় রাখিস।'

ব্যস, এই পর্যন্ত। কোথায় পুজো, কোন কালী, পুজো বাড়িতে না মন্দিরে, আর কিছুই বললেন না। কী উপচার কী ভোগ কী দক্ষিণা কিছু না।

উপকরণ আর কী, ধূপ হলেই যথেষ্ট। ভোগের জন্যে একটু না-হয় পায়েস। আর যদি বিশেষ কোনোকিছুর আদেশ করেন, তখন দেখা যাবে।

কিন্তু, পরদিন, বেলা গড়িয়ে গেল, তবু ঠাকুরের কোনো চাঞ্চল্য নেই। কী জোগাড়যন্ত্র হল তারও কোনো জিজ্ঞাসা নেই। আজ রাত্রেই যে পুজো তা বোধ হয় ভুলে গেছেন।

সাতটা বাজল।

আটটা।

শয্যায় যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে আছেন ঠাকুর। স্থির স্তব্ধ স্বগত-তন্ময়। কী আর করা! পুজোর জিনিসগুলো ঠাকুরের চারপাশে মেঝের উপর সাজিয়ে দিল ভক্তরা। সকলে বসল চারপাশে। দীপ জ্বলল, উঠল ধূপগন্ধ।

আর কী! এই কালীপূজা। আর যিনি খাটে বসে আছেন সমাধিস্থ হয়ে তিনিই কালী। তিনিই অখিলজননী।

'জয় মা।' গিরিশই প্রথমে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ঠাকুরের পাদপদ্মে ফেলল ফুল চন্দন। ঠাকুর অভয় মুদ্রা ধারণ করলেন।

জয় মা, জয় মা! আর সকলেও দিতে লাগল পুষ্পাঞ্জলি।

কালী মানেই রামকৃষ্ণ। কালীপূজা মানেই রামকৃষ্ণপূজা।

ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন তখন মা ঠাকরুন এই বলে কাঁদলেন : 'আমার কালী মা কোথা গেলে গো?'

জন্মাষ্টমীতে মা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাবেন, তাঁর দর্শন পেতে বহু লোক সমবেত হয়েছে। গিরিশ গিয়ে মাস্টার মশাইকে বললে, চলুন যোগোদ্যানে।

মাকে দেখে আসি। রাস্তায় নতুন কাপড় পাতা হয়েছে তার উপর দিয়ে মা এলেন, ধীরে পা ফেলে ফেলে। সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা, মাথায় মুখে ঘোমটা টানা। শুধু পা দুখানি দেখ।

রাঙা জবা হয়ে রাঙা পা দুখানি দেখ।

কিন্তু এ কী, কেবল ভিড় আর ভিড়, কেবল প্রণামের আকুলিব্যাকুলি।

মাঝে মাঝে গোলাপ-মা ব্যস্ত হয়ে বলছে, 'আর কত? এই পচা গরমে মাকে আর কতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে হবে। মাকে এবার ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

কে কার কথা শোনে! গিরিশও অসহায়, মাস্টারমশাইও ততোধিক। ছুটি পেতে সন্ধে ছটা।

পরে বলছেন ভাবাবেশে, 'বার বার আসা, এ থেকে কি নিস্তার নেই? যেখানেই শিব সেখানেই শক্তি—একসঙ্গে বার বার সেই শক্তি—নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না কত কষ্ট ঠাকুর করছেন তাদের জন্যে। কী তপস্যা। তপস্যার কী দরকার। শুধু লোকের জন্যে! লোকে কি পারে? তাদের তেজ কই? শক্তি কই? তাই তো ঠাকুরের সব করতে হয়। কাঁকুড়গাছির সেই গানটা মনে আছে?'

আশু জিজ্ঞেস করলে, 'কোন গানটা মা?'

'সেই যে—এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙলের তরে। মা বলে ডাকলে কি না এসে থাকতে পারে।'

'কিন্তু মা, তোমার তো কত কষ্ট—নিজের কষ্টের কথা তো কিছু বলছ না।'

'দূর বোকা ছেলে! সব ঠাকুর—আমি যে তাঁর দাসী। যেমনি করান তেমনি করি। আমার আবার কষ্ট কী!'

'তাই বুঝি যে আসে মন্ত্র নিতে তাকেই দিয়ে দাও মন্ত্র।'

'কত শোকতাপ পেয়ে কত জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জীব ছুটে আসছে।' বললেন সারদামণি, 'ঠাকুর ছাড়া কে তাদের জ্বালা ঘোচাবে? তিনিই তো সকলের ব্যথার ব্যথী। জীবের জ্বালা যে তাঁরও জ্বালা।'

॥ উনিশ ॥

'ওরে ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী?' 'জনা' নাটকে কৃষ্ণের উদ্দেশে গাওয়া গানের এই কলিটা যেমন লোকের মুখে মুখে, তেমনি আবার পারস্যপ্রসূণ নাটকের এই কলিটা : 'ছেড় না দিন পেয়েছ আমোদ করে নাও ভবে।' তেমনি 'মায়াবসান' নাটকের একটা ছত্র খুব চালু হল : 'জ্ঞানেও মানবদুঃখে অবসান নেই এক কণা'।

গিরিশের থিয়েটার স্টারই প্রচার করে বেড়াল গিরিশের মাথা খারাপ

হয়েছে। মাথা খারাপ না হলে কেউ 'মায়াবসান' লেখে, 'কালাপাহাড়' লেখে?

যা গিরিশের পরিপক্ক মনীষার ফল তাই কিনা পাগলামি। ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হওয়ার কথা আর কে লিখবে?

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জানুক অমুক এখন ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে। পাগল নয় কে? কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের জন্যে কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েকজন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল!'

স্টার সম্পর্কে গিরিশেরও মায়াবসান হল।

কলকাতায় তখন প্লেগ লেগেছে, শহর থেকে লোক পালাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখে। রাজসাহীর জমিদার ললিত মৈত্র গিরিশকে ডাক দিলেন। দলবল নিয়ে আমার এখানে এসে থিয়েটার করুন। বোনাস তিন হাজার টাকা।

গিরিশ রাজী হল। সব নট নটী নিয়ে গেল রাজসাহী। থিয়েটারের নাম হল মার্ভেল থিয়েটার।

এদিকে দর্জিপাড়ার সংকীর্তনের দল গিরিশকে দিয়ে প্লেগের গান বেঁধে নিল। পথে পথে চলল তার উচ্ছ্বাস-উল্লাস :

'কলিকাতা আনন্দধাম
প্লেগ বন্ধু হয়ে এসেছে হে
ছড়াছড়ি হরিনাম।
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথলে ওঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য করে গর্জে শত খোল,
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝাসম অবিরাম॥

*　　　*　　　*

প্লেগ, থাকবি যদি থাক,
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক।
হরিনাম প্রাণ ভরে শোন এই কথাটি রাখ,
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন
কিনবে হরি গুণধাম॥'

মার্ভেল থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল প্লে হল। সদর মফস্বল ভেঙে পড়ল। কৃষ্ণদর্শনের ফল কী? আহা, কী সুন্দর বলেছে, কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন। চল মাখনচোরা কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে আসি। লোকে লোকাকীর্ণ হতে লাগল।

কিন্তু কত দিন?

অভিনয় আরম্ভ হবার আগে গিরিশ একটা কবিতা পড়েছিল :

'দুর্দান্ত দুর্দিনোদয়　　　আসিয়াছি পেয়ে ভয়
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম।
এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়　　　তব দৃশ্যযোগ্য নয়
ত্যজি দোষ গুণ ধরো ওহে গুণধাম॥

কর যদি তিরস্কার মানি লব পুরস্কার
বহুমানে শির পাতি করিব গ্রহণ।
সবিনয়ে নিবেদন জানায় হে আকিঞ্চন
বহু আগে আসিয়াছি করো না বঞ্চন॥'

কদিন পরেই মার্ভেল বন্ধ হয়ে গেল। থিয়েটারে একটানা মত্ত হয়ে থাকবার মত মফস্বল শহরে অত ফালতু লোক কোথায়? কলকাতায় প্লেগ তখন অনেকটা শায়েস্তা হয়েছে, তাই গিরিশ ফিরে এল কলকাতায়।

অমর দত্ত বললে, 'আমার ক্লাসিকে আসুন।'

এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ক্লাসিক প্রতিষ্ঠা করেছে অমর। হ্যাঁ, আসুন, নাট্যাচার্য হয়েই আসুন।

এমন কি, একটা পত্রিকা বার করব, আপনি তার সম্পাদক হোন।

গিরিশ যোগ দিল ক্লাসিকে। তার গীতিনাট্য 'দেলদার' অভিনীত হল। আর তারই সম্পাদনায় বেরুল মাসিক পত্র, সৌরভ। গিরিশের কত প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হল সেই কাগজে, এমন কি একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস। উপন্যাসের নাম 'ঝালোয়ার দুহিতা'।

তার পরে ক্লাসিকে সুরু হল 'পান্ডব গৌরব'।

গিরিশের ইচ্ছে ছেলে দানী ভীম সাজে আর অমর দত্ত শ্রীকৃষ্ণ।

না, না, আমি ভীম সাজব। অমর বায়না ধরল।

'সে কী', গিরিশ আপত্তি করল, 'তুমি শ্রীকৃষ্ণ হবে বলে তোমার পার্টটা কত লম্বা করেছি। না, না, তোমাতেই শ্রীকৃষ্ণ বেশি খুলবে।'

'না, পান্ডবগৌরবে হিরো হচ্ছে ভীম।' দৃঢ়স্বরে বললে অমর, 'আমি হিরো সাজব।'

যেহেতু অমরই ক্লাসিকের মালিক সেইহেতু তার কথাই বলবৎ হবে। এমনি একটা ভাব ফুটে উঠল তার কথায়। গিরিশ ম্লান হয়ে গেল।

'বেশ, আমরা দুজনেই ভীমের পার্ট করি।' দুঃসাহসিক প্রস্তাব করল অমর, 'আপনি বিচার করে দেখুন, কার বলাটা ভালো হয়। যারটা বেশি ভালো হবে সেই ভীম সাজবে।'

অমর আর দানী দুজনেই ভীমের পার্ট বলল। সন্দেহ কী অমরের বলাটাই বেশি ভালো। গিরিশ সহাস্যে বলল, 'তুমিই ভীমতর।'

পান্ডব গৌরবে অমর দত্তই ভীম সাজল।

'অতি ছল অতি খল অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব?
সম তব মান অপমান,
নহিলে ক্ষত্রিয় হয়ে, কহ কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে
পরাজয়ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ।

নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা কয়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙা পায়,
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ
কৃষ্ণনাম আর কভু না আনিব মুখে।

কঞ্চুকী গিরিশ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রমদা। দানীর কোনো পার্ট নেই।

কৃষ্ণ বলছে কঞ্চুকীকে, 'তুই আমার সঙ্গে মিতে পাতাবি?'

'সত্যিকার মিতে, না দমবাজীর মিতে?' কঞ্চুকী প্রশ্ন করল।

'দ্যাখ মিতে, যে দমবাজী করে তার সঙ্গে দমবাজী করি।' বললে কৃষ্ণ, 'আর যে সত্যি মিতে হয়, যে দমবাজী জানে না, তার আমি সত্যি মিতে হই।'

'মায়ার সংসারে ধর্মমাত্র ধ্রুবতারা—' এই হল পাণ্ডব গৌরবের মূলকথা। সেই ধর্মের আবার সার কথা, আশ্রিতপালন। 'রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।' বলছে অর্জুন। 'রাজধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম—আশ্রিতরক্ষণ।' বলছে ভীম।

তারপরে কৃষ্ণসঙ্গিনীদের গান। 'ধীর মাধুরী গীত-লহরী মৃদুল রোল কানন ভরি। ধীর গহনে মঞ্জীর ধ্বনি, উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনী। হেলিছে দুলিছে চলিছে শ্যাম, ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম।'

সব মিলিয়ে একটা বিপুল হৈ-চৈ পড়ে গেল। কবি নবীন সেন লিখলেন : 'অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীদের গান শুনে আমি আর আমার স্ত্রী শুদ্ধ কেঁদেছি। আমরা গিরিশের গোলাম হয়ে রইলাম।'

আগে-আগে ক্লাসিক একদম জমে নি। স্টার ফেলে কে আসবে ক্লাসিকে? কিন্তু দর্শক না জুটলে থিয়েটার চলে কী করে? শেষকালে তো রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে ঘর ভর্তি করা হত। যদি এরা বাইরে গিয়ে প্রশংসা করে আর সে প্রশংসায় যদি খদ্দের আকৃষ্ট হয়। তবে যদি দিন ফেরে।

দিন ফিরতে শুরু করল ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবায়। তার পর পাণ্ডব-গৌরবে একেবারে জয়জয়কার। পাণ্ডবগৌরব নয় তো গিরিশগৌরব।

গিরিশ মুখে বলে আর অবিনাশ গাঙ্গুলি লেখে। রাত জাগতে গিরিশ ওস্তাদ কিন্তু বেচারা অবিনাশের চোখে ঢুল আসে।

'ঘুম পাচ্ছে বুঝি? তুমি দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ।' গিরিশ বুঝি বিরক্ত হয় : 'আচ্ছা, আজ তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত লেখ।'

'তৃতীয় অঙ্ক!'

'হ্যাঁ, কত আর রাত হবে? লেখ! বরং এক কাপ চা খেয়ে নাও।'

গিরিশের জিহ্বাগ্রে যেন সরস্বতী, তর তর করে বলতে থাকে। পাল্লা দিয়ে কলম চালানো দুঃসাধ্য।

পরের রাত্রে চতুর্থ অঙ্ক শুরু। এক কাপ দু কাপ তিন কাপ চা খেল অবিনাশ। চতুর্থ অঙ্ক যখন শেষ হল, ঘড়িতে রাত আড়াইটে।

'আজ এই পর্যন্ত থাক।' গিরিশ গুটিয়ে নিতে চাইল: 'যাও তুমি শোওগে।'

'আমার ঘুম ছুটে গিয়েছে। আপনি যদি ক্লান্ত না হন, চালিয়ে যান—'

'আমি ক্লান্ত?' গিরিশ হাসল: 'বেশ লেখ। আমার সব সাজানো আছে। তুমি পারলেই হল। তুমি না ঢলে পড়।'

চলল পঞ্চমাঙ্ক।

লেখ, প্রথম গর্ভাঙ্ক বনপথ, দণ্ডী ও সুভদ্রা।

দণ্ডী। বৃথা মা করুণাময়ি কর গো ভর্ৎসনা।
জাননা যন্ত্রণা
হৃদিমাঝে জ্বলে তুষানল
প্রতিদানহীন প্রেমাগুন।
ধুমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক আমার
হিতাহিত নাহিক বিচার,
মরি মাতা, পিশাচীর প্রেমের তৃষায়।

সুভদ্রা। ধরায় না ফোটে কভু স্বর্গের কুসুম।
উর্বশী জননী, ইন্দ্রসোহাগিনী
কর তুমি প্রেমের গরিমা?
ধরায় বাঁধিতে চাও ত্রিদিবরঞ্জিনী?
জেন বৎস, প্রেম নয় স্বার্থপর
আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ
মোহ মাত্র প্রেমের এ ভানে!

'হয়ে গেল।' তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল গিরিশ: 'দু রাত্রেই পাণ্ডবগৌরব শেষ। এখন শুধু গানগুলো বেঁধে ফেলতে হবে। গানের জন্যে কাল এস। দাঁড়াও, সর্বশেষ গানটা এসে গিয়েছে। লেখ।'

অবিনাশ আবার কলম ধরল।

'হের হরমনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে।' গিরিশ নিজেই গেয়ে উঠল: 'আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে তো দ্যাখ না চেয়ে॥'

হঠাৎ নিজেই অস্থির হয়ে উঠল গিরিশ। বলল, 'ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে। দোর জানলাগুলো খুলে দাও।'

দোর জানলা খুলে দিতেই চড়া রোদ ঘরে ঢুকে পড়ল। এ কী ব্যাপার! আর ব্যাপার! দু জনে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বেলা আটটা।

'যাও, যাও, পালাও।' প্রবল তাড়া দিল গিরিশ: 'বাড়ি গিয়ে স্নানাহার

করে লম্বা ঘুম দাও। সমস্ত দিন ঘুমিয়ে ঝরঝরে হয়ে সন্ধেয় আবার এস।'

ক্লাসিক যখন উন্নতির তুঙ্গে এসে উঠেছে, তখন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধল। গিরিশ অমর দত্তকে বললে, 'আমার জন্যই ক্লাসিকের আজ এত রবরবা। আমাকে লাভের অংশ দাও।'

অমর দত্ত স্তম্ভিত হবার ভাব করল। বললে, 'আপনার জন্যেই সমস্ত, এ কে বললে? আমার—আমাদের অভিনয়ের গুণ নেই? তা ছাড়া ব্যবসায় আজ না হয় দু পয়সা হচ্ছে কিন্তু দুর্দিন আসতে কতক্ষণ? তখন কে সামলাবে? মাপ করবেন, লাভের অংশ-টংশ দিতে পারব না।'

গিরিশ ক্লাসিক ছেড়ে দিল। শ্রীপুরের নরেন্দ্র সরকার আদালতের নিলামে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিয়েছে। সে গিরিশকে লুফে নিল।

এই কথা? অমর দত্ত ছুটে গিয়ে হাইকোর্টে মামলা ঠুকল। ইনজাংশানের প্রার্থনা করল। যাতে গিরিশ না মিনার্ভায় যোগ দিতে পারে।

অমরের পক্ষে ব্যারিস্টার জ্যাকসন আর ডবলিউ সি বনার্জি আর গিরিশের পক্ষে ইভান্স আর গার্থ। অমর দত্ত হেরে গেল। পেল না ইনজাংশন।

মামলা করা কি ভদ্রলোককে পোষায়? সুস্থ মনে একটা নতুন নাটক লিখতে পারল না গিরিশ। বঙ্কিমের সীতারামকে নাটকায়িত করল। হ্যাঁ, নিজেই নামব নামভূমিকায়।

দেখাদেখি ক্লাসিকেও 'সীতারাম' চালাল। সীতারাম অমর দত্ত। দেখি কে হারে কে জেতে। গিরিশ না অমর?

দু জনেই মহাদেব।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তাদের গিয়ে ধরল অনেকে। এখন তো সর্বত্রই সীতারাম। আপনারাও নামান না ঐ বইটা।

'বা, আমরা তো নামিয়েছিলাম।' বললে বেঙ্গল 'তবে আমরা যে নতুনত্ব দেখিয়েছিলাম তা গিরিশ বা অমর কেউই দেখাতে পারে নি।'

'নতুনত্ব!'

'হ্যাঁ, আমরা মৃন্ময়ের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'সে কি মশাই? জয়ন্তী যে সন্ন্যাসিনী। তার বিয়ে কী?'

'বঙ্কিমবাবু তাই লিখেছেন বটে। জয়ন্তীকে সন্ন্যাসিনীই রেখে দিয়েছেন বইয়ে কিন্তু আমরা অন্য রকম ভাবলাম।'

'অন্য রকম?'

'হ্যাঁ, আমরা ভাবলাম,' বেঙ্গল বিজ্ঞ সমজদারের মত বললে, 'একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে চিরকালটাই কি গেরুয়া পরে চিমটে কাঁধে করে বেড়াবে? তাই তার একটা গতি করে দিলাম। মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটায় ছুঁড়িটার বিয়ে দেওয়াতে দর্শকেরা খুশি হল আর ছুঁড়িটাও একটা আশ্রয় পেয়ে হাঁপ ছাড়ল। কি, ঠিক করিনি?'

গিরিশের বিরুদ্ধে নানারকম অশালীন বিজ্ঞাপন দিতে লাগল ক্লাসিক। 'ক্লাসিকের সীতারাম স্থবির নয়, ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা।'

একটা ব্যঙ্গ চিত্র বার করল। দাঁড়িপাল্লার একদিকে গিরিশ আরেক দিকে অমর দত্ত। অমরের দিকটা ভারি আর গিরিশের দিকটা হাল্কা।

গিরিশ আর নরেন সরকারকে লক্ষ্য করে অমর দত্ত একটা ব্যঙ্গ নাটক পর্যন্ত নামাল, নাম 'থিয়েটার'।

তা নামাক। নিন্দুকের সিন্দুকভরা নিন্দেতেও গিরিশ বিচলিত নয়। 'হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুখে হাজার। সাধুনকে দুর্ভাব নহি, মত্ত নিন্দে সংসার॥' হাতি যখন রাস্তা দিয়ে চলে যায়, পেছনে হাজার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাতি ফিরেও তাকায় না। তেমনটি সংসার যতই নিন্দে করুক, সাধুর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই।

মিনার্ভায় প্রফুল্ল হচ্ছে, গিরিশ যোগেশ সেজেছে, ব্যান্ড মাস্টার নন্তিবাবু বললেন, 'একটা গীতিনাট্য না হলে চলছে না। নতুন দেখে দিন না একখানা লিখে।'

গিরিশ বললে, 'দেব।'

'দেবেন?' ব্যান্ড মাস্টার খুশি হয়ে উঠলেন : 'কবে নাগাদ?'

তীক্ষ্ম চোখে তাকাল গিরিশ, 'আজই।'

'আজই?'

'হ্যাঁ, এখুনিই। প্লে করতে-করতে।' গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'দেব-গুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী। কাগজ-কলম নিয়ে কেউ বসে যাও এখুনি। মঞ্চে আমার যোগেশের পার্ট যা করবার তা করব, আর প্রস্থানের পর বাইরে এসে মুখে-মুখে বলে যাব আমার নতুন নাটক। লেখক, তৈরি থাকো। ঠাকুরের কৃপায় নাটক ঠিক লেখা হয়ে যাবে।'

কাগজ-কলম নিয়ে একজন বসে গেল তড়িঘড়ি।

গায়ে যোগেশের সাজ, গিরিশ একবার মঞ্চে নেমে যথারীতি অভিনয় করছে আর পার্ট হয়ে গেলে বেরিয়ে এসেই মুখে-মুখে বলে যাচ্ছে নতুন নাটকের সংলাপ। আবার ডাক পড়তেই ঢুকছে স্টেজে, আবার যা বলবার শেষ করেই চালাচ্ছে শ্রুতলিপি। এমনি অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মুখে নতুন গীতিনাট্য 'মনিহরণ' লেখা হয়ে গেল।

'কী, গান বেঁধে দিতে হবে না?' গিরিশ তাকাল নন্তিবাবুর দিকে।

অভিনয়ের পর স্টেজে বসে গিরিশ পরের-পর আটাশখানা গান বেঁধে দিল।

'যদি বলো তো এর পর আরো একখানা নকসা লিখে দিতে পারি।'

সেই রাত্রে অমনি স্টেজে বসেই গিরিশ 'চ্যারিটেবেল ডিসপেনসারি' নামে লিখে দিল পঞ্চরঙ্গ।

কিন্তু এখানেও আবার মালিক নরেন সরকারের সঙ্গে বনল না গিরিশের। নরেন সরকারের ইচ্ছে গিরিশ এন্তার নাটক লিখবে আর সে একধার থেকে তার পরিচালনায় হিরো সাজবে। গিরিশ বললে, 'অপেক্ষা করো। ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমার মিনার্ভা আগে দাঁড়াক, পরে তোমাকে তৈরি করে দেব।'

নরেন সরকার অপেক্ষা করতে রাজী হল না। গিরিশের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা সরাসরি বাতিল করে দিল।

অমর দত্তের এক মুহূর্তও দেরি হল না। গিরিশের কাছে এসে সে মাপ চাইল। বললে, 'ফিরে চলুন ক্লাসিকে।'

মনোমালিন্য তখুনি মুছে ফেলল গিরিশ। বললে, 'চলো।'

নরেন সরকার এল ফের সাধাসাধি করতে। গিরিশ তাকে ফিরিয়ে দিল। বললে, 'না, তোমাকে আর হিরো সাজানো গেল না।'

গিরিশের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, সূতিকায় ভুগছে।

বললে, 'বাবা, তুমি যদি তারকেশ্বরে গিয়ে আমার জন্যে চরণামৃত নিয়ে আসতে পারো, আমি তবে ভালো হব।'

গিরিশ তখুনি চলল তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরে মোহান্তের গদিতে পুজোর টাকা জমা দিচ্ছে, কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মশাইকে কি আগে কোথাও দেখেছি?'

'কেন দেখবেন না? থিয়েটারে যান?'

'তা যাই বই কি।'

'আমিই থিয়েটারের নোটো গিরিশ ঘোষ।'

'ওরে এই সেই—'

'হ্যাঁ, আমি সেই মাতাল গিরিশ ঘোষ।'

একদিন অভিনয় করছে, একটু বোধহয় বেশি টেনেছে সেদিন, দর্শকদের ভেতর থেকে কারা চেঁচিয়ে উঠল : 'মাতাল হয়েছে রে—মাতাল।'

গিরিশ হঠাৎ অভিনয়ের বাইরে এসে দর্শকদের লক্ষ্য করে বললে, 'আমি যখন মদ খাই তখন আমি মাতাল। তোরা যখন মদ খাস তখন তোরাও মাতাল। কিন্তু আমি যখন মদ খাই না তখন আমি গিরিশ ঘোষ। তোরা যখন মদ খাস না তখন তোরা কী রে?'

॥ কুড়ি ॥

'কী চাই?' আগন্তুক দেখে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'আমি শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষ।' বললে আগন্তুক, 'লোকে বলে দানা-কালী।'

'তা তো হল, কিন্তু এখানে চাই কী?'

আরো একটু বিশদ হতে চাইল কালীপদ। বললে, 'আমি গিরিশের বন্ধু।'

'সে তো ভালো কথা, কিন্তু কেন এসেছ, কি চাই তাই বলো না।'

'এখানে মদ আছে?'

'মদ?'

'হ্যাঁ, গিরিশ বলে দিল এখানে নাকি মদ আছে।' কালীপদ বললে অন্তরঙ্গের মত : 'একটু দিতে পারেন আমাকে?'

ঠাকুর হাসলেন : 'তা হয়তো পারি। কিন্তু এখানকার মদ বড় কড়া, তুমি সইতে পারবে না।'

'কী, বিলিতি মদ?' উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কালীপদ।

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণবারি।' ঠাকুর প্রসন্ন মুখে বললেন, 'এ মদের কাছে তোমার বিলিতি মদ দাঁড়াতে পারে না। একটু খেয়ে দেখবে?'

হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল কালীপদ।

'কী, দেখ না খেয়ে। এই মদ খেলে নেশা আর ছুটতে চাইবে না কিছুতেই। বিলিতি মদও আর ভালো লাগবে না।'

তখন যেন কালীপদ বুঝতে পারল গিরিশ তাকে কী অর্থে ধোঁকা দিয়েছে। সে অশ্রুতে উথলে উঠল। বললে, 'দিন, আপনারই মদ দিন। এমন মদ দিন যেন নেশা না কাটে। সারাজীবন থাকতে পারি বুঁদ হয়ে।'

ঠাকুর অস্ফটে বললেন, 'বারো বচ্ছর বউটাকে ভুগিয়ে তারপর এলে।'

বউ?

হ্যাঁ, জন ডিকিনসনের বড় বাবু কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। বারো বচ্ছর আগে এখানে এসেছিল। এসে বললে, আমার স্বামীর মন ফিরিয়ে দিন।

কেন, স্বামীর কী হয়েছে?

মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল। সংসারে পয়সাকড়ি দিতে চায় না, সব মদে আর অনুষঙ্গে উড়িয়ে দেয়। এর একটা কিছু বিহিত না করলেই নয়।

আমি তাকে নবতখানায় পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে যিনি মহামায়া আছেন তিনি তাকে একটি পুজো করা বেলপাতা দিলেন। বললেন, নিজের কাছে রেখে দিও। আর নাম কোরো প্রাণ ভরে।

সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে। তারপর তুই আজ হাজির হলি দক্ষিণেশ্বরে। স্ত্রীর সাধনায় স্বামীর উদ্ধার হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপদকে স্পর্শ করলেন। আর অসুরের মত বিরাট অয়স্কান্ত চেহারা—নরেন যার নাম রেখেছে দানাকালী—সে শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

বাড়িতে এসেও মন শান্ত হয় না। গিরিশের উদ্দেশে মনে মনে বলে, এ তুই আমাকে কী মদের সন্ধান দিলি?

আরো আশ্চর্য, মনে পড়ল, তাঁকে প্রণাম করে আসেনি।

অস্থির হয়ে আবার চলল দক্ষিণেশ্বর। সমস্ত দেহ-মন লুটিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

কালীপদকে দেখে ঠাকুর খুব খুশি : 'এই যে তুমি এসেছ। আমার কলকাতা যাবার ভারি ইচ্ছে—'

'বেশ তো, চলুন না আমার নৌকোয়।'

নৌকো ঘাটে বাঁধা, ঠাকুরকে নিয়ে কালীপদ উঠল। সঙ্গে আরো অনেক ভক্ত। কলকাতায় কোথায় কী দরকার কে জানে।

মাঝনদীতে হঠাৎ কালীপদকে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'

কালীপদ দিব্যি জিব বের করে ধরল।

আঙুলের ডগা দিয়ে ঠাকুর তাতে কী লিখলেন।

এইবার লাগল বুঝি নেশা। সর্বনাশের নেশা। দানাকালী এবার বুঝি কালীতে দানা বাঁধল।

ঘাটে নৌকো এসে লাগতে কালীপদ বললে, 'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আবার যাব?' ঠাকুর কণ্ঠস্বরে স্নেহসুধা ঝরিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি কোথায় নিয়ে যাবে।'

'আমার বাড়ি যাবেন?'

'নইলে আর কোথায়!'

কালীপদর উল্লাস তখন দেখে কে। একেই বুঝি বলে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য!

গিরিশ মাধাই আর কালীপদ জগাই। গলায়-গলায় ভাব, গ্লাসে-গ্লাসে। দুজনেই উদ্ধার পেয়ে গেল। ওরা যদি উদ্ধার না পায় তা হলে ঠাকুর যে পতিতপাবন অনাথশরণ তা প্রমাণ হয় কী করে?

কালীপদ বিনোদিনীর বাবু হয়েছে। আর কালীপদর কাছে বিনোদিনীর শুধু এক অনুরোধ : আমাকে একটিবার ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলুন।

'তোমাকে ঢুকতে দেবে না।' কালীপদ আপত্তি করল : 'তুমি একে স্ত্রীলোক, তায় নটী। ঠাকুরের ভক্তদের দরবারে তোমার স্থান নেই।'

'না, আমাকে নিয়ে চলুন। শুনেছি ঠাকুরের খুব অসুখ। শুনে অবধি তাঁকে দেখবার জন্যে মন ভীষণ ব্যাকুল হয়েছে।' বিনোদিনী কান্নায় ভেঙে পড়ল : 'তাঁকে না দেখে থাকতে পারছি না। যেমন করে হোক নিয়ে চলুন আমাকে।'

দানাকালীর মন গলল। সত্যি এত ভক্তি আর কোথায় দেখেছি, এত ব্যাকুলতা!

মাথায় বুদ্ধি খেলল। বিনোদিনীকে সাহেব সাজালে। প্যান্টে-কোটে হ্যাটে-বুটে বিনোদিনীকে কে বলবে স্ত্রীলোক। একেবারে ফিটফাট নিখুঁত সাহেব।

দুজনের সাহসকেও বলিহারি।

দরজায় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দাঁড়িয়ে। অবান্তর লোক না ঢুকতে পারে তারই জন্যে রয়েছে পাহারায়।

'এই আমার অফিসের এক ইংরেজ বন্ধু।' দানাকালী দিব্যি বললে নিরঞ্জনানন্দকে, 'ছোকরা ঠাকুরের খুব ভক্ত। অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। চোখের দেখা দেখেই চলে যাবে।'

সাহেব শুনে একটু বা অভিভূত হল নিরঞ্জনানন্দ। সসম্ভ্রমে তাকাল হ্যাট-কোটের দিকে। দেখে সন্দেহ করবার জো নেই। এমনি অনবদ্য অভিনয় বিনোদিনীর। এমনি রূপসজ্জা।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি উঠে গেল ছোকরা ইংরেজ। ঘরে ঢুকে রোগক্লিষ্ট ঠাকুরকে দেখে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাথার হ্যাট ফেলে দিয়ে ঠাকুরের পায়ে চুল লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করল। বললে, 'আমি সেই চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বালকের মত আনন্দিত ঠাকুর। দানাকালীকে বললে, 'খুব সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছ তো। একেবারে হ্যাটকোট পরিয়ে।'

'নইলে আনা যায় না যে।'

'হ্যাঁ, ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক, পেঁছে যাওয়া।' ঠাকুর আবার হাসতে লাগলেন : 'কিন্তু খুব তুমি বাহাদুর কালীপদ। মেয়েছেলেকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছ। কেউ ধরতে পারলে না, রুখতে পারলে না।' বিনোদিনীর দিকে তাকালেন : 'আমার সেদিনের সেই আশীর্বাদ ফলেছে, মা। তোমার চৈতন্য হয়েছে। যার চৈতন্য হয়েছে তাকে কে প্রতিরোধ করে!'

ভক্তরা খবর পেল দানাকালী সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে। মেয়েমানুষকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। তারা সব আস্তিন গুটোলো। দানাকালীকে দেখে নেব। হোক সে ঠাকুরের আশ্রিত, গিরিশের বন্ধু, এই অনাচার বরদাস্ত করব না।

কিন্তু তারা ঠাকুরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। সাহ্লাদ নয়নে বালকের মতন হাসছেন ঠাকুর। সাহেব সেজে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে এসেছে। জানতে-অজানতে-ভ্রান্তে—চলে এলেই হল। আর অন্তরে যদি সত্যি ব্যাকুলতা জাগে কে রোধ করে ভক্তির নির্ঝরিণীকে।

ভক্তের দল ফিরে গেল হেঁট মুখে।

কালীপদের বুকেও ঠাকুর একদিন হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'চৈতন্য হও।'

এমনি ধারা আশীর্বাদই তো বিনোদিনীকে করেছিলেন : 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'

চিবুক ধরে আদর করলেন কালীপদকে। বললেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক করেছে তার এখানে আসতেই হবে।'

ঠাকুর অপ্রকট হবার পর দুই বন্ধু, গিরিশ আর কালীপদ, কালীপদর বাড়িতে, ঠাকুরের ছবি সামনে রেখে, পাশাপাশি বসেছে স্থির হয়ে। দু'জনের মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। আর দু'জনের মুখে উচ্চারিত এক মন্ত্র, এক প্রার্থনা : 'ঠাকুর, দেখা দাও। দেখা দাও।'

কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রিক্ত গাত্রে নাচছে দু' বন্ধু। চারদিকে খোলের চাঁটি, করতালের ঘা, আর দুই বন্ধুর মুখে এক বুলি, এক ধ্বনি : 'রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ!'

নতুন যুগের জগাই-মাধাই। লম্পট ছিল, দু'জনেই এখন পরম ভাগবতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সেই কালীপদকে গিরিশ তার 'শঙ্করাচার্য' নাটক উৎসর্গ করল। লিখল :

'ভাই, আমরা উভয়ে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার শঙ্কারাচার্য দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমাকে উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ করো।'

শঙ্করাচার্যে অষ্ট সখী বেষ্টিতা মহামায়া গান গাইছে :

'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে গাল বাজালে হয় খুশি।
মান-অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম ভোলা' বলে কেন, নাও না নেচে যা খুশি।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁস-ই॥'

অহেতুকী কৃপার আধার, কল্পতরু গুরু সম্পর্কে বলছে মণ্ডন মিশ্র : 'হ্যাঁ, কুহকী বটেন, যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ সেই কুহকী, আর সামান্য কী বলছেন? সামান্য হতেও সামান্য—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারেও উনি প্রার্থী হন?'

এ গিরিশেরই নিজের জীবনের কথা।

'যার গুরু আছে তার উপর পাপেরও কোনো প্রভুত্ব নেই।' বলছে গিরিশ, 'তার সাধন-ভজনের দরকার কী?'

'গুরুদেব, আমায় একটু বুদ্ধি দিন।' 'শঙ্করাচার্যে' শান্তিপ্রদ তার গুরু শঙ্করকে বলছে, 'এমন বুদ্ধি দিন যাতে আমি বুঝতে পারি।'

শঙ্কর বললে, 'বৎস, সাধন প্রয়োজন, সাধন করো, সমস্ত বুঝবে।'

'যা করতে হয় আপনি করুন।' বললে শান্তিপ্রদ, 'সাধন করে তো মন বশ করতে বলেন? সে আমার কর্ম নয়। আমি চোখ বুঁজে মন স্থির করতে বসলেই— মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভালো, চোখ বুঁজলেই অমনি সৃষ্টি-সংসার ঘুরতে চলল। অমন মন নিয়ে কী সাধন করব বলুন। আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমারও বেশ মিষ্টি লাগে—ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা—এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলাম—এখন যা করবার আপনি করবেন।'

শঙ্কর বললে, 'বৎস, সারতত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনার ফলে এ ধারণা জন্মে, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।'

গর্বে পর্বতায়মান হয়ে গিরিশ একদিন বলত, 'মানুষকে ঈশ্বরবুদ্ধি কেমন করে করব?' আজকের গিরিশ শঙ্কারাচার্যে বলছে 'মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর নিজ মায়ায় নরদেহ ধরে গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন।'

'ভগবান—ভগবান আমার মাথায় থাকুন।' 'কালাপাহাড়ে' লেটো তার গুরু চিন্তামণিকে বলছে, 'ভগবান মানুষের মত মানুষ হয়, তাহ'লে বুঝি যে ভগবান প্রেমময় বটেন।'

'আহা, লেটো, সে মানুষ হয়ে এসে রে, মানুষ হয়ে এসে।' বললেন চিন্তামণি।

'তা আর বুঝিনে বাবাজী? এই তো মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। নইলে লেটোকে কেউ খোঁজে, লেটোর জন্যে কাঁদে—'

শঙ্করাচার্যকে মোহাচ্ছন্ন করতে উগ্র ভৈরব অবিদ্যাসঙ্গিনীদের পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা নাচছে আর গাইছে :

'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে বইছে মলয় বায়।
সোহাগে গাইছে পাখি, চকোর উধাও ধায়।
অবশে এলোকেশে অরুণ আঁখি চায় আবেশে
কাঁচলি পড়ে খসে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য জলে, তরঙ্গে রঙে চলে
হিল্লোলে কমল দোলে, উথলে মধু যায়॥

ঠাকুর গিরিশকে বললেন, 'আমার যে অবস্থা সে শুধু নজিরের জন্যে। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। সত্যি বলছি, আমার ঈশ্বর বই কিছু ভালো লাগে না। তোমরা অনাসক্ত হয়ে সংসার করো। কলঙ্কসাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়।'

'আপনারও তো বিয়ে আছে।' গিরিশ বললে পরিহাসের সুরে।

'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে? গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে-খুলে পড়ে যায়—সামলাতে পারি নি। তবে জানবে কামিনীকাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

'কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?' কাতর স্বরে প্রশ্ন করল গিরিশ।

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্য প্রার্থনা করো।'

'বিবেক?'

'ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়, ময়লা এক দিকে ভালো জল আরেক দিকে পড়ে। তেমনি বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। অবিদ্যাকে বাদ দিয়ে তোমরা বিদ্যার সংসার করো।'

'বিদ্যার সংসার?'

'তাকে জেনে সংসার করো। তবেই সংসার বিদ্যার সংসার। দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখন দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা, এরা গেছে। আমাদের হারুকে চিনতে তো? এমন সুন্দর ছেলে তাকে এখন পেতনীতে পেয়েছে।'

'পেতনীতে পেয়েছে?'

'আর বোলো না। ওরে কোথা গেল, হারু কোথা গেল? সবাই গিয়ে দেখে, হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই, তেজ নেই, সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে। স্ত্রী যদি বলে, যাও তো একবার,

অমনি উঠে দাঁড়ায়। যদি বলে, বোসো তো অমনি বসে পড়ে। এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও সব কিছু ভালো লাগে না। মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।'

'শঙ্করাচার্যে' অবিদ্যাসহচরীরা গাইছে :

'হেসে হেসে কাছে বসে মনমোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে সেই রসে তারে ভোলাই।
কারো প্রেমিকা নারী কারো করে দিই তরবারি—
মনের জ্ঞানে কেউ জটাধারী।
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে আশা ধরে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝতে পারে, ধরতে সোনা ধরে ছাই॥'

'অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে।' বললেন ঠাকুর, 'সে আত্মহত্যাই করুক আর যাই করুক। আর বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহ-ধর্মিণী। সেই ঠিক ভগবানের দিকে নিয়ে যায়।'

'অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান তবে তিনি অবিদ্যা করছেন কেন?' ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞেস করলে।

'আহা, তাঁর লীলা। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না।' বললেন ঠাকুর, 'মন্দ জ্ঞান থাকলেই তবে ভালো জ্ঞান হয়। আমের খোসাটা আছে বলেই আম বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আম আর আমের খোসা দুইই দরকার।'

'শঙ্করাচার্যে'ও গিরিশের সেই বক্তব্য। বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়াও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হলে জীবের চৈতন্যলাভ হয় না।

'পরলে পরে সাধের বাঁধন, খুললে খোলে না,
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না।
সোনায় লোহায় ঘসে ঘসে তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিনতে মেলে না।
সে শেকল শক্ত লোহার আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার
হার বলে পরেছে গলে অমনি ফেলে না।
লোহার শেকল মনে হলে তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না॥'

এই গিরিশকেই গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ দিলেন ঠাকুর।

তাঁর দ্বাদশ ভক্ত মানে দ্বাদশ সূর্য—ঠিক করলেন, তাদের তিনি গেরুয়ায় আর রুদ্রাক্ষে রাজপদে অভিষিক্ত করে যাবেন। বুড়ো গোপালকে বললেন, 'যা, বারোখানা গেরুয়ার কাপড় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা কিনে নিয়ে আয়।'

নিয়ে এল বুড়ো গোপাল।

কিন্তু বারোজন হয় কী করে? হিসেবে তো এগারোজন। নরেন রাখাল তারক বাবুরাম যোগীন শরৎ কালী হরি লাটু নিরঞ্জন আর বুড়ো গোপাল। আরেকজন কে?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'এখানে নেই, বাড়িতে আছে। তারটা বাড়িতে গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে।'

'কে সে?'

'গিরিশ।'

'গিরিশ গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের অধিকারী? সে তো মশাই পাপী, অপবিত্র।'

ঠাকুর হাসলেন : তার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তার প্রগাঢ় ভক্তি, তার প্রচণ্ড আনন্দ।

'সে তো মশাই গৃহী। ও কি গেরুয়ার মান রাখবে? না কি রুদ্রাক্ষের?'

গৃহই তো এ যুগের সাধনার পীঠস্থান। আর মনোমালাই তো জপমালা।

॥ একুশ ॥

ক্লাসিকে গিরিশের 'মনের মতন' প্লে হল। অঘোর পাঠক ফকির সাজলে। গান ধরল :

> 'লাগা রহো মেরি মন
> পরম ধন কি মেলে বিন যতন।
> যাঁহা ভাসাওয়ে হুঁয়াই ভাসকে চল না।
> কব আঁধিয়া উঠে উসকা ক্যা ঠিকানা
> মগন রহেকো আপনা সামাল না—
> হরদম উঁসি পর নজর ফেলনা
> ওহি হ্যায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কোন?
> ওহি আপনা সব ভি বেগানা
> সমজ লে না কো আপন—
> এক হ্যায়—উও পরম ধন॥'

বিবেকানন্দ মানে নরেন বললে, 'তোমার ফকিরের গান চমৎকার হয়েছে, কিন্তু যাই বলো, ভাষার মাথামুণ্ডু নেই। এটা হিন্দি না উর্দু—কি বলো দেখি?'

'খাঁটি হিন্দি বা উর্দু দিলে সাধারণ দর্শক বুঝতে পারবে না।' গিরিশ বললে, 'হিন্দি বা উর্দুর শুধু একটা কাঠামো থাকলেই দর্শক বোঝে যে চরিত্রটা

স্বতন্ত্র আর গানের মর্মটাও তাদের বোধগম্য হয়। ভাষার মাথামুণ্ডু দিতে গেলেই সমস্ত ঝাপসা।'

দুজনে সব সময়েই প্রায় মতভেদ, ঝগড়া, দুজনেই আবার মহাভাব। সব সময়ে পাশাপাশি।

একজন প্রশ্নপ্রদীপ্ত জ্ঞান, আরেকজন প্রশ্নবিহীন ভক্তি।

ঝগড়া কোথায়?

দুজনে পাশাপাশি খেতে বসেছে বলরাম বোসের বাড়িতে। আম দিচ্ছে দুজনকে। যত আম গিরিশের পাতে, সব মিষ্টি, আর যত আম নরেনের পাতে, সব টক।

নরেন চটে গিয়ে বললে, 'শালা জি-সি, তোর পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক। নিশ্চয়ই তুই শালা বাড়ির ভেতর গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিস।'

গিরিশ বললে, 'আমরা গৃহী, সংসারী, আমরাই তো মজা মারব। তুই শালা সন্ন্যাসী ফকির, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবি, তোদের কপালে তো সুঁটকো টোকোই জুটবে।'

এই নিয়ে বেঁধে গেল ঝগড়া। তর্কাতর্কি।

সংসারী বলছে, আমাদেরই তো মজা, আমাদেরই তো মিষ্টি আম, সরস আম। কেল্লায় থেকে আমাদের যুদ্ধ। ঘরে বসেই সব জুটে যাচ্ছে আমাদের।

ছাই জুটছে। উত্তর দিচ্ছে সন্ন্যাসী। ক্ষুদ্র আয়তনে ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে বসে আছিস। ঘৃণা দ্বেষ দ্রোহ অশান্তি, ছোট-ছোট হিসেবে দিন যাচ্ছে। আমাদের কোনো বন্ধন নেই, পিছটান নেই, সমস্ত বসুন্ধরাই আমাদের ঘর-উঠোন।

ওরে বাবা, তোদের কত ক্লেশ, কত তপস্যা, কত রৌদ্রের দাহ, কত শীতের উৎপীড়ন।

তোদের তপ্ত হওয়াই বা কি কম? তোদের শীতার্ত হওয়া? কত তোদের দারিদ্র্যদুঃখ, অপমানক্লেশ। কত শোক কত গ্লানি কত নৈরাশ্য। তোদের তপস্যা আরো বেশি।

তাই তো, লাফিয়ে উঠল সংসারী, তাই তো ঠাকুর আমাদের 'বীরভক্ত' বলেছেন। তুই সন্ন্যাসী, তুই শুধু ভক্ত, আর আমরা সংসারী, আমরা বীরভক্ত। ঠাকুর বলেছেন সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কী! তুই সংসারী, তুই যে ঈশ্বরকে ডাকিস, যেন বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখিস, গহ্বরে কী আছে। তুইই বাহাদুর, তুইই বীর, তুইই বীরভক্ত। কী, বলেন নি?

নরেনের সঙ্গে ঝগড়া করার মত সুখ আর কোথায়? গিরিশকে চটিয়ে দিয়ে তার মুখে গালমন্দ শোনাও আনন্দময়।

'কী অশুভক্ষণে দুজনে দেখা হয়েছিল যে একদিনও একটি মিষ্টি কথা বলতে পারলাম না।' নরেন সম্পর্কে বলছে গিরিশ : 'বরাবর কেবল ঝগড়াই করলাম, গালমন্দ করলাম। তার সঙ্গে ঝগড়া গালমন্দ না করলে যেন আমার সোয়াস্তি হত না, বুকটা যেন খোলসা হত না। এমন লোক খুব কম পাওয়া

যায় যে কথা কয়ে সুখ হয়—মিষ্টি কথাই হোক আর রুক্ষ কথাই হোক—সব যেন মিষ্টি।'

আর দুজনের প্রতিই ঠাকুরের কী টান, কী অসীম ভালোবাসা!

নরেনকে খাওয়াবার জন্যে কী ব্যস্ত। বলরামের বাড়িতে ঠাকুরের জন্যে মোহনভোগ এসেছে, নিজে না খেয়ে নরেনকে ডাকছেন, ওরে মাল এসেছে! মাল! খা, খা! আবার গিরিশের বাড়ির ছাদে পাত পেড়ে খেতে বসেছেন, নরেনও বসেছে কিন্তু আদ্ধেক খাওয়া হতে না হতেই ঠাকুর নিজের পাত থেকে দই আর তরমুজের পানা নিয়ে নরেনের কাছে এসে উপস্থিত। বলছেন, নরেন, তুই এটুকু খা।

মা কালীর প্রসাদী একবাটি পায়েস নিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। বালকের মত বাটির উপরে হাত চাপা দিয়ে রেখেছেন আর বলছেন, 'এ পায়েস গিরিশ খাবে। গিরিশের জন্যে রেখেছি।'

'শুধু গিরিশের জন্যে?' অন্যান্য ভক্তরা বললে, 'কেন আমরা কি কেউ নয়?'

সে সব কথা ঠাকুর কানেও তুলছেন না। মুখে শুধু এক বুলি : 'এই পায়েস গিরিশ এসে খাবে। আর কারু নয়, এ পায়েস গিরিশের জন্যে।'

'গিরিশ কোথায়?'

'না, সে আসবে।' বালকের মত বিশ্বাস নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'ঠিক আসবে।'

'তার আসবার কি কথা আছে? সে কি খবর পাঠিয়েছে?'

'খবর পাঠাবে কেন? সে নিজে আসবে। সে এসে খাবে। এই সে এল বলে।'

বলতে বলতে গিরিশের গাড়ি এসে হাজির।

গিরিশকে দেখে ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন : 'এই তো এসেছে! ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়েস রেখেছি। খেয়ে নে। ওরা সব কাড়াকাড়ি করতে আসছে। শিগগির খেয়ে নে। নে, বোস আমার সামনে। খা।' বলে বাঁ হাত গিরিশের কাঁধের উপর রাখলেন, তারপর, মা যেমন সাত আট বছরের ছেলেকে পায়েস তুলে তুলে খাইয়ে দেয় তেমনি ডান হাতে একটু একটু করে পায়েস তুলে গিরিশের মুখে দিতে লাগলেন। শেষে বুড়ো আঙুল দিয়ে বাটি চেঁছে বাটির গায়ে যেটুকু লেগেছিল তাও খাইয়ে দিলেন। বললেন, 'যা, এবার আঁচা গে যা।'

'কী আশ্চর্য', ঠাকুরের স্নেহ-করুণায় গিরিশ একেবারে অভিভূত। বলছে, 'আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ো মিনসে, কলকাতার বদমাস গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি, কত বদখেয়ালি করি ঠিক নেই। কিন্তু তিনি যখন তাঁর বাঁ হাতখানি কাঁধে রেখে ডান হাতে আমার মুখে পায়েস দিতে লাগলেন, তখন আমি সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত আট বছরের নিষ্পাপ বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যেবুদ্ধি কোথায় তলিয়ে গেল। এ যে কী অদ্ভুত ভালোবাসা তা কাকে বলব কাকে বোঝাব।'

তারপর দয়ারই বা কী পার আছে!

বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছিলেন সন্ধের পর, কোথায় ফিরে যাবেন দক্ষিণেশ্বর, তা নয়, রব তুললেন গিরিশের বাড়ি যাবেন।

গিরিশ তখন বেশ একটু রঙে আছে, ঠাকুরকে দেখে কী করবে কোথায় বসাবে কীভাবে আদর-যত্ন করবে, একেবারে এলোমেলো হয়ে পড়ল। চাকর ঈশানকে বললে, 'যা শিগগির দোকান থেকে লুচি আর আলুর দম নিয়ে আয়।'

বৈঠকখানা ঘরে মেঝেতে তোষক পাতা, তার উপর লম্বা জাজিম, তাতেই বসেছেন ঠাকুর। অন্যান্যরাও বসেছে। জাজিমটা তত পরিষ্কার নয়। তাতে কী? মন পরিষ্কার।

ঈশান ঠোঙায় করে খাবার নিয়ে এল।

গিরিশ বললে, 'যা, যে কাঁসার থালায় আমি খাই সে থালাটা নিয়ে আয়।'

নিজের ব্যবহৃত থালায় লুচি আর আলুর দম সাজিয়ে ঠাকুরকে ধরে দিল গিরিশ। থালাটা রাখল জাজিমের উপর। বললে, 'নিন, খান।'

ঠাকুর দ্বিধা করতে লাগলেন। একে তো এই অপরিচ্ছন্ন ফরাস, তার পর এই ব্যবহৃত থালা!

সঙ্গের একজন ভক্ত হয়তো সে দিকে ইঙ্গিতও করল।

গিরিশ টং করে উঠল : 'কেন বলরামের বাড়িতে খেতে পারেন আর এখানে খেতে যত আপত্তি? নিন, খান, হাঁ করুন—'

এতটুকু শুচি-অশুচির দ্বন্দ্ব নেই, কিছুমাত্র আপোস নেই ভালোবাসায়। সমস্ত-দিয়ে-ফেলা সমস্ত-গ্রাস-করে-নেওয়া ভালোবাসা।

ঠাকুর থালার থেকে তুলে লুচি-আলুর দম খেতে লাগলেন আর হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু।

গিরিশ ঈশানকে ডাকল। 'দ্যাখ দিকিনি সকালবেলার পুঁইশাক আর চিংড়ি মাছের চচ্চড়িটা আছে কি না। যদি থাকে তো নিয়ে আয়—খেতে বড় ভালো হয়েছিল—'

একটা বাটিতে করে সকাল বেলাকার পুঁইশাকের চচ্চড়ি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল ঈশান। ঠাকুরের থালায় ঢেলে দিল চচ্চড়ি।

যিনি অন্যের স্পর্শ-লাগা খাবার খেতে পারেন না, অশুচিতে যাঁর এত আপত্তি, সেই ঠাকুর নির্দ্বিধায় চচ্চড়ি খেতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।'

গিরিশের কী ভাব?

আড়াল নেই অন্তরাল নেই অর্গল নেই আবরণ নেই—নিষ্কপট ভক্তি বা ভালোবাসার ভাব। আর তুমিই পরশরতন মানুষরতন, এই দ্বন্দ্বাতীত নিস্পন্দ বিশ্বাস।

কাশীপুরে ঠাকুরের খুব অসুখ, সন্ধেসন্ধি গিরিশ এসেছে। ঠাকুর বসে আছেন বিছানায়। ঘরের কোণে লণ্ঠন জ্বলছে।

গিরিশ আসতেই ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওগো, আলোটা একটু কাছে

আনো। গিরিশকে দেখি।

গিরিশের প্রতি লক্ষ্য স্বচ্ছ হয়ে এল। জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো আছ?'

গিরিশ হাসল। তোমাকে ভালোবেসে ভালো না থেকে উপায় কী?

অস্থির হয়ে লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর : 'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।' কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, 'জলখাবার এনে দে।'

একটি ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা এনে দিল ঠাকুরকে। সবগুলি মালা ঠাকুর একে-একে পরলেন নিজের গলায়। হৃদয়মধ্যে হরি বসে, যেন তাঁরই পূজা করলেন। হঠাৎ দু গাছি মালা তুলে নিয়ে গিরিশকে দিলেন। মাস্টার-মশাই পাখা করছিল, তাকেও দিলেন দুগাছি। বললেন, পরো।

কিন্তু কই গিরিশের খাবার কই।

সেই বরানগরে গেছে তো, সেই ফাগুর দোকানে। তাই বুঝি দেরি হচ্ছে। কিন্তু বেশি দেরি হলে কচুরি গরম থাকবে তো?

এই এসে গেছে খাবার। লুচি কচুরি আর মিষ্টি।

সমস্ত ঠাকুরের সামনে রাখা হলে তিনি তা প্রসাদ করে দিলেন। নিজের হাতে করে কচুরি গিরিশের হাতে দিলেন। বললেন, 'বেশ কচুরি।'

গিরিশ পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে লাগল।

এখন জল দিতে হয়। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস, সারাদিন কী প্রচণ্ড গরম গিয়েছে। ঠাকুরের শয্যার এক কোণে কালো কুঁজোয় জল ভরা। এই জলই ভালো, এই জলই গিরিশকে দাও।

কিন্তু কে দেবে? ঠাকুর নিজেই উঠলেন। ভীষণ অসুস্থ, দাঁড়াবার শক্তি নেই, তবু উঠলেন। বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন কোনোরকমে। তাঁকে বাধা দেবার কথা কেউ ভাবতেও পারল না, নিজেই জল গড়ালেন। গ্লাস থেকে একটু জল হাতে নিয়ে দেখলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কি না। না, গিরিশ খাবে, যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু কী করা, এর চেয়ে ঠাণ্ডা পাবার আশা নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ জলই দিলেন।

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কচুরি বেশ গরম আছে।'

'ফাগুর দোকানের কচুরি।' গিরিশকে বললে মাস্টার, 'বিখ্যাত।'

'বিখ্যাত!' ঠাকুর সপ্রশংস সমর্থন জানালেন।

খেতে খেতে গিরিশও সহাস্যে বললে, 'বেশ কচুরি।'

ঠাকুর বললেন, 'লুচি থাক, কচুরি খাও।' তাকালেন মাস্টারের দিকে, 'কচুরি কিন্তু রজোগুণের।'

দক্ষিণের ছোট ছাদে হাত ধুতে গেল গিরিশ।

'অনেকগুলি কচুরি খেল।' ঠাকুর বললেন মাস্টারকে, 'ওকে বলে দাও আজ আর যেন কিছু না খায়।'

একেই বলে ঈশ্বর শুধু সুখকর নন ঈশ্বর কল্যাণকর। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন।

এই ঈশ্বরত্ব না অবতারত্ব নিয়ে আবার গিরিশে-নরেনে ঝগড়া।

নরেন মানতে চায় না। বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যে অনন্ত তার আবার অংশ কী! তার অংশ হয় না।

গিরিশ বলে, ঈশ্বর সব কিছু করতে পারেন, শুধু একটা মানুষ হতে পারেন না?

'তাঁকে ধারণা করে এমন কার সাধ্য? তিনি অন্তহীন।'

'তাঁকে ধারণা করা কী দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল।' বললে গিরিশ, 'তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা।'

'আবার অবতার?' নরেন বুঝি বিদ্রূপ করে ওঠে।

'হ্যাঁ, অবতার।' গিরিশ জোর দিয়ে বললে, 'আগুন সব জায়গায় আছে কিন্তু কাঠে বেশি। তেমনি ঈশ্বর সর্বত্র আছেন কিন্তু মানুষে বেশি। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, যে মানুষ ঈশ্বরের জন্যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয়ই ঈশ্বর অবতীর্ণ।'

নরেন চুপ করে গেল।

'নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।' ঠাকুরকে একদিন এসে বললে গিরিশ।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'না হারেনি। আমায় এসে বললে, গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কী বলব। এমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

ক্লাসিকে গিরিশের লেখা 'ভ্রান্তি' নামল। গিরিশ নিজে রঙ্গলাল সেজেছে। বলছে দেবীমূর্তিকে : 'অমন পাথুরে মাকে মানি না-মানি এসে যায় না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে। আমার দেবতা অমন দৃষ্টি-ভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর।'

'কে তোমার দেবতা?'

'মানুষ আমার দেবতা। আমার দেবতা প্রাণময় পুরুষ—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না ভালো করেছি কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোনো শাস্ত্রে নিন্দা নেই, তর্কবিতর্ক নেই।'

মানুষরতনই পরশরতন।

কী বিশ্বাস গিরিশের!

'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্যে!' সরাসরি বললে ঠাকুরকে। বলতে পারলে।

ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে আপনজনের মত ঘরের লোকের মত কে জানিয়ে দেবে কে বুঝিয়ে দেবে ঈশ্বরই সার আর সব অসার। কে অধম পতিত দুর্বল সন্তানকে তুলবে হাত ধরে? কে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে তুলবে? আর যদি মানুষরূপে সঙ্গে-সঙ্গে না বেড়ান তা হলে যারা ঈশ্বরে মন-প্রাণ ফেলে রেখেছে, যাদের ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না, তারা কী করে থাকবে, কী করে কাটাবে দিনরাত্রি?

'যেমন ভক্তের বিশ্বাস তেমনি ভগবানের দয়া।'

'ভ্রান্তি'তে পুরঞ্জন বলছে, 'সংসার যে সাগর বলে এ কথা ঠিক। কূলকিনারা নেই। তাতে একটি ধ্রুবতারা আছে—দয়া।'

অমর দত্ত 'মিনার্ভার'ও ভার নিল। কিন্তু চালাতে পারল না। চলে গেল মনোমোহন পাঁড়ের হাতে। ক্লাসিকও রাখতে পারবে এমন মনে হলো না। ক্রমশই ঋণে ডুবে যাচ্ছে। গিরিশই আবার এগিয়ে এল। টাকা দিয়ে উদ্ধার করল অমরকে।

তবু শেষ উদ্ধার হল না। পাওনাদাররা মোকদ্দমা করল। ক্লাসিক ছেড়ে দিল অমর। গিরিশও তিন মাসের মাইনে বাকি রেখে ক্লাসিক ছেড়ে চলে এল মিনার্ভায়।

ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবে।'

শুনে ঠাকুর খুব খুশি নন, অসুখের জন্যে কথা বলতে পারছেন না, আঙুল দিয়ে মুখ দেখিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তার বাড়ির লোকজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কী করে? সংসার চলবে কিসে?'

'তা জানি না।' একটু থেমে গিরিশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মশাই, কোন্‌টা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাঁকে ডাকা?'

'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে', বললেন ঠাকুর, 'তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি, এও করো ওও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাকো। সব ত্যাগ করতে বলি না।'

'আচ্ছা মশাই', গিরিশের আরো প্রশ্ন : 'মনটা এই বেশ উঁচু আছে আবার নীচু হয় কেন?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু কখনো নীচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে আবার কখনো কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে, কখনো পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কী? মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'

গিরিশের সঙ্গে মহিমাচরণ তর্ক করছে। মহিমাচরণকে পরাস্ত হয়ে গিরিশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল।

ঠাকুর বললেন, 'দেখলে তো, তর্ক করতে-করতে ও জল খেতে ভুলে গেল। যদি ওর কথা না মানতে তাহলে তোমায় ও ছিঁড়ে খেত।'

॥ বাইশ ॥

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। বিবেকানন্দই সমস্ত দেখছে-শুনছে।

মঠের সন্ন্যাসীরা এসেছে। গিরিশও উপস্থিত।

সন্নেসীদের কী খেয়াল হল, স্বামীজিকে যোগীর বেশে সাজাল। কানে শাঁখের কুণ্ডল, সারা গায়ে শ্বেত ভস্ম, মাথায় দীর্ঘ জটাভার, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা আর বাঁ হাতে ত্রিশূল। পদ্মাসনে বসল পশ্চিমাস্য হয়ে। শুরু করল রামকীর্তন। সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ। রাম রাম শ্রীরাম রাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল গিরিশের দিকে। নিজের বেশবাস খুলে গিরিশকে সাজাতে লাগল। গিরিশ এতটুকু আপত্তি করল না, কী রকম যেন আরেক রকম হয়ে গেল।

গিরিশের বিশাল দেহে স্বামীজি নিজ হাতে ভস্ম মেখে দিল, কানে পরিয়ে দিল কুণ্ডল, মাথায় সেই জটাজুট, বাহুতে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ। শুধু এতেই হবে না। পরনের শাদা কাপড় ছেড়ে পরো এবার গেরুয়া।

'এ যে একেবারে ভৈরব মূর্তি ধরেছে।' সপ্রশংস চোখে বললে স্বামীজি : 'ঠাকুরই তো বলতেন গিরিশ ভৈরবের অবতার।'

ঠাকুর গিরিশকে গেরুয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, স্বামীজি এবার সে গেরুয়া পরিয়ে দিল নিজের হাতে।

'জি-সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে।' বললে স্বামীজি, উপস্থিত ভক্তদের লক্ষ্য করে বললে, 'তোরা সব স্থির হয়ে বোস।'

কিন্তু কোন্ কথা কইবে আজ গিরিশ?

আনন্দে সে নিশ্চল হয়ে রইল। বললে, 'দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি কী বলব। তোমাদের মতন কামকাঞ্চনত্যাগী কুমার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এ অধমকে একাসনে বসতে অধিকার দিয়েছেন তাঁর অপার করুণার কথা বলি এমন সাধ্য কী!' কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল গিরিশের। সে বিহ্বলের মত কাঁদতে লাগল।

'গিরিশ আঁস্তাকুড়ের আমগাছ।' বললেন ঠাকুর, 'নির্মল গিরিশে কোন দোষ নেই।'

থিয়েটার পাশে দেখবেন না, টিকিট কেটে দেখবেন—গিরিশকে জানালেন ঠাকুর। গিরিশ বললে, বেশ তো, আট আনা দেবেন, গ্যালারিতে বসে দেখবেন। ঠাকুর গ্যালারিতে বসতে রাজি নন, সে ভারি র‍্যাজলা। না, বেশ, গ্যালারিতে বসবেন না, যেখানে বসছিলেন সেখানেই বসবেন, কিন্তু দেবেন শুধু আট আনা। বিবেক-সান্ত্বনা আটআনা।

ঠাকুর গম্ভীর হলেন। বললেন, না আমি তোমাকে ষোল আনা দেব।

একেবারে ঢেলে দেব, ভরে দেব, নিঃশেষ করে দেব।

পরে নিজেই আবার বলছেন, 'আমি গিরিশকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলাম, ও আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেললে।'

দিয়ে ফেললে ভক্তি আর বিশ্বাস। হ্যাঁ, অন্ধ বিশ্বাস আর নীরন্ধ্র ভক্তি। ভক্তি যদি জাগে আইন-বিধি নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় একবাঁশ জল।

'আমাদের উপায় কী?' গিরিশ জিজ্ঞেস করলে।

ঠাকুর বললেন, 'ভক্তিই সার।'

'ভক্তির তো আবার সত্ত্ব-রজ-তম আছে।'

'হ্যাঁ, ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তির রজ লোক দেখানো জাঁকজমক। আর ভক্তির তম যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কী! তুমি যখন আমার মা, আপনার মা, আমাকে দেখা দিতেই হবে।'

'ভক্তির তমই তো আপনি বেশি শেখান।'

'হ্যাঁ, যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো কাটো লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার হরহর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'

একবার আমি তাঁকে মেনেছি, তাঁকে ধরেছি, আমার আবার ভয়!

'আশ্চর্য হচ্ছি', নিজের মনে বলছে গিরিশ, 'আমি কিনা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কী তপস্যা করেছি যে আমি এই সেবার অধিকারী হয়েছি! কিন্তু যাই বলো তুমি ভাব-টাব ধোরো না। ভাব-টাব ধরলেই দশ হাত তফাতে যাই, ভয় হয়। তুমি শুধু এই গুরু রূপটিই ধরে থেকো।'

ঠাকুর বললেন, 'যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন।'

'হ্যাঁ, গুরু-রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না।' বলেই আবার বলছেন, 'হ্যাঁ গা, এবার রূপ নিয়ে আসোনি কেন গা?'

এ যেন ঠাকুরেরই ভাষায় ফোয়ারা-লুকিয়ে-রাখা পোড়ো বাড়ি। যেন রাজা নিজের রাজ্য দেখতে বেরিয়েছেন ছদ্মবেশে।

এবার রাজ্য-উদ্ধার।

গিরিশ বলে উঠল : 'এবার বুঝি বাঙলা উদ্ধার।'

'শুধু বাঙলা কেন,' কে আরেকজন ভক্ত বললে, 'সমস্ত জগৎ উদ্ধার।'

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ফিচকেমিতেও ওস্তাদ। সেখানেও তাঁর সর্বাতিশায়ী বিভূতি।

'হ্যাঁ গা, তোমরা আমার কথা কি কইছিলে?' ঠাকুর নিরীহ মুখে তাকালেন গিরিশের দিকে : 'আমি খাই দাই থাকি।'

'আপনার কথা আর কি বলব!' গিরিশ ঝলসে উঠল : 'আপনি কি সাধু?'

'না, না, আমি সাধু-টাধু নই। আমার সত্যিই কোন সাধুবোধ নেই। আমি খাই দাই থাকি।'

'আশ্চর্য, ফিচকেমিতেও পারলুম না আপনার সঙ্গে।' গিরিশ ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'আপনার সব ঢং। আপনার সমস্ত ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢং করত—'

'হ্যাঁ', সরল সমর্থনের ভঙ্গি করলেন ঠাকুর : 'শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নর-লীলায় ঐ রূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন ধরেছিলেন অথচ নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন একটা কাঠের পিঁড়ি বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!'

'তোমাকে বুঝেছি।' গিরিশ বললে, 'তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই।'

আবার আরেক দিন বললে, 'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু। এমন কি ফিচকেমিতেও।'

'না গো তা নয়।' বললেন ঠাকুর, 'এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার মধ্যে ঢের তফাৎ। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা কঠিন। পড়ে বা দেখে-শুনে জানার মধ্যে সেটা হয় না।'

সকলের গত জীবনের কথা জানতে চাইতেন ঠাকুর কিন্তু গিরিশের বেলায় তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। একবার জিজ্ঞেস করে, দেখতাম! সব মহাভারত উগরে দিতাম। কি করেছি না-করেছি, কোথায় গেছি না-গেছি, রাত কাটিয়েছি। এতটুকুও 'কিন্তু' করতাম না। আর, গিরিশের পুরোপুরি বিশ্বাস, তিনি পুরোপুরি শুনতেন। আর মহাভারত শেষ হলে ঠিক বলতেন, যা করেছিস বেশ করেছিস। কোনোদিন নিন্দাতিরস্কার করেন নি, করতেনও না।

'রঙ্গালয়' নামে এক সাপ্তাহিক বেরুল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক। গিরিশ তাতে আত্মকথা লিখল।

'আত্মজীবনী লেখা মানেই কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছে গিরিশ, 'শুধু লোকের কাছে বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা। আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, ভগবানের স্পেশ্যাল মার্কার তৈরি—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটাই বলা ফলাও করে। দম্ভের এর চেয়ে আর বড় প্রকাশ হতে পারে না। আত্মজীবনী মানেই হচ্ছে নিজের পক্ষে ওকালতি।'

'আত্মজীবনীতে কেউ-কেউ তো নিজের কুকীর্তির কথাও বলে থাকেন।' একজন ফোড়ন দিল।

'তাও পাকে-প্রকারে নিজের মহত্ত্বই প্রমাণ করবার জন্যে।'

তার পরেই মিনার্ভায় 'বলিদান' নামল।

কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানি করুণাময়ের পার্টে স্বয়ং গিরিশ। বিয়ের পর মেয়ে প্রথম শ্বশুর বাড়ি গেছে, ঝি ফিরে এসে বউ-কাটকি শাশুড়ির কথা বলছে করুণাময়কে : 'পালকি খুলে বউয়ের মুখ দেখে মাগী অমনি ডুকরে কেঁদে উঠল! বলে ওমা, কোথাকার কাঠকুড়ুনি এল গো—কোথাকার হাঘরের মেয়ে আনলুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—'

সেই যুগের শাশুড়িদের সম্পর্কে গাইছে বলিদানে :

'খা লো কনে আফিং কিনে বাগিয়ে না হয় রাখ দড়ি,
কলিতে অমর কনের শাশুড়ি॥

ইটে ভিটে বেচে কনের বাপের নাইকো পার,
হাত নাড়া দে করবে কত মায়ের তোর খোয়ার।
শাশুড়ির মুখের তোড়ে দৌড়ে মারে ডোমহাড়ি॥
মরে জুড়ো চোখের জলে হবি লো নাকাল,
উঠতে খোঁটা বসতে খোঁটা শুনবি সাঁজ-সকাল।
তোর শাশুড়ির সোনার ছেলে, তুই রাঙের থুবড়ি॥'

তারপরেই মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলা।' এ পর্যন্ত সিরাজকে ইংরেজের লেখা ইতিহাসের ভিত্তিতে কলঙ্কিত করে আঁকা হচ্ছিল—এমন কি নবীনচন্দ্র সেনও বিভ্রান্ত হয়েছিল। গিরিশই তাকে সত্যের আলোতে প্রতিষ্ঠিত করল নাটকে। অপরিণত বয়সের অস্থিরতা ছাড়া সিরাজের আর কোনো দোষ ছিল না। সিরাজ ক্ষমাশীল, দয়ার্দ্র, প্রজাবৎসল। শুধু বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতাই তার সর্বনাশ করেছে। আর শত্রু ইংরেজ সব সময়েই শত্রু।

'সিরাজদ্দৌলায়' সিরাজ সাজল দানী, আর করিমচাচা গিরিশ।

মিরজাফর আর জগৎ শেঠকে বলছে সিরাজ, 'আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি সত্যিই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙলার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য প্রদান করব, আপনাদের আত্মীয়স্বজন স্বদেশীই নির্বাচিত হবে। হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই রাজকার্য প্রাপ্ত হবে।'

আর ক্লাইভকে বলছে করিমচাচা : 'সাহেব, বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। তোমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির আশা বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজিত।'

করিমচাচা আবার বলছে : 'এই বাঙলায় যদি তিনজনের দু'মত দেখাতে পারেন তা হলে আমি নাকে খত দিয়ে আফিং ছেড়ে দেব। যদি একমতে বাঙলায় কাজ হত, যদি একমতে চলতে শিখত, তা হলে বাঙলার মাটি থাকত না, সোনা হয়ে যেত। বাঙলার বুদ্ধি যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি।'

মীরমদনকে বলছে সিরাজ : 'মীরমদন, তুমি জানো না, মোগল বংশ উচ্ছেদ করতে ইংরেজ জন্মগ্রহণ করেছে—শিখগুরু তেগ বাহাদুরের অভিশাপ শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে মোগল বংশ উচ্ছেদ করবে।'

আর জহরা ক্লাইভকে বলছে : 'এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী, দিন দিন যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজার শান্তি নেই। সেই শান্তি স্থাপনের ভার ঈশ্বর তোমাদের প্রদান করেছেন। আবার তোমরা যদি অত্যাচারী হও, তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে।'

নবীনচন্দ্র লিখছে গিরিশকে : 'তুমি আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখেছিলাম শত্রু-চিহ্নিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। নব যুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-

সংগীত দিয়েছিলাম, শোকের সময় সংগীত আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলে বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন। সেই জন্যে আমি পরে সংগীত বাদ দিয়েছি। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ ধরেছ।'

গিরিশের হাঁপানি রোগ দেখা দিল। শরীর ভেঙে পড়তে লাগল দিন-দিন। কে তার এই ব্যাধির নিরাকরণ করে?

'তোমার এই অসুখ আমি ভালো করে দেব।' ঠাকুরকে বললে একদিন গিরিশ, 'মন্ত্রবলে ভালো করে দেব।'

'কী মন্ত্র?' ঠাকুর তাকালেন উৎসুক হয়ে।

'তুমি শুধু বলবে, রোগ আরাম হয়ে যাক। বলো', গিরিশ এক পা এগিয়ে এল, দৃপ্তস্বরে বললে, 'বলো, ভালো হয়ে যাক। আচ্ছা, বেশ, আমি ঝাড়িয়ে দেব। কালী! কালী!' গিরিশ কান্না ছলছল স্বরে বললে 'বলো, তুমি শুধু বলো ভালো হয়ে যাবে।'

ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা হয়েছে তা যাবে।'

তার মানে কি এই যে, দেহ হয়েছে, দেহই চলে যাবে। আর দেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে রোগচ্ছায়া।

শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে স্বামীজি বেদব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। এমন সময় গিরিশ এসে উপস্থিত।

'কী জি-সি, এসব তো কিছু পড়লে না', বললেন, স্বামীজি, 'কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!'

গিরিশ বললে, 'অত বুদ্ধি কোথায় যে ওর মধ্যে সেঁধুব! ঠাকুর তোমাদের দিয়ে ঢের-ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সবে দরকার নেই। বেদবেদান্ত মাথায় রেখে জয় রামকৃষ্ণ বলে এবার পাড়ি মারব।' বলে প্রকাণ্ড ঋগ্বেদকে গিরিশ বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়।'

স্বামীজি অন্যমনা হয়ে কী ভাবছেন, গিরিশ সখেদে বললে, 'হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে কিন্তু এই যে দেশে এত দুঃখ কষ্ট হাহাকার অন্নাভাব ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা মহামহাপাতক চোখের সামনে ঘটছে, তার উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে নিত্যি পঞ্চাশখানা পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি—ঐ অমুকের বাড়ির বউটাকে গুন্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে—ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, নয়তো অমুকে জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ সব প্রতিরোধ করার রহিত করার কোনো উপায় বেদে আছে কি?'

গিরিশ একের পর এক সমাজের দুর্গতির ছবি স্বামীজির সামনে তুলে ধরতে লাগল। নির্বাক হয়ে শুনলেন স্বামীজি। তাঁর দু চোখ জলে ভরে এল। পাছে আরো বিহ্বল হয়ে পড়েন, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন বাইরে।

শরৎকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'দেখলি এত বড় প্রাণ! আর্তজীবের

প্রতি করুণায় বেদবেদান্ত ভেসে গেল।'

'বেশ পড়া হচ্ছিল,' শরৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনি কী কতগুলো ছাই-ভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করে দিলেন।'

'রেখে দে তোর বেদবেদান্ত! জগতে কত দুঃখকষ্ট, সে দিকে চেয়ে উনি বেদ পড়তে বসেছেন।'

'আপনি শুধু হৃদয়ের কারবারী, জ্ঞানের নন।' শরৎ বললে, 'নইলে যার চর্চায় জগৎ ভুল হয়ে যায় তার আপনি আদর করলেন না।'

'বটে? জ্ঞান আর প্রেমের ভিন্নতাটা কোথায় আমায় দেখিয়ে দে দিকি। তোর বেদ যদি জ্ঞান আর প্রেমকে পৃথক করে থাকে, সে বেদ আমার মাথায় থাকুক।'

কথাটা বুঝি মানল শরৎ। গিরিশের কথা তো বেদেরই কথা।

'কী কথা হচ্ছিল তোদের?'

কুণ্ঠিত মুখে শরৎ বললে, 'বেদের কথা। গিরিশবাবু বেদবেদান্ত পড়েননি বটে কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল।'

স্বামীজি বললেন, 'গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়। পড়বার শোনবার দরকার হয় না। এমন ভক্তি-বিশ্বাস আর কোথায় আছে? জি-সির মত যার ভক্তি-বিশ্বাস তার শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। তাই বলে ওকে অনুকরণ করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ হবে। ওর কথা শুধু শুনে যাবি, ওর দেখাদেখি কিছু করতে যাবিনে।'

॥ তেইশ ॥

'মানুষ জপায় বিধি মাপায়।'

তিনকড়ির পিছনে বাবু লেগেছে। এ বাবুটি আবার গিরিশের বন্ধু। যেমন ধনী তেমনি উচ্ছৃঙ্খল।

সিঁথিতে বাগানবাড়ি আছে। মাঝে-মধ্যে মাইফেল বসে। সে মাইফেলে, আর-আর নটনটীদের সঙ্গে গিরিশও হাজিরা দেয়।

'তুমি শুধু আমাকে একটা টাকার সংখ্যা দাও।' বাগানবাড়ির বাবু বললে তিনকড়িকে।

তিনকড়ি চুপ করে রইল।

'যা বলবে তাই দেব। কিন্তু ঐ থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে।' বরদ-বদান্য ভঙ্গিতে বাগানবাড়ি হাসল: 'ছেড়ে দিয়ে আমার হোলটাইম হয়ে থাকবে।'

বিরস মুখে তিনকড়ি বললে, 'একটু ভেবে দেখি।'

'তা দেখ।' বাগানবাড়ি গম্ভীরভাবে বললে, 'বলতে পারো যৌবন ক্ষণ-

স্থায়ী। তা, তোমার থিয়েটারও ক্ষণস্থায়ী। এখন হিরোয়িন সাজছ, ক'দিন পরে ঝি সাজবে। তারপরেই ঝিঁ ঝিঁ হয়ে যাবে।'

ম্লান রেখায় তিনকড়ি একটু হাসল।

'থিয়েটার থেকে নীট কত নিয়ে আসতে পারবে ভেবেছ? আমার থেকে তার চেয়ে ঢের বেশি গুছিয়ে নিতে পারবে।'

'বললাম তো ভেবে দেখি।'

তিনকড়ি গিরিশের কাছে উপদেশ চাইল।

গিরিশ এক বাক্যে নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'তুমি পাগল হয়েছ? টাকা—টাকা দিয়ে কী হবে? আসল—আসল হচ্ছে থিয়েটার। শিল্পসৃষ্টি।'

'কিন্তু ও যে আপনার বন্ধু।' মুখ টিপে হাসল তিনকড়ি।

'বন্ধু—তা কি করা যাবে? বন্ধুর চেয়েও শিল্পী বড়।'

বাগানবাড়িকে তিনকড়ি প্রত্যাখ্যান করে দিল। মাপ করুন, পারবো না।

'তাতে কী?' উদার হবার ভাব দেখাল বাগানবাড়ি : 'এখন না পারো, পরে পারবে। আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

বুঝল, প্রত্যাখ্যানের মূলে গিরিশ। ঠিক করল গিরিশকে খুন করবে। গিরিশকে খুন না করলে তিনকড়ির পথ খোলসা হবে না।

মনের ছুরি মুখের মধু দিয়ে ঢাকল বাগানবাড়ি। সম্প্রীতির প্লাবনে গিরিশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে তিনকড়িকেও।

দু-তিনটে মাইফেল হয়ে গেল এর মধ্যে। কারু মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইল না বাগানবাড়ির মনের কোণে সাপ-খোপ আছে।

আবার একটা আসর বসাল—শেষ আসর। নাচ গান বাজনা—ফুল ফরাস ফরসি। আর মদ—অপর্যাপ্ত মদ। বলতে পারো অতল বোতল!

অনেক ইয়ারবক্সি বন্ধুবান্ধব এসেছে। গিরিশ এসেছে। সঙ্গে চাকর ফকিরকে নিয়ে নটিনী তিনকড়ি।

শুধু রাজেন এখনো আসেনি।

'এই এল বলে।' বাগানবাড়ি আশ্বস্ত করল।

অন্যান্য দিন সমস্ত রাত ফুর্তি চলে, আজ কেন কে জানে বাগানবাড়ি হুকুম করেছে, রাত বারোটার মধ্যেই আসর শেষ হবে। সবাই চলে যাবে, শুধু গিরিশ থাকবে—তার সঙ্গে আছে একটা জরুরি পরামর্শ। আর সেটা যখন থিয়েটারসংক্রান্ত, তখন তিনকড়িও থাকতে পারে ইচ্ছে করলে।

রাত প্রায় দশটায় রাজেন এসে হাজির।

সরাসরি উপরে উঠতে পা উঠল না। দেখল একটা গাছের নিচে কতগুলো কালো-কালো লোক ফিসফিস করে কি সব কথা কইছে।

চিনতে দেরি হল না। তুমি গোলাপ সিং?

মোদো-মাতালের লাইনের মানুষ, গুণ্ডাদের সঙ্গে আলাপ রাখতে হয় একটু-আধটু। সেই সুবাদেই গোলাপকে চিনত রাজেন। কিন্তু এখানে, এ সময়, দলবল নিয়ে ও উপস্থিত কেন?

তিনকড়ি

গোলাপ এগিয়ে এল দু'পা। নিম্নস্বরে বললে, 'রাত বারোটার আগেই চলে যাবেন।'

'কেন বলো তো?'

বলব না বলব না করেও বলে ফেলল গোলাপ। তা ছাড়া রাজেন তো বাগানবাবুরই সাগরেদ।

ব্যাপারটা তেমন-কিছুই নয়, প্রায় জল-ভাত, এমনি ভাবের থেকে গোলাপ সিং বললে, 'আজ গিরিশ ঘোষকে খতম করব। ওতে খতম না করা পর্যন্ত তিনকড়ি বিবি বাবুর কবজায় আসছে না।'

'গিরিশবাবু কোথায়?'

'ওপরে।'

'তিনকড়ি?'

'তার খবর জানি না।'

দলের কে আরেজন বললে, 'সেও উপরে। সে না থাকলে আসর জমবে কেন?'

'কিন্তু ফকির?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল রাজেন : 'তাদের চাকর ফকির?'

'এখানেই কোথাও ঘোরাফেরা করছিল—'

'তাকে তো কোনো ছুতো করে সরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'তা ঠিক বলেছেন।' গোলাপ সিং সায় দিল : 'ও ব্যাটা সাক্ষী হয় কেন? ভালোয়-ভালোয় আগে থেকেই সরে পড়ুক।'

'তাই—' ফকিরকে এদিক-ওদিক খুঁজতে বেরুল রাজেন।

ঘাটের ধারে পেল তাকে নিরিবিলি।

'তুই এখুনি চলে যা।' রাজেন তাকে কাছে টেনে এনে আবছা গলায় বললে, 'একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এনে পেছনে গলির মোড়ে চুপটি করে তুই অপেক্ষা কর। যতক্ষণ তোর বিবি আর গিরিশবাবু না আসে, ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি। দেরি হয়, গাড়োয়ানকে বেশি দিবি। দেখিস, ঠিক থাকিস—'

দোতলায় আসরে উঠে এল রাজেন।

'কি হে এত দেরি কেন?' বাগানবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'বোসো, খাও গান শোনো।'

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রাজেন : 'গিরিশবাবু কোথায়?'

'পাশের ঘরে। সঙ্গে তিনকড়ি। মনের সুখে অঢেল খাচ্ছে দু'জনে। বারোটা বাজবার আগে—' বাগানবাবু কথাটা শেষ করল না, নির্দোষ চোখে দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল।

রাজেন পাশেই বসেছিল, হঠাৎ উঠে পড়ল।

'এ কি, পালাচ্ছ নাকি?'

'না, না, কোথায় পালাব?' যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে গায়ের দামী শাল ফরাসের উপর ফেলে গেল রাজেন।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখল—বাগানবাবু যা বলেছে—গিরিশ আর তিনকড়ি

বসে আছে, সামনে আহার্য ও পানীয়।

'খাচ্ছেন তো, খেয়ে নিন।' রাজেন বললে পরিহাসের সুরে, 'কে জানে কাল জুটবে কিনা—'

'কেন, কী হয়েছে?' চোখে মুখে আতঙ্ক, গিরিশের হাতের গ্লাশ কেঁপে উঠল।

'আসর উঠে গেলেও আপনি আর তিনকড়ি খানিকক্ষণ থেকে যাবেন তো?'

'সেই রকমই তো কথা। বাবুর কী এক জরুরি পরামর্শ আছে।'

'জরুরি পরামর্শই বটে। শুনুন', রাজেন গলা প্রায় অনুচ্চারিত রেখে বললে, 'ঠিক করা হয়েছে, আসর উঠে গেলে, কেউ যখন থাকবে না তখন আপনাকে খুন করা হবে।'

এ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নয় তো? গিরিশ অস্ফুটে চমকে উঠল : 'খুন?'

'শুধু খুন নয়, লাশ-কে-লাশ লোপাট করে ফেলা হবে।' রাজেন আরো ঘন হয়ে এল : 'বাগানে গর্ত খুঁড়ে লাশ পুঁতে দেওয়া হবে, আর তার উপরে একটা গাছ বসানো হবে। ঘাসের কাজ এমন পরিপাটি হবে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।'

'আর তিনকড়ি—তিনকড়ির কী হবে?' ভয়ে আধখানা উড়ে গিয়েছে, তিনকড়ির দিকে তাকাল গিরিশ।

'ওকে কি আর মারবে?' রাজেনও তাকাল : 'ওর তো বাঁচবার অস্ত্র আছে, ওর রূপ যৌবন। কিন্তু আপনারই কিছু নেই। আপনিই নিরস্ত্র।'

'না, না, আমারও আছে।' গিরিশ উঠে দাঁড়াল।

'কী আছে?'

'গুরুকৃপা।' গিরিশ এগুলো সিঁড়ির দিকে।

'কৃপা করে ও দিকে যাবেন না।' রাজেন বাধা দিল : 'নিচে সিঁড়ির মুখে চার চারটে গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে পথ নেই।'

'পথ নেই?'

'একটা মাত্র পথ আছে। এ ঘরের পাশে বারান্দা দেখছেন তার শেষে পায়খানা।' রাজেন দ্রুত নিশ্বাসে বলে যেতে লাগল : 'পায়খানার উত্তর দিকে যে জানলা তাতে গরাদ নেই। সেখান দিয়ে নেমে আমগাছের ডাল বেয়ে পাঁচিলের উপর পড়বেন। ব্যস, তা হলেই হল। পাঁচিলের বাইরেই রাস্তা। পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে রাস্তা পাবেন, আর সেই রাস্তা ধরে এগুলেই দেখবেন ফকির গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

গিরিশ হতাশ মুখে বললে, 'এর চেয়ে খুন হয়ে যাওয়া সোজা।'

'কিন্তু হতে দিচ্ছে কে? তা হলে দেখি, আমিই আপনাকে পিঠে করে নামাব। দেখি কতটা ওজন আপনার শরীরের?'

গিরিশকে পাঁজাকোলে করে তুলল রাজেন।

ভয়ে মানুষের শরীর ভারী হয়, গিরিশের হালকা হয়ে গেল। গিরিশকে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'পারব নামিয়ে নিতে।'

'কিন্তু আমার কি হবে?' তিনকড়ি প্রায় কেঁদে ফেলল।

'তোমার আবার কী হবে? তুমি বাগানবাড়ি আলো করে থাকবে।' রাজেন হাসল।

'অসম্ভব।'

'না, না, তোমাকেও নামিয়ে নেবে।' গিরিশ আশ্বাস দিল।

'তবে তার আগে ফরাস থেকে আমার শালখানা কুড়িয়ে নিয়ে এস।' রাজেন বললে, 'আমার যাওয়া চলবে না। আমি এখন ওখানে গেলেই বাবু আমাকে আটকে রাখবে, বেরুতে দেবে না। পালাবার প্ল্যান তা হলে বানচাল হয়ে যাবে। তুমি যাও, গিয়ে কায়দা করে তুলে নিয়ে এস। দেখব তুমি কেমন অভিনেত্রী।'

আসরে প্রবেশ করল তিনকড়ি। জমজমাট আসর। মত্তদোলে নৃত্যরোল চলেছে, চলেছে গীতবাদ্য। মদে প্রায় সকলে চুর। কে আছে কে নেই, কার আর তখন অত হিসেবের মাথা! যদি এসেছ তো বসে পড়ো, গড়াগড়ি দাও। এখুনি পালাবে কী? বারোটার এখনো ঢের বাকি।

মৃদু-মদির কটাক্ষে হাসল তিনকড়ি। এখনো শরীর যেন নৃত্যের মত উপযুক্ত তপ্ত হয়নি। বেশ একটু শীত শীত করছে না? কৌশলে শালটাকে কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াল। কার শাল কে জড়াল এসব কেউ লক্ষ্যেই আনল না। তিনকড়ি যা করে, শাল গায়েই রাখে বা ফেলে দেয়, সমস্তই সাবলীল, সমস্তই অনবদ্য।

এই একটু আসি চাঙ্গা হয়ে—মৃদু-মদির কটাক্ষ বুলিয়ে তিনকড়ি উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

'কোথায় গেল তিনকড়ি?'

'পাশের ঘরে। আরো খানিকটা টেনে আসতে।'

সকলে হেসে উঠল। সন্দেহ কী, তিনকড়ি ঢের বেশি সম্ভ্রান্ত। এ সব বাজারবেপারী হেঁজিপেঁজিদের ভিড়ে বসে সে পানাহার করতে পারে না।

ঠিক বলেছ। তিনকড়ি যা-ই করে, বসে বা ওঠে, থাকে বা চলে যায়, সমস্ত সুন্দর। সমানসুন্দর।

'তা ছাড়া ঐ ঘরে তার নাটের গুরু, ম্যানেজার আছে।' বাগানবাবু বললে বিহ্বল কণ্ঠে।

'কে ম্যানেজার?'

'শোনো, ম্যানেজারকে চেনে না। সমস্ত থিয়েটারের চাবিকাঠি যার হাতে সেই ম্যানেজার একমেবাদ্বিতীয় গিরিশ ঘোষ।'

কিন্তু তিনকড়ি কি একটু বেশি দেরি করে ফেলছে না? বাগানবাবু তাকাল ঘড়ির দিকে। মিনিট পনেরো হয়ে যায়নি কি?

'আর রাজু? রাজেন কোথায়?' বাগানবাবুর সঙ্গে সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল।

'এখানে শাল রেখে গিয়েছিল, সে শালই বা কোথায় গেল?'

'বোধহয় সেও পাশের ঘরে টানতে গেছে।'

'যাও, ওকে ধরে নিয়ে এস।' বজ্রকণ্ঠে হুকুম ছাড়ল বাগানবাবু।

কয়েকজন ত্বরিত পায়ে চলে গেল পাশের ঘরে। কই রাজেন কই? তিনকড়িও বা কোন্ চুলোয়?

'আর ম্যানেজার?' বাগানবাবু আর্তনাদ করে উঠল।

ম্যানেজারও অদৃশ্য। ঘর ফাঁকা। শূন্যের চেয়েও শূন্য।

ফকিরের আনা ঘোড়ার গাড়িতে করে তিনজন তখন বড় রাস্তায় এসে পড়েছে—গিরিশ, রাজেন, তিনকড়ি।

'কি, বলেছি না? সমস্তই ভগবৎ-ইচ্ছা, ভগবৎ-কৃপা।' গিরিশ বিশ্বাসভরা চোখে তাকাল রাজেনের দিকে। বললে, 'মানুষ জপায়, বিধি মাপায়।'

বাগবাজারের কেদার বোস, পাড়ায় 'কটি মামা' নামে খ্যাত, গিরিশের সঙ্গে চলেছে গাড়ি করে, আপার চিৎপুর রোড দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

হঠাৎ মদনমোহনতলার কাছাকাছি এসে কেদার বললে, 'ডাইনে সক্ স্ট্রিট দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে গেলে আমার সুবিধে হয়।'

'না, না, যেমন যাচ্ছে তেমনি যাক।' গিরিশ আপত্তি করল : 'তোমায় ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেব।'

'ডাইনে দিয়ে গেলে আমার অনেক সময় বাঁচে।' কেদার ফের পিড়াপিড়ি শুরু করল।

'যিনি বাঁচাবার তিনি না বাঁচালে কিছুই বাঁচে না। সময়ও বাঁচে না।'

কেদার সরোষে বললে, 'এ সব আপনাদের প্রেজুডিস।'

'বেশ, তবে চলো, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।' গিরিশ গাড়িকে সক্ স্ট্রিট দিয়েই যেতে বলল।

সক্ স্ট্রিটের শেষে গঙ্গার দিকে যাবার পথের মাঝখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি পোর্ট-ট্রাস্ট রেলওয়ে লাইন। ঐ লাইনের উপর একখানা মাল-বোঝাই ট্রেন দাঁড়িয়ে। রাস্তা বন্ধ।

গিরিশদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দেখলে তো?' গিরিশ বললে, 'এখন যাই কি করে?'

'দুচার মিনিটের তো ব্যাপার।' কেদার বিজ্ঞের মত মুখ করল : 'এখুনি লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

দু'চার মিনিটে লাইন ক্লিয়ার হল না। দশ-বারো মিনিটেও না।

'তখন বলেছিলাম না, তুমি-আমি কোনো কাজের কর্তা নই,—ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস, মানুষ জপায় বিধি মাপায়।' গিরিশ গম্ভীর হল : 'কী হে ফিরে যাবে, না, আরো সময় বাঁচাবে?'

নতমুখে কেদার বললে, 'ফিরে চলুন।'

কিন্তু বাগানবাড়ি কি সত্যি ছেড়ে দিয়েছে গিরিশ? সিঁথির বাগানবাড়ি বন্ধ হয়েছে সত্যি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ি অহোরাত্র খোলা।

রাতের সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়েছে গিরিশ। কিন্তু এত রাতে কোন্ বাগান খোলা আছে গিরিশের জন্যে?

নিজের থেকেই বলে উঠল গিরিশ : 'শুধু রাসমণির বাগান খোলা আছে।' চলো সেই বাগানে চলো। সেই বাগানেই মিলবে নতুন মদ, নতুন নেশা। নেশা কাটিয়ে দেবার নেশা।

দরোয়ানকে দিয়ে গেট খোলালেন ঠাকুর। এক হাতে গিরিশকে ধরলেন, আরেক হাতে তার সঙ্গিনীকে। বল হরিবোল হরিবোল। হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলেন তিনজনে। বল হরিবোল হরিবোল।

'সুরা পান করি নে রে সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমায় মন মাতালে মাতাল করে
মদ মাতালে মাতাল বলে॥'

আরেক নেশা পেয়ে বসল গিরিশকে। মদ ছাড়া যায় কিন্তু হরিরসমদিরা ছাড়া যায় না। চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী। মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥

ঠাকুর বললেন, 'ছেলে বলেছিল, বাবা, তুমি একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে। বাপ খেয়ে বললে, তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

'হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।
একবার লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে॥
হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে॥'

আর গিরিশের নিজের গান শোনো :

'যদি শরণ নিতে পারি রাঙা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায়॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায়॥
যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে
অভয় চরণ তার তরে আছে।
ডাকো পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায়॥'

'অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই হীনস্থানে জন্ম হয়েছে।' গিরিশকে বললে তিনকড়ি, 'বলতে পারেন কী হলে এই জন্মযন্ত্রণা শেষ হবে?'

'শুধু তাঁকে ডাকো। তিনি পতিতপাবন, তিনিই পতিতাকে পায়ে স্থান দেবেন।' বললে গিরিশ।

'কত ভালো ভালো লোক তাঁকে ডাকছে', তিনকড়ির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে : 'তার মধ্যে আমার মত দীনহীনার ডাক কি তিনি শুনতে পান?'

'নিশ্চয়ই পান। নইলে তোমার চোখে জল কেন?' বললে গিরিশ, 'তাঁর কাছে পাপী তাপী নেই, দীনহীন নেই। এমন কোনো পাপ নেই যা হরিনামে না স্খালন হয়। হরিনামই হরি।'

হরিনামকীর্তনই ভক্তিরাজ্যের মহারাজচক্রবর্তী। 'কলিকালে নাম রূপে

কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার॥'

'হেন পাপ নেই যা করি নি।' বলছে গিরিশ, 'কিন্তু আমি যে আমি, আমিও তরে গেলাম। যদি জানতাম তরে যাব তা হলে আরো পাপ করে নিতাম।'

নিরঞ্জনানন্দ স্বামী এসে বললে গিরিশকে, 'ঠাকুর তো তোমাকে সন্ন্যাসী করেছেন, ঘরে থেকে আর করবে কী? চলো দ্বজনে কোথাও চলে যাই।'

গিরিশ বললে, 'তোমরা ঠাকুরের সন্তান, তোমরা যা বলবে তা ঠাকুরেরই কথা জ্ঞান করে আমি করতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছে করে আমার সন্ন্যাসী হবার ক্ষমতা নেই, কারণ ঠাকুরকে আমি বকলমা দিয়েছি।'

'তবে আমি বলছি, চলে এস।'

'চলো।' নগ্নপদে একবস্ত্রে বেরিয়ে এল গিরিশ। মিলল সন্ন্যাসী গ্বর্‌-ভাইদের সঙ্গে।

কিন্তু যাই বলো, গিরিশ কি পারবে ভিক্ষাটনের ক্লেশ সহ্য করতে? আর-আর সন্ন্যাসীরা লাগল বলাবলি করতে। পারবে না, এ বয়সে পারবে না। শরীর শেষ হয়ে যাবে। ওর মত বিশ্বাসী ভক্তের কী দরকার আছে ঘর ছাড়ার? তার চেয়ে চলো জয়রামবাটিতে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসি।

তবে তাই চলো।

॥ চব্বিশ ॥

'সিরাজদ্দৌলা'র পর 'মীরকাশিম' লিখল গিরিশ।

সারদানন্দ স্বামীকে লিখছে: 'যতদিন কলকাতায় আছ রোজ একবার করে আসবে। তোমাদের দেখলে ভালো থাকি। অনেকদিন ঠাকুরের কথা হয়নি। মীরকাশিম নাটক লিখছি, কেবল ষড়যন্ত্র, কেবল ষড়যন্ত্র। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।'

'মীরকাশিমে' নবাবের ডাক্তার ফ্বলারটনের প্রাণদণ্ড রহিত হল। ম্বক্ত হয়ে আক্ষেপ করতে লাগল ফ্বলারটন। বললে, 'বাউটনও ইংরেজ ডাক্তার ছিল। সম্রাট সাজাহানের মেয়েকে চিকিৎসা করে আরোগ্য করেছিল। বদান্য বাদশা তাকে প্বরস্কার দিতে চাইল। বাউটন অনায়াসে ক্রোরপতি হতে পারত কিন্তু সে নিজের জন্যে কিছ্ব চাইল না। ট্রু-বর্ণ ইংলিশম্যান নিজের স্বার্থ না দেখে জাতের স্বার্থ দেখলে। ইংরেজরা যাতে বিনাশ্বল্কে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারে তারই সনদ চেয়ে নিল। আমিও ইংরেজ ডাক্তার, আমিও চিকিৎসা করে নবাবের বেগমকে আরাম করলাম, কিন্তু আমার ভাগ্যে এ কোন প্বরস্কার! স্বদেশবাসীদের হত্যা দেখবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে, আমার প্রাণদণ্ড মকুব করে দিলে।'

আর হে-সাহেব বলছে :

'হামরা ঘরের মধ্যে ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, ডুয়েল লড়ে; লেকিন, দুসরা যখন দুষমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। ইণ্ডিয়া হামাদের সব শিখিতে পারিবে, এইটা কখনো শিখিতে পারিবে না। জাতের দুষমন সবার দুষমন, এ ইণ্ডিয়ান লোক কখনো শিখিবে না।'

গিরিশকে হাঁপানিতে ধরল।

শীতকাল, অসুখে পঙ্গু অবস্থায় ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে গিরিশ, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ এসে ধন্না দিয়ে পড়ল : 'আমাদের একটা নতুন নাটক লিখে দিন।'

গিরিশ বললে, 'আমার শরীরের এই হাল—'

তা কোন তারা না দেখছে! কিন্তু গিরিশের মনের বলের খবর তো কারুর অজানা নয়।

'সব থিয়েটারেই নতুন বই হচ্ছে। শুধু আমরাই কিছু করতে পারলাম না।' কর্তাব্যক্তিরা বিষাদের সুর ধরল।

'যান, ভাববেন না। যা হোক একটা করে দেব।' মনের জোরেই আশ্বাস দিল গিরিশ।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের নাটক অবলম্বন করে একটা প্রহসন দাঁড় করিয়ে দিল। নাম রাখল 'য্যায়সা-কা ত্যায়সা'।

মেয়ে পর হয়ে যাবে সেই ভয়ে বাবা মেয়ের বিয়ে দেবে না ঠিক করেছে। বলছে, 'বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ, বিশ হাজার গয়না, হীরে-মানিক, সোনা-রুপোর খাট-বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি! চোর-দায়ে ধরা পড়েছি—সাদি নেহি দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে কভি নেহি দেঙ্গা! জাত যাঙ্গা? যাঙ্গা! বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের বেটা নবাব জামাই বাড়ি নিয়ে যাবেন! আবার দানসামগ্রী দাও; টাকা দাও—সে পাত্র আমি নই। সে পাত্র আমি নই।'

তারপর মেয়ের অসুখ করেছে। যত রকম চিকিৎসক আছে আসছে। গোবৈদ্য ভেটারিনারি, বেদিনী, জোঁকওয়ালি, ধাত্রী—এমনকি ড্রেসার পর্যন্ত। তারপর এল হাকিম আর কবরেজ। রাহু-কেতু কাটল তো এল দুই য়্যালো-প্যাথিক ডাক্তার—শনি আর মঙ্গল। এ রোগের নাম বলে 'ক্যাকহেকসিয়া,' ও বলে, 'য়্যাসফিকসিয়া।' এ বলে বমি করান, ও বলে জোলাপ দিন। তুমুল ঝগড়া। তারপর ওরা গেল তো এল হোমিওপ্যাথ।

'দাঁড়ান. বই খুলে সিমটম মিলুচ্ছি।' হোমিওপ্যাথ বলছে, 'বলতে পারেন শুয়ে ক'বার পাশ ফেরে? ভ্রুর উপর মাছি বসে কি না?'

বাড়ির ঝি বলছে, 'আমি বলছি। ঘুমিয়ে পাশ ফেরে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, মশা কামড়ালে গা চুলকোয়, মাছি বসলে তাড়ায়—আর তোমার মত ডাক্তার পেলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।'

প্রহসন ছেড়ে গিরিশ আবার চলে গেল ঐতিহাসিকে। এবার শিবাজীতে।

লিখল 'ছত্রপতি শিবাজী।'

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার ডাক। দেশবাসীকে একত্র করো, আর কিছুতে না পারো, দেশমুক্তির ঐকান্তিক স্পৃহায় সকলকে একসূত্রে বাঁধো, তারপর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। মরতে হয় তো মরো, সর্বস্ব ত্যাগ করো, যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতাকে কায়েম করো।

তাই করল শিবাজী। রামদাস স্বামী তাকে আশীর্বাদ করল : যেখানেই স্বাধীনতার অভ্যুদয় সেখানেই তোমার উৎসব হবে, সেখানেই তুমি অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করবে। আর তোমার সম্মানে আমিও সম্মানিত হব।'

ইংরেজের এ নাটক ভালো লাগল না। বাজেয়াপ্ত করল।

তেমনি 'সৎনাম' বন্ধ হল মুসলমানদের আন্দোলনে।

আওরঙ্গজেবের জিজিয়া-করের বিরুদ্ধে সৎনামী হিন্দুদের বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে এই নাটক। তেজস্বিনী রাজপুতরমণী বৈষ্ণবী এই বিদ্রোহের নেত্রী, তারই প্ররোচনায় মাঠ ছেড়ে সব চাষাভুষো সৈন্য হয়ে গিয়েছিল। শেষে বাদশার হিন্দু-সেনাপতি বিষণ সিংহের কাছেই পরাস্ত হ'য়ে গেল।

ফকিররাম ছিল সৎনামীদের 'রুদ্র অবতার হনুমান।' নগরবাসী হিন্দুদের বলছে, 'ধর্মের ভান করে হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা বাসা বেঁধেছে। যদি বলবান হতে তবে তোমার মার্জনার অর্থ থাকত। তা নয়, তোমার মার্জনা ভয়ে, মুসলমানদের কাছে পরাভূত হবে এই ভয়ে মার্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পুড়তে চাচ্ছ অথচ তার সম্মুখীন হতে সাহসী হচ্ছ না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কী পরিচয় দেবে? হায়, মাতৃভূমির দুঃখে শোণিত দান করে এমন একজনও' সর্বত্যাগী নেই।'

'দুর্বল হৃদয়ে কাঁদব কেন?' বলছে বৈষ্ণবী, 'নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন, আমি মোগল বধ করব।'

ধর্মগুরু মহান্তকে ফকিররাম ব্যঙ্গ করছে : 'কেন মহান্তজী, তোমরা তো টোল করে শিক্ষা দিচ্ছ নির্বাণ লাভ করো, যদি কেউ মারে সে কিছু নয়, সে স্বপ্নমাত্র। বাড়ি কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন, কিছু নয়—মায়া। শুধু নির্বাণ হওয়ার চেষ্টা করো।'

'আচ্ছা ফকির, তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ', বলছে মহান্ত, 'কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?'

'কে বলে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা!' বলছে ফকিররাম, 'মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জানতেন, অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুষ্যাকারে গাছ-পাথর হবে, জড়ের মত সকল অত্যাচার সহ্য করবে, বিচলিত হবে না, তা হলে বোধহয় তাঁরা শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন আর তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। আপনার কি ধারণা যে হিন্দুরা সব সত্ত্বগুণী, তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়, চোখ খুলে দেখুন, দেশ ঘোর তম-তে আচ্ছন্ন, অলস কুম্ভকর্ণের মত জড় হয়ে পড়ে আছে। রজোগুণ ছাড়া তমোগুণ নাশ হবার নয়। জড় তমোগুণের কি চৈতন্য

আছে? আমাদের চেয়ে মুসলমান শ্রেষ্ঠ, তারা তম-তে আচ্ছন্ন নয়, তারা রজোগুণী বীরপুরুষ। জড় অলসেরা নয়, বীর রজোগুণীরাই সত্ত্বগুণ লাভ করতে পারে।'

এ সব যেন বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

কুড়ুলগাছির জমিদার শরৎ রায় এমারেল্ড থিয়েটার কিনে বসল। গিরিশকে বললে, 'আপনি চালান। আপনি ম্যানেজার হোন।'

'কত দেবে?'

'চারশো টাকা মাইনে আর বোনাস দশ হাজার টাকা।'

মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে গিরিশ চলে এল এমারেল্ডে।

এমারেল্ডের নতুন নাম হল কোহিনুর। গিরিশের তত্ত্বাবধানে প্রথম বই নামল ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি।

প্রথম রাত্রেই দারুণ সাফল্য। প্রায় আড়াই হাজার টাকার টিকিট বিক্রি।

কিন্তু সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হল না। ছ মাস যেতে না যেতেই শরৎ রায় মারা গেল। গিরিশেরও হাঁপানি বাড়ল। শরতের ভাই শিশির এসে হাল ধরতে চাইল, এসেই গিরিশের মাইনে বন্ধ করলে। হাঁপানির রুগী, কত আর সক্ষম হবে ম্যানেজারিতে। তার উপর তিন মাস একটাও নাটক লেখেনি।

দাঁড়াও 'ঝান্সির রানী' লিখে দিচ্ছি।

কথাটা রাষ্ট্র হতেই পুলিশের কানে গেল। উঁচুস্তরের এক কর্মচারী গিরিশের সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, 'ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন না। ছত্রপতি শিবাজী বন্ধ হয়েছে, সিরাজদ্দৌলা আর মীরকাশিম বন্ধ হয়েছে, এটারও সেই দশা হবে। আপনার কলম তো কলম নয়, আগুনের চাবুক। ইংরেজের মর্মশূল।'

'বেশ, তা হ'লে সামাজিকই লিখব।'

তিন মাসে চার অঙ্ক শেষ হয়েছে, গিরিশের চেতন হল, মাইনে পাচ্ছে না।

'মাইনে কই?'

শিশির এক বিন্দুও ঝরল না।

গিরিশ তখন কোর্ট করলে। ডিক্রিজারিতে আদায় করল বকেয়া পাওনা।

কোহিনুর ছেড়ে আবার ফিরে এল মিনার্ভায়। মাইনে চারশো আর নীট লাভের পঞ্চমাংশ।

'শান্তি কি শাস্তি' লিখল।

'এক জীবনে এত হয়?' নাটকের নায়ক প্রসন্নকুমার বলছে, 'এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারির আবাসে ভিখারিনি, ফৌজদারি আদালতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, হৃদিভঙ্গ হয়ে স্ত্রীর মৃত্যু, রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়, যারা পদলেহন করেছে তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে আপনাদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়, হাতে হাতকড়ি, বিমল পুত্র-বধূকে বর্বরে টেনে আনে, খুনে অপবাদ দেয়—এক জীবনে কি এত হয়?'

মদ নেই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই—প্রসন্নকুমারের শান্তি কোথায়? আশ্চর্য, মৃত্যু তো আছে। যদি মৃত্যুও না থাকত! এমন যদি হয় এই ভূতের রাজ্যে যদি আকস্মিক অমর হয়ে থাকে প্রসন্নকুমার! মৃত্যু দুর্বিষহ, আবার মৃত্যু সুখাবহ! ভাগ্যিস মৃত্যু বলে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল! নইলে, সবই যখন এখানে এলোমেলো তখন একজন যদি ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকত চিরকাল! সেটি হবার নয়। হে ঈশ্বর, তোমার কি করুণা, প্রসন্ন-কুমারও মরবে।

একদিকে এই ট্রাজিডি, অন্যদিকে আবার প্রহসন।

এংলো-ব্যাংলোদের নিয়ে গান হচ্ছে :

'এরা বাছা বাছা সাচ্চা জানোয়ার!
দিশি কি বিলিতি ছাঁচে আঁচে বুঝে ওঠা ভার।
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতি কচুর গোড়া, দৌড়টা খুব চটকদার॥
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে, বেরিয়ে এল জাহাজ চ'ড়ে।
কে জানে কে খেল্ শেখালে খেল্ খেলে খুব চমৎকার॥
ইটি ঠিক বাঁদর খাঁটি, ভিরকুটিতে পরিপাটি,
এক ধরনের জন্তু কটি, এরও নাচের বেশ বাহার॥
গাধা কিন্তু ছিল হেথায়, ধাত পেয়েছে গা ঘ'সে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়, গাধার হয়েছে সরদার॥
আধ-বিলিতি আধ-দিশি ঢং, দোআঁসলা নাচন-কোঁদন,
ভাবি তাই লেজ কেন নাই, এইটি তো ভুল বিধাতার॥'

রোগের প্রকোপ বেড়ে চলল, গিরিশ হাওয়া-বদলের জন্যে চলে এল কাশীধাম। কোথায় নিজের অসুখ সারাবে তা নয়, অন্যের অসুখে হোমিও-প্যাথি করতে লাগল। গিরিশের নাম আর তখন গিরিশ নেই, নাম এখন 'ডাক্তার-সাব্'।

'দেখ অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনো মমতা নেই', নিজের সম্পর্কে বলছে গিরিশ : 'এই দেহের পুষ্টির জন্যে কত তাকে উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে সাজিয়েছি গুজিয়েছি—এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানিকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে। সত্যিই আমার প্রাণের ইচ্ছে নয় যে এ রোগ সেরে যায়। হাঁপানির প্রত্যেক টানে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জগদীশ্বর, তুমি মঙ্গলময়, যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিশ্বাস থাকে।'

পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলে, 'ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়?'

মহাদেব বললে, 'বিশ্বাসই এর খেই।'

'বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই।'

হ্যাঁ, আমার মা আছেন আর আমি আছি, শুধু এই বিশ্বাস।

'আর আমার মা আনন্দময়ী।' বলছেন ঠাকুর, 'সংসারে তাঁর নিত্য উৎসব

চলেছে। যেন সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিরানন্দ হয়ো না। ঐহিকের সুখ-দুঃখ আছেই, তা থাকুক। আমাদের মা আছেন, আনন্দ করো। ঝি এর ছেলে ভালো খেতে পায় না, পরতে পায় না, বাড়ি নেই ঘর নেই, তবু বুকে জোর আছে, তার মা আছে। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা তো নয় সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কী হবে। কোথায় যাব, সব মা জানেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার হয় মা জানাবেন। অত কে ভাবে! মায়ের ছেলে শুধু আনন্দ করো।'

ঈশান মুখুজ্জে এসেছে।

ঠাকুর বলছেন, 'ঈশানের খুব বিশ্বাস। বলে একবার যে দুর্গা নাম করে বাড়ি থেকে যাত্রা করে তার সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। বিপদে ভয় কি! শিব নিজে রক্ষা করেন। হ্যাঁ, সত্যি কথা। শুধু বিশ্বাসেই তাকে পাওয়া যায়।'

আজ্ঞে হ্যাঁ।'

যেমন গিরিশ পেয়েছে।

রোগ আছে, উপশমও তো আছে। রোগ আমার স্বকৃতকর্মের বিপাক কিন্তু উপশমই ঈশ্বরের করুণা।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গিরিশকে বললে, 'পাপের জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্তবিধির এই উদ্দেশ্য।'

গিরিশ মৃদু হাসল। বললে, 'প্রার্থনার আগেই তো তিনি ক্ষমা করে বসে আছেন। সংসারের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের অপরাধ হচ্ছে। তিনি দোষ গ্রহণ করলে মানুষের সাধ্য কী এক মুহূর্ত স্থির থাকে।'

দূর দূরান্তর থেকে রুগী আসে গিরিশের কাছে, কত জটিল-কুটিল রোগ, 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ তুলে এক ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছে, তাইতেই রোগের আরাম।

রামকৃষ্ণই কল্পতরু।

গিরিশ ঠাকুরের কুষ্ঠি দেখছে।

'আপনার কুষ্ঠি দেখছি।'

ঠাকুর বললেন, 'দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি চন্দ্র বুধ—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নেই।'

'কুম্ভ রাশি কর্কট আর বৃষ' বললে গিরিশ, 'রাম আর কৃষ্ণ। সিংহের চৈতন্যদেব।'

'দুটি সাধ ছিল, প্রথম ভক্তের রাজা হব, আর দ্বিতীয়, শুঁটকে সাধু হব না।'

'আচ্ছা আপনার সাধন করা কেন?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

'শিবের জন্যে ভগবতীকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল,' বললেন ঠাকুর, 'পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা, সূর্যের দিকে চেয়ে থাকা একদৃষ্টে। স্বয়ং কৃষ্ণ রাধামন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। ব্রহ্মযোনি, তাঁরই পূজা, তাঁরই ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকেই কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।'

যেদিন কল্পতরু হলেন জিজ্ঞেস করলেন গিরিশকে, 'তুমি যে অত কথা

যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছ আমার মধ্যে তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?'

সকলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল গিরিশ। হাত জোড় করে গদগদস্বরে বললে, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি আর কী বলতে পারি।'

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। দিব্যদীপ্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হল।

গিরিশ চেঁচিয়ে উঠল : 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

আর সকলেও সমবেত রোল তুলল : 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

ঠাকুরের অসুখ ভীষণ বেড়েছে, কিন্তু কই গিরিশ তো তাঁকে দেখতে আসে না।

সেই একদিন এসেছিল, এসে হিসেবের খাতা পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। গৃহী-ভক্তদের আনাগোনা বাড়ছে বলে খরচও বেড়ে যাচ্ছে, সন্ন্যাসী ভক্তরা অত কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তারপর হিসেবের খাতা লেখা—এ তাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা সেবা করবে, টাকা-পয়সার ধার ধারবে না।

গিরিশের কাছে খবর গেল। গিরিশ এসে হিসেবের খাতা পুড়িয়ে ফেলল। বললে, 'মাস খরচায় যা বাকি পড়বে তা আমি দেব।'

টাকা দিচ্ছে বটে কিন্তু আসছে না একটিবার।

'আসবে কি রে', ঠাকুর বললেন কাতর মুখে, 'সে যে আমার যন্ত্রণা দেখতে পারে না।'

ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন কে এক ভক্ত গিরিশকে খবর দিতে এল।

গিরিশ বললে, 'মিথ্যে কথা। ঠাকুরের মৃত্যু নেই।'

'আমি যে মশাই সেখান থেকে আসছি।'

'সেইখানেই তবে ফিরে যাও।'

'আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলুম।'

'তোমার যা খুশি তা তুমি বলো।' গিরিশ চোখ ঢাকল : 'আমি দেখিওনি, বিশ্বাসও করি না।'

শেষ শয্যার ঠাকুরের একখানি ছবি কে নিয়ে এসেছে গিরিশের কাছে। গিরিশ আর্তনাদ করে উঠল : 'ও ছবি আমি দেখব না।'

নরেন এসেছে। ঠাকুর সম্পর্কে গিরিশের রচিত গান গাইছে ললিত সুরে :

> 'দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে
> কে রে ওরে দিগম্বর, এসেছে কুটির-ঘরে।
> ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছে একা
> বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥
> ভূতলে অতুলমণি, কে এলি রে যাদুমণি,
> তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে॥
> মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
> হৃদয়সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদি পরে॥'

ঐতিহাসিক নাটক পুলিশে পাশ করানো কঠিন, তাই গিরিশ 'শঙ্করাচার্য' লিখলে।

নাটক উৎসর্গ করল যৌবনসুহৃদ কালীপদ ঘোষকে বা দানাকালীকে। লিখল : 'আমরা উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ তুমি নরদেহে আমার শঙ্করাচার্য দেখলে না।'

ব্রাহ্মণপণ্ডিত গিরিশকে লিখে পাঠালেন : 'যিনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্মমর্ম জলের মত বুঝিয়ে দিলেন তিনি যে ঈশ্বরানুগৃহীত তাতে আর সন্দেহ নেই।'

॥ পঁচিশ ॥

কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে শঙ্করাচার্য স্নান করতে এসেছে। দেখল একটা চণ্ডাল কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অস্পৃশ্য চণ্ডাল। শঙ্কর বললে সরে যেতে।

চণ্ডাল সবিস্ময়ে বললে, 'আরে কেমনধারা বাৎ বলে রে? কে কাকে কোথায় সরতে বলছে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে। সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ-রূপটা চেনে না, চৈতন্যকে ফারাক করে! ও কেমন মানুষটা রে? ওর আক্কেলটা তো দেখি না।'

শঙ্কর তো স্তম্ভিত। নিজের মনে প্রশ্ন করছে : 'কে এ চণ্ডাল? এ যে বেদনির্ণীত বাক্য প্রয়োগ করছে! সত্যিই তো, অসঙ্গ সৎ অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর তো ভেদ নেই।'

'আরে থোড়া-থোড়া আক্কেল বুঝি আসছে রে কেলো!' সঙ্গের কুকুরকে সম্বোধন করে বললে চণ্ডাল, 'বল তো—গঙ্গাজীতে সূর্য আর হাঁড়িয়ার সরাপে যে সূর্য চমকে, ও কি জুদা সূর্য? ও বাৎটা বোঝে না। বোঝে না সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির বিচে আকাশটা জুদা-জুদা বলছে। ও তো ফারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?'

'আরে কে বটে রে—কে বটে?' ঘাটে কতগুলো দলের স্ত্রীলোক ছিল, কোলাহল করে উঠল।

'কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল—এ সন্ন্যাসী, ও কি বলে রে?' চণ্ডাল বললে, 'আঁধারে এককে নানান দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে। এক জানে না, জুদা জুদা জানে।'

শঙ্করের চৈতন্যোদয় হল। এক ব্রহ্মই তো সর্বঘটে অধিষ্ঠিত। সন্ন্যাসী-চণ্ডালে প্রভেদ কোথায়? শ্মশানে-ভবনে তৃণে-হিরণ্যে পরে-আপনে সর্বত্রই সেই এক অদ্বৈতপুরুষ। বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ চিনল শঙ্কর, চণ্ডালবেশী

মহাদেবের স্তব করতে লাগল।

'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশি।
মান-অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।
এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে
বোম ভোলা বলে কেন, নাও না যেচে যা খুশি।
যা ফেলে দেছে নেয় সে বেছে ভাল মন্দ নাই হুঁস-ই॥'

তারপরে গিরিশ 'অশোক' লিখল। তারপরেই 'ঝকমারি'।

'ঝকমারি'র প্লট অবিনাশ গাঙ্গুলির। প্লট শুনে গিরিশ বললে, 'তুমি ওটা নিয়ে একটা প্রহসন লেখ।'

'কিন্তু গান?'

'গান আমি বেঁধে দেব।'

অবিনাশ নাটক লিখে নিয়ে এল গিরিশের কাছে। গান বাঁধতে গিয়ে গিরিশ দেখল আমূল সংশোধন দরকার। প্রায় খোল-নলচে বদলে গেল গিরিশের হাতে। মিনার্ভায় নামাবার আগে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল এ প্রহসন গিরিশের রচনা। এ জালিয়াতি সহ্য করল না গিরিশ। বই ছাপা হলে ভূমিকায় সত্যকথা প্রকাশ করে দিল। গানগুলো আমার বটে, গল্পাংশ ও সংলাপ মূলতঃ অবিনাশের।

প্রস্তাবনায় আড়খেমটায় কবি'র সুরে গান হচ্ছে :

'ভিটে বেচে পথে যদি বসতে চাও।
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও।
বলে দিই তোমায়, শামলা যার মাথায়,
ধরবে গে তার পায়, ভিটে বেচবার বাতলাবেন উপায়,
গামলা ভরে ছোবড়া দেবে, যত পারবে তত খাও॥
জয়েণ্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশি আর
পার্টিসন সুট লাগিয়ে দাও দেদার—
বউগুলো হন্নে হয়ে, হাড়মাস ফেলবে খেয়ে
বাধিয়ে দেবে ঠিক ভেয়ে-ভেয়ে—
রয়েছে পাওনা দেনা রাখবে জেদ—মেটাবে না,
গ্রাটিসে পেঁয়াজ-পয়জার মরদ হও তো কিনে নাও॥'

মামলার সাক্ষীরা গান গাইছে :

'আমাদের তালিম দিতে হয় না আর
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর
ঘাড়ে চেপে বসি যার॥
জোটে না মুড়ি ঘরে, মোণ্ডা ফেলি থু-থু করে,
বসি যে বায়না ধরে, পেতে দেরি হয় না তার॥
ধুতিচাদর কামিজ জুতো, সেমিজ শাড়ি মিহি সুতো,
চোখ রাঙানি দিই পেলে জুতো—

উড়ছে মজা আফিং গাঁজা, দুধে বাটা সিদ্ধি তাজা
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা—
কাণ্ট্রি লিকার ঢালো দেদার
চাট খেয়ে নাও যে সখ যার॥'

তারপরেই শেষ গান :

'মামলা করা ঝকমারি
সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো, দেখতে পেলে কাছারী!
মামলায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে
'ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে,
সাক্ষী আমলা, মোক্তার শামলা, তেলা হাত চাই সবারি॥
কাছারীর মাটি হাঁ ক'রে, চলতে গেলে কামড়ে পা ধরে,
চালচুলো সব পোরে উদরে—
লাগলে পরে ছাড়ে নাকো আইনের ভেল্কি ভারী॥
ছাড়লে তো হাড়ীর বেহাল, জিত হলে সমান নাকাল,
ধুয়ে খাও ডিক্রি নিয়ে, মামলাকে বলিহারি॥'

'তুই কে?'

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিকে প্রণাম করে চোখ চাইতেই গিরিশ দেখল একটি ছোট মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে গিরিশ : 'কে তুই?'

'আমি তারা।' উজ্জ্বল চোখে বললে সেই মেয়ে।

'তুইই বুঝি সরলা-নাটকে গোপাল সাজিস?' মেয়েটার মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখল গিরিশ।

'হ্যাঁ, আনন্দে উছলে উঠে তারা বললে, 'তার আগে নসীরামে ভীল বালক।'

তারাসুন্দরী অমৃত মিত্রের আবিষ্কার। অমৃত মিত্রকে লক্ষ্য করে গিরিশ বললে, 'এই মেয়েটাকে যত্ন করিস, এর মধ্যে জিনিস আছে।'

এই তারাসুন্দরীই সিরাজদ্দৌলায় জহরা, ছত্রপতি শিবাজীতে লক্ষ্মীবাঈ, অশোকে পদ্মাবতী, হরিশচন্দ্রে শৈব্যা, রিজিয়ায় রিজিয়া, চাঁদবিবিতে চাঁদবিবি।

এই তারাসুন্দরীকেই সারদামণি বললেন, 'তোমার থিয়েটারের একটা বীর-ভাবের পার্ট আবৃত্তি করে শোনাও।'

তারাসুন্দরী শোনাল আবৃত্তি করে। আর তিনকড়ি গান গেয়ে শোনাল। সেই বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর গান—'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।'

এরা, তারাসুন্দরী আর তিনকড়ি, ঠাকুর ঘরে ঢোকে না, মাঠাকরুনের পা-ও স্পর্শ করে না। গলবস্ত্র হয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে। মা তাদের প্রসাদ দেন, পান দেন। প্রসাদের উচ্ছিষ্ট জায়গা তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে, মার হাতের পান আলগোছে নেয় যাতে না ছোঁয়া লাগে।

'এদেরই ঠিক-ঠিক ভক্তি।' ওরা চলে গেলে বললেন সারদামণি, 'যেটুকু ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে। আহা, কি সুন্দর গান শোনাল তিনকড়ি! আর তারাসুন্দরী কি সুন্দর পাঠ বললে!'

কালীঘাটে কালীদর্শনের পরে নকুলেশ্বরের দিকে যাচ্ছেন, গৈরিকপরা এক ভৈরবী ত্রিশূল হাতে মায়ের পথরোধ করে দাঁড়াল। চকিতে গান ধরল : 'কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা, বল মা তাই।'

সঙ্গে যারা ছিল তাদের কাউকে মা বললেন ভৈরবীকে পয়সা দিতে।

ভৈরবী বললে, 'যার কাছে যা নেবার তাই নিতে হয়, মা। তোর কাছে যা নেবার তা আমি নিজেই নেব। তুই যেখানে যাচ্ছিস, যা।'

মা চলতে শুরু করলেন। দেখলেন ভৈরবী রাস্তা থেকে মায়ের পায়ের ছোঁয়া ধুলো তুলে মাথায় দিতে দিতে চলে গেল।

কী রকম আনমনা হয়ে গেলেন মা। বাসায় ফিরে এসে সন্তান-সেবকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ভৈরবীটি কে?'

সেবক বললে, 'গিরিশবাবুর থিয়েটারের কেউ হবেন বোধহয়। এখন ঐরকম হয়ে গিয়েছেন।'

কিন্তু গিরিশ কী রকম হল?

গিরিশ জয়রামবাটি গেল মায়ের কাছাকাছি হতে। সঙ্গে তিন সন্ন্যাসী—বোধানন্দ, সুবোধানন্দ আর নির্ভয়ানন্দ। আর এক রসুই বামুন আর চাকর।

মাকে গিরিশ প্রথম কবে দেখে?

বাড়ির ছাদে সস্ত্রীক বেড়াচ্ছে গিরিশ, হঠাৎ তার স্ত্রী বলে উঠল : 'ঐ দেখ, বলরামবাবুদের বাড়ির ছাদে মা দাঁড়িয়ে।'

প্রতিবেশী বলরাম বোস। এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির ছাদ স্পষ্ট চোখে আসে।

স্ত্রীর কথায় মুখ ফিরিয়ে নিল গিরিশ। বললে, 'না, না, আমার পাপনেত্র, ছাদ থেকে লুকিয়ে মাকে দেখব না। না, দেখব না।' বলতে বলতে ছুটে নেমে গেল নিচে।

তারপর বরানগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে যখন ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তখনও মার মুখ দেখেনি গিরিশ, দেখেছিল শুধু পা দু'খানি। কিন্তু আজ জয়রামবাটিতে সকালে স্নানান্তে ভিজে কাপড়ে মাকে প্রণাম করতে এসে কী দেখল? দেখল জগজ্জননী তাঁর সম্পূর্ণ মুখ তুলে বদান্য প্রসন্নতায় নিজেই তাকিয়েছেন তার দিকে।

'এ্যা, মা, তুমি?' গিরিশ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এ যে সেই মূর্তি যাকে ঘোরতর অসুখের সময় স্বপ্নে দেখেছিল গিরিশ, তার মুখে মহাপ্রসাদ দিচ্ছেন, যে প্রসাদ খেয়ে সে নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। সেদিন শরীরের রোগ সারিয়েছিলেন, আজ বুঝি জীবনের রোগ, জন্মজন্মান্তরের রোগ সারাতে এসেছেন। করুণার সুধাপদ্ম, মাতৃমুখখানি নিজেই উন্মোচিত করেছেন।

'মা, তুমি আমার কী রকম মা?' আকুল অশ্রুতে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।

মা বললেন, 'আমি তোমার সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি মা, সত্যিকারের মা।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দয়ারূপা দয়াদৃষ্টি দয়ার্দ্রা দুঃখমোচিনী। আমি তোমার অকিঞ্চন প্রজা, তোমার অকৃতী তনয়।

হেন পাপ কাজ নেই যা করিনি, হেন নেশা নেই যাতে মজিনি—বলছে গিরিশ—তবু ধুলো কাদা পুঁছে মা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। এ আমার গৌরব নয়, আমার মায়ের গৌরব।

'আমি পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি রে? ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, পাহাড় উড়ে যাবে।'

কী কী নেশা করেছেন? একজন অন্তরঙ্গ জিজ্ঞেস করল গিরিশকে।

'তামাক ঢের খেয়েছি, ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক? মদ গাঁজা আফিং চরস চণ্ডু ভাং—কী নয়, কোন্‌টা বাকি আছে?'

'মদ?'

'বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন তো বাইশ বোতল বিয়ার গিলেছিলাম। মদে কী হয় জানো? জোর করে মনকে ধরে রাখা যায়। সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে। তখন আবার সেই অবসাদ দূর করবার জন্যে আবার মদ খাও।'

'আর গাঁজা?'

গাঁজার স্তোত্র শুনেছ? শোনো :

> গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঞ্জা ত্বরিতানন্দদায়িনী।
> উচ্যতে প্রাকৃতৈর্গেজা ইতি তে নামপঞ্চকম্॥
> সদ্যঃ পাপৌঘসংহন্ত্রী সদ্যশ্চিন্তাবিনাশিনী।
> সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমা গতিঃ॥
> সংসারাসক্তচিত্তানাং সাধুনাং গঞ্জিকে সদা।
> দুশ্চিন্তাবিস্মৃতের্হেতুঃ তং হি লক্ষ্মীবিরোধিনী॥

'জানো, গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। আমি যখন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়েছি তখন বাস্তবিকই উইল-পাওয়ারে লোকের রোগ ভালো করেছি। কিন্তু, যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই।'

'এখন আর নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?'

'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না। এখন মাঝে-সাঝে দু' একটা সিগার খাই মাত্র। নেশাই মানুষের পরম শত্রু—অবশ্যি তামাকটা নয়।' গিরিশের কণ্ঠ আবেগে ভরে উঠল : 'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণাও যদি মদে-গাঁজায় থাকত!'

'ছাড়লেন কী করে?'

'ও কি আর সাধে ছেড়েছি? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'সুরেন মিত্তিরও ছেড়েছে নাকি?'

'নেশায় আমি ওর বড়দা ছিলাম।' হাসল গিরিশ : 'বড়দাই যখন ছেড়েছে তখন ছোট ভাইয়ের আর গতি কী! ঠাকুর ওকে অন্য কায়দায় ঘায়েল করেছেন।'

সুরেনের বাড়িতে কালী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সুরেন রোজ আফিস থেকে এসে স্নানাদি সেরে বিগ্রহের কাছে বসে স্তোত্র-পূজা করে আর এক গ্লাশ কারণ বারি সেবন করে। আসলে মদ, বলে কারণ।

সুরেনের বন্ধুরা ঠাকুরকে গিয়ে ধরল : সুরেনকে মদ খেতে বারণ করুন।

'কেন বারণ করব? ও ওর নিজের পয়সায় খায়, ওর ধাত আছে তাই পারে হজম করতে।' ঠাকুর ধমকে উঠলেন : 'তাতে তোদের কী মাথাব্যাথা?'

ওদিকে সুরেন বলছে, ঠাকুর যদি আদেশ করেন, ছেড়ে দেব।

ঠাকুর সোজাসুজি অমন নিষেধের কথা বলবেন না কাউকে। তিনি শুধু একটু বেঁকিয়ে দিলেন।

সুরেনকে ডাকিয়ে বললেন, 'তুমি মদ খাও কেন? ফুর্তির জন্যে তো?'

'তা ছাড়া আবার কী।' সস্মিত মুখে সলজ্জে সায় দিল সুরেন।

'কিন্তু মদে তো শুধু মধু নেই, মদে বিষও আছে।'

'তা কে অস্বীকার করবে?'

'আর তুমি মধুর জন্যেই খাচ্ছ বিষের জন্যে নয়। বিষ ধারণ করতে পারো এমন তোমার সাধ্য নেই। সুতরাং মদের বিষটুকু মাকে নিবেদন করে দাও, আর মধুটুকু তুমি খাও।'

সুরেন ঠাকুরের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

'খাবার আগে বিষটুকু মাকে নিবেদন করে দাও। ও বেটি বিষ খেতে ওস্তাদ। ও অনায়াসে খেয়ে নেবে বিষ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে মধু তুমি আস্বাদ করো।'

ব্যস, এইটুকু? এতে আর হাঙ্গামা কী? মদে মদ খাওয়া হবে, বিষে আর বিপন্ন হতে হবে না।

পরদিন যথারীতি কালীর সামনে মদের গ্লাশ নিয়ে বসল সুরেন। বললে, 'মা, বিষটুকু তুই নে আর মধুটুকু আমি খাই।' বলে ঢকঢক করে পুরো গ্লাশ উড়িয়ে দিল।

বিন্দুমাত্র ঝামেলা নেই। সমস্তই জলের মত তরল।

এক দিন দু' দিন তিন দিন, কোথাও এতটুকু বাধল না, গলা দিয়ে ঠিক নেমে গেল। চার দিনের দিন কী রকম যেন কানে লাগল—মা, বিষটুকু তুই নে, আর মধুটুকু আমি খাই। মনে ডাক দিল, আমি ছেলে হয়ে কাঁহাতক মাকে বিষ দেব? তা হলে এই কালী আমার মা নয়, আমার এত সব পূজাপাঠ বুজরুকি? আমি যদি মার সমর্থ সাবালক ছেলে হই, তা হলে স্বার্থপরের মত নিজে মধু খেয়ে কতদিন মাকে বিষ খাওয়াব? অসম্ভব। মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখল সুরেন। আর হল না মদ খাওয়া।

কিন্তু গিরিশের বেলায় তো শুধু নেশা ছাড়ানো নয়, নতুন নেশা ধরিয়ে দেওয়া। আর সে নেশার নামই সর্বনাশের নেশা।

ষোল আনার বদলে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেলার নেশা।

সকালে উঠে কৃষাণদের সঙ্গে আলাপ করতে মাঠে গিয়েছিল গিরিশ, ফিরে

এসে দেখল পুকুরঘাটে মা তার বিছানার চাদর সাবান দিয়ে কাচছেন।

গিরিশ স্তব্ধ অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে কী বলবে ভেবে পেল না। কাঁদবে না আনন্দ করবে সমস্ত তার বোধের অতীত হয়ে রইল। তার মত কলুষক্লিষ্ট লোকের বিছানার চাদর মা স্বহস্তে কাচছেন এতে যে তার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার ভাবছে কলুষক্লিষ্ট জেনেও মা তাঁর অসীম ক্ষমায় তাকে শুচিশুভ্র করে তুলছেন এতে তো আনন্দে প্রাণ বিভোর হয়ে উঠছে। বলো আমি কাঁদব না হাসব, মাকে বাধা দেব, না বলব আমার সমস্ত সত্তাকে মার্জনা করে পবিত্র করে তোলো।

'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি।' ঠাকুরের সেই করুণার কথা মনে করে কাঁদতে বসল গিরিশ।

গাঁয়ের চাষীদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে গিরিশের। তারা জেনে নিয়েছে গিরিশ নাটক করে, নাটক লেখে। আর গান যখন সে বাঁধতে পারে তখন গান গাইতেই বা কেন না পারবে।

'কত্তা, গান ধরো।'

'ওরে আমি গান লিখি, গাইতে পারি না।'

কেউ বিশ্বাস করে না সে কথা। তাই অনুপায় হয়ে গাইতে হয় গিরিশকে।

আর কী আশ্চর্য, দূর থেকে মা তাই শোনেন এক মনে। আরো আশ্চর্য, সেই শোনা গান নিজেই সেদিন গেয়ে ফেললেন :

'হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়,
রানী পাছে তোলে কোলে।
রানী কুতূহলে, ধর ধর বলে
হামা টেনে তত গোপাল চলে॥'

সকালে উঠে গাঁয়ের কারু বাড়ি গিয়ে দুধ জোগাড় করে আনেন মা।

'এত সকালে দুধ দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করে কেউ কেউ।

'গিরিশের জন্যে চা হবে। ওর যে সাত সকালে চা খাওয়া অভ্যেস।' বললেন মা।

সেই চায়ে কি শুধু দুধ আর চিনিই মেশে? না কি মেশে মার স্নেহ, মার অন্তরের মিষ্টি?

'মা, তোমার কাছে যখন আসি তখন আমার মনে হয় আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছি।' গিরিশ মায়ের পায়ে প্রণত হয়ে পড়ল : 'কিন্তু কই আমি তোমার সেবা করব, তা নয় তুমিই আমার সেবা কর। বলো আমি কি তোমার সেবা করতে পারি? আর আমি অশক্ত অসমর্থ, মহামায়ীর সেবার কি-ই বা জানি।'

'তুমি সন্তান, মার কাছে এসেছ, মা-ই তো সন্তানের সেবা করবে।'

গিরিশ কাঁদতে বসল।

তারপর সেদিন গিরিশ আর মা দু'জনেই কাঁদতে বসল যেদিন দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী এসে বেহালা বাজিয়ে গান ধরল :

'কি আনন্দের কথা উমে,
লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে-পরে
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে॥'

তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা, বলে কত মানুষ মার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি?

'আমি ইচ্ছে করলেই এ শেকল এখুনি কেটে দিতে পারি', বললেন মা, 'কিন্তু তা দিই না, দয়ায় দিই না, নইলে আমার আবার মায়া কী!'

॥ ছাব্বিশ ॥

'আমাকে কে ছুঁল?' যীশুখৃষ্ট পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে তা কি কিছু ঠিক করে বলা যায়?' বললে পিটার।

'আমোদ দেখতে অনেকে ধাক্কা মেরেছে কিন্তু ভক্তিভরে ছুঁয়েছে শুধু এই একজন। তোমাকে বলছি,' বললেন যীশু, 'তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

সেই একজন সামান্য এক স্ত্রীলোক। কঠিন রোগে ভুগছে। মনে বিশ্বাস, যীশুকে ছুঁলেই তার রোগ সেরে যাবে। তাই ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছিল, হাত বাড়িয়েছিল।

তা, সে তো যীশুর বস্ত্রপ্রান্ত মাত্র ছুঁয়েছে। তাই তিনি টের পেয়েছেন।

ছুঁতেও হয় না হয়তো। শুধু স্মরণ করলেও বোঝেন ঠিক-ঠিক।

সন্দেহ কী, সেই রুগ্ন স্ত্রীলোক ভালো হয়ে গেল।

এই উপাখ্যানটা শুনছিল গিরিশ। জ্বলন্ত কণ্ঠে গর্জন করে উঠল : 'ঠিক কথা। হাজার হাজার লোক আমোদের জন্যে যায়, একজন কি দুজন দেখবার জন্যে যায়। খুদিরাম চাটুজ্জের ব্যাটা গদাই চাটুজ্জেকে হাজার হাজার লোক দেখেছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল? ওরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কটা লোক দেখেছিল রে?' গর্জন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল,

তলহীন তন্ময়তায় ডুবে গেল গিরিশ।

ঠাকুরের দেহভস্মের ঘড়া মাথায় নিয়ে শশী-মহারাজ চলেছে, রাম দত্তের বাড়ি থেকে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে। সঙ্গে সংকীর্তনের দল। এ উপলক্ষ্যে নতুন কোনো গান তৈরি হল না? কে তৈরি করবে? তবে, উপায় কী, গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' থেকেই বেছে নেওয়া হোক একটা। আর কথা নেই, 'চৈতন্য-লীলা'র শেষ গানটাই সবচেয়ে জুৎসই।

সেই শেষ গানটাই এই শেষের দিনে গাইল সকলে :

'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা দাও হে দেখা
প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজালে বাঁশি,
ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী
কূল ত্যজে হে অকূলে ভাসি
হৃদবিহারী কোথায় হরি
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥'

'ঈশ্বরে শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়।' বললেন সারদামণি, 'তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে, ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? কর্মক্ষয় ধীরে ধীরে।'

গিরিশের ইচ্ছে হল তার বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় মা-ঠাকরুন উপস্থিত থাকেন। সারদানন্দকে দিয়ে জয়রামবাটিতে চিঠি লেখাল। মা, তোমার আসা চাই। তুমি না এলে গিরিশের পূজাই এবার অর্থহীন।

কিন্তু মা কী করে আসেন? ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে তাঁর শরীর ভীষণ কাহিল হয়ে গেছে। তার উপরে কলকাতায় এখন দাঙ্গা।

'মা যদি না আসেন,' বললে গিরিশ, 'তাহলে পুজো বন্ধ করে দেব। কোনদিনই আর পুজো করব না। মা ছাড়া আর ভগবতী কে!'

গাঁয়ের চৌকিদার অম্বিকা বাগদি বলেছিল, 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কী বলে, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।' মা বললেন, 'তোমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকে দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন।'

জয়রামবাটিতে মায়ের যখন মন্দিরনির্মাণ হচ্ছে, বৃদ্ধা গয়লা-মা বললে, 'সারি বামনি, তার আবার মন্দির! এই সেদিনও তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি।'

আরো বললে : 'তোমরা তাকে ভগবতী বলো, কিন্তু আমরা জানি, আমাদের গাঁয়ের ঝিউড়ি সারু, আমাদের ঠাকুরঝি। বাসন মাজত, কাপড় কাচত, ঢেঁকিতে পাড় দিত, মুনিষদের খেতে দিত। ঠিক আমাদেরি মত। তখন কি বুঝেছি গা? শিষ্যসেবক আসত, কত জিনিস দিত, কত টাকা পড়ত পায়ের

কাছে। মনে করতাম—বামনি, বড়-বড় শিষ্যসেবক, তাই অত দিচ্ছে। বলেছিলাম একদিন, ঠাকুরঝি, ভায়েদের পিছনে খরচ না করে গাঁয়ে তিনদিন অষ্টপহর দাও। আমার কথা শুনে হেসে ফেলল ঠাকুরঝি, বললে, কত অষ্টপহর দেখবি পরে। অত বুঝিনি তখন, এখন বুঝছি। মহামায়া মায়ায় আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছিল। তাই ভাবি বেঁচে থাকতে যে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়েছিল, মরলে সে কি পায়ে জায়গা দিবেনি?'

মা এলেন। উঠলেন বলরাম বোসের বাড়িতে।

গিরিশের বাড়ি কাছেই, খবর শুনে দিদি দক্ষিণাকে নিয়ে গিরিশ গেল মাকে প্রণাম করতে। দক্ষিণা বললে, 'গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল, মা। বলছে, মা না এলে পুজো করব কাকে নিয়ে? পুজো এবার বাদ যাবে।'

মা সস্নেহে হাসলেন। পুজো কি বাদ যেতে পারে? কত বড় বীর ভক্ত গিরিশ, তার ডাক কি উপেক্ষা করতে পারি?

মার সামনেই কল্পারম্ভ হল। কিন্তু মা ক'জায়গা সামলাবেন? সপ্তমীর ভোর থেকেই বলরামের বাড়িতে ভিড়, দলে-দলে লোক এসে মার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে আর প্রণাম করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থেকে এই পূজা-প্রণাম গ্রহণ করলেন মা। তারপর বেলা প্রায় এগারোটায় গিরিশের বাড়ি থেকে ডাক এল। সেখানে প্রতিমার পূজা। কিন্তু পরমাকে পেয়ে ভক্তের দল ছাড়বে কেন? প্রতিমার পাশে পরমা দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। দেবীর দুই মূর্তির পদতলেই পূজাঞ্জলি পড়তে লাগল। সকলেরই পূজা-প্রণাম স্বীকার করলেন মা, কাউকে বিমুখ করলেন না।

মহাষ্টমীর দিন আরো ভিড়, আরো অসহনীয় অবস্থা। শরীর অসুস্থ তবু মা চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়ালেন। দুজায়গাতেই—বলরামের বাড়ি, আবার গিরিশের বাড়ি। বলরামের বাড়িতে একাকিনী, গিরিশের বড়িতে প্রতিমা-প্রতিরূপিণী।

দুর্বল শরীরে কত আর সইবে? মার ঠিক জ্বর এসে গেল। গভীর রাতে সন্ধিপূজা, স্থির হল, সন্ধিপূজায় মা আর উপস্থিত হবেন না।

গিরিশ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু উপায় কি! অসুখের উপর কথা নেই।

অভিমানে গিরিশ আর গেল না মণ্ডপে। শোকার্তমুখে নীরবে বসে রইল।

মধ্যরাত্রে খিড়কির দরজায় মৃদু করাঘাত পড়ল।

কে জানে কে! ঝি খুলে দিল দরজা।

'আমি এসেছি।'

ওরে মা এসেছেন, মা এসেছেন! গিরিশ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, 'ভেবেছিলুম আমার পুজোই হল না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, আমি এসেছি। ওরে মা কি সন্তানের ডাকে না এসে পারে?'

'বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, জল থাকে নিচুতে।' মা বলছেন, 'জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও। সূর্য আপন স্বভাবেই জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়। সুতরাং যে মা বলে মেনেছে তার আর ভয় কী!'

গিরিশ 'তপোবল' লিখল। জড়শক্তির চেয়ে ব্রহ্মশক্তিই মহত্তর, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের সঙ্ঘর্ষ নিয়ে নাটক। শেষ পর্যন্ত তপস্যার শক্তিতে বিশ্বামিত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন। আত্মা সকলেরই সমান, যে আত্মদর্শন করতে সক্ষম হয়, সেই ব্রাহ্মণ।

'তপোবল' গিরিশ নিবেদিতাকে উৎসর্গ করল। নিবেদিতা তখন কোথায়?

দার্জিলিঙে নিবেদিতা অসুস্থ। স্যার জগদীশ দেখতে গিয়েছিল। তার কাছে নিবেদিতার শুধু গিরিশের কথা। কিছু করল না, ছাড়ল না, অথচ কী দুর্মদ ভক্তি!

'তোমাকে নিবেদিতা কত যে ভালোবাসে!' বললে জগদীশ।

উৎসর্গপত্রে লিখল গিরিশ : 'বৎসে, তুমি আমার নতুন নাটক হলে আমোদ করতে। আমার নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিঙ যাবার সময় আমাকে পীড়িত দেখে স্নেহবাক্যে বলে গিয়েছিলে, এসে যেন তোমার দেখা পাই। আমি তো জীবিত আছি, কেন বৎসে দেখা করতে আস না? শুনতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করেছিলে, যদি সেবাকার্যে নিযুক্ত থেকে আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ করো।'

মায়ের প্রতি মায়ের মতোই ভালোবাসা নিবেদিতার। জয়রামবাটি থেকে মা ফিরেছেন কলকাতা, নিবেদিতা লিখছে এক ভক্তকে :

'শ্রীমা এখানে এসেছেন, শরীর একেবারে ক্ষয়ে গেছে, এত রোগা আর ছোট্ট আর এমন কালো হয়ে গেছেন—বোধহয় গ্রামে থেকে, ওখানকার কষ্টে। কিন্তু সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সেই মহিমা আর মাতৃত্ব আগের মতোই আছে। আহা, ওঁকে কত আরামে রাখতে সাধ জাগে। নরম একটি বালিশ, ছোট্ট একটা আলমারি, আরও কত কী ওঁর দরকার! এত ভিড় ওঁর চারদিকে।'

আমেরিকা থেকে মাকে চিঠি লিখছে নিবেদিতা :

'প্রিয়তমা মা, আজ খুব সকালে গির্জেয় গিয়েছিলুম, সারার জন্যে প্রার্থনা করতে। সেখানে সকলেই যীশুজননী মেরীর বিষয় চিন্তা করছিল, কিন্তু আমার মনে হঠাৎ তোমার চিন্তা এল। তোমার প্রিয় মুখখানি, তোমার স্নেহভরা দৃষ্টি, তোমার শাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা দু-গাছি,—এ সবই ভেসে উঠল চোখের সামনে। কী ভাবছিলুম জানো? ভাবছিলুম ঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় আমি নির্বোধের মত তোমার ঘরে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছি। তখন আমি কেন বুঝতে পারিনি যে তোমার স্নিগ্ধ চরণতলে একটি ছোট্ট শিশু হয়ে বসে থাকলেই তো যথেষ্ট হত। প্রিয়তমা মা, তুমি শুধু ভালোবাসায় ভরা, সে ভালোবাসা আমাদের জাগতিক ভালোবাসার মত উত্তাল-উদ্দাম নয়। সে শুধু একটা শীতল শান্তি যা সকলের কল্যাণে বিস্তীর্ণ, যাতে কারু প্রতি

একটুও অশুভস্পর্শ নেই। বিচিত্র লীলায় আন্দোলিত এ এক দিব্য জ্যোতির তরঙ্গ। প্রিয়তমা মা, ইচ্ছে হয়, তোমাকে সুন্দর একটি বন্দনা-সঙ্গীত বা প্রার্থনা পাঠাই, কিন্তু মনে হয় তোমার সম্পর্কে তাও একটা তীব্র উচ্চধ্বনি বা কোলাহলের মত শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম বস্তু এবং শিশুর মত একটু আনন্দ করা ছাড়া তোমার কাছে আমাদের অত্যন্ত নীরব ও শান্ত হয়ে থাকাই উচিত। ভগবানের সমস্ত বিস্ময়কর বস্তুই নীরব—নীরবে সবার অলক্ষ্যে তারা আমাদের জীবনে প্রবেশ করে—বাতাস আলো ফুল জল—নদী—গঙ্গা। মা, এই নীরবতাগুলি তোমারই মত।'

'আমি তাকে দেখেছি।' অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল ম্যাকলাউড, 'আমি তাকে দেখেছি।'

দুই বোন, মিস লেগেট আর মিস ম্যাকলাউড। দুজনই স্বামীজির শিষ্যা, চিরকুমারী। স্বামীজি নাম রেখেছেন জয়া আর বিজয়া।

ম্যাকলাউড উদ্বোধনে মার সঙ্গে দেখা করে ফিরেছে মঠে। তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছে, ঠাকুরঘরে এসে প্রণাম করে ধ্যান করল খানিকক্ষণ। পরে ফিরে চলল গেস্ট হাউসের দিকে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, এক ব্রহ্মচারী আলো নিয়ে চলল সঙ্গে। আলোর দরকার নেই, ম্যাকলাউড নিজের মনে এগিয়ে চলেছে। ব্রহ্মচারী কাছাকাছি হতেই শুনতে পেল ম্যাকলাউড অস্ফুটস্বরে আপনমনে বলছে : 'আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে দেখেছি।'

কে—কাকে? ব্রহ্মচারীর প্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে তার কানের কাছে মুখ এনে আরো গভীরে উচ্চারণ করল ম্যাকলাউড : 'মাকে দেখেছি। মূর্তিমতী পবিত্রতা। জ্যোতিষ্মতী।'

কোথায় পা পড়ছে হুঁশ নেই, টলতে টলতে চলেছে ম্যাকলাউড : 'আমি তাকে দেখেছি।'

নিবেদিতা অল্প অল্প বাঙলা শিখছে।

একদিন মাকে স্পষ্ট বাঙলায় বলল, 'মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদের কালী।'

সঙ্গে কৃস্টিন ছিল, সেও ঐ কথাই বললে ইংরিজিতে।

মা হেসে বললেন, 'না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তা হলে।'

কথাটা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দেওয়া হল। তখন দুজনেই বললে, 'না, না, তোমাকে অত কষ্ট করতে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব। তুমি তাঁর ঘরণী, আমাদের জননী হয়েই থাকো।'

পশমের তৈরি ছোট একখানি পাখা নিবেদিতাকে উপহার দিলেন মা। বললেন, 'এটি আমি তোমার জন্যে করেছি।'

কী পেল নিবেদিতা যেন হিসেবে আনতে পাচ্ছে না। পাখাটা কখনো মাথায় ঠেকায়, কখনো বুকে রাখে, আর বলে, 'কী সুন্দর, কী চমৎকার!'

'কী একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ!' নিবেদিতার

শুচিসুন্দর মুখখানির দিকে তাকালেন মা : 'আর কী সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কী ভক্তিই করে! নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাণ ঢেলে তার কাজ করছে। কী গুরুভক্তি! আর এদেশের উপর কী টান! আমাকে বললে, মা, আমি আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

ভক্তছেলে রামময়, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, মায়ের বাক্স থেকে পুরোনো কাপড়চোপড় বের করে রোদে দিচ্ছে। একখানা জীর্ণ এণ্ডির চাদর হাতে নিয়ে রামময় বললে, 'মা, এটা রেখে কী হবে? এটাতে কিচ্ছু নেই, ফেলে দি।'

মা শিউরে উঠলেন। বললেন, 'না বাবা, ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল, ওখানি থাক।' ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালো জিরে দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখলেন মা। বললেন, 'চাদরখানি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কী মেয়েই ছিল! আমার সঙ্গে প্রথম-প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাঙলা শিখে নিলে। আর আমার মাকেই বা কী ভালোবাসত!'

দিদিমা শ্যামাসুন্দরীকে একবার নিবেদিতা বলেছিল, 'দিদিমা, আমি তোমাদের দেশে যাব। তোমার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করব।'

শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'না দিদি, উ কথাটি বোলোনি, তুমি আমার হেঁসেলে ঢুকলে দেশের লোক আমাদের ঠেকো করবে।'

মায়ের ছবি নেওয়া হবে, কে মাকে সাজিয়ে দেয়। আর কে? নিবেদিতা! নিবেদিতাই মাকে ধ্যানাসনে বসিয়ে চুল ও আঁচল পরিপাটি করে গুছিয়ে দিল। ডান কাঁধ থেকে ঘনকৃষ্ণ চুল নেমে এসেছে বুকের উপর আর বস্ত্রাঞ্চল কেমন বিস্তীর্ণ লাবণ্যে উঠে গিয়েছে মাথার দিকে, বরাভয়ের ডান হাতটি মুক্ত।

এই ছবিই ঘরে-ঘরে পুজো পাচ্ছে।

বিনোদবিহারী সোম ওরফে পদ্মবিনোদ ছেলেবয়েস থেকেই যেত ঠাকুরের কাছে, এখন থিয়েটারে ঢুকে মদ খেতে শিখেছে।

মাতাল হয়ে বেশি রাত করে ফিরছে মার বাড়ির পাশ দিয়ে, আর শরৎ মহারাজের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছে, 'দোস্ত! মাকে একবার তুলে দাও না। করুণাময়ীকে একটু দর্শন করি।'

শরৎ মহারাজ জেগেও সাড়া দিচ্ছে না, আর সবাইকেও বলছে চুপ করে থাকতে। মার যেন না ঘুম ভাঙে।

পরের দিন রাত্রে পদ্মবিনোদের আবার সেই দর্শনপিপাসা। তবে এবার দোস্তের শরণাপন্ন না হয়ে একেবারে মার উদ্দেশেই সে গান ধরল : ওঠো গো করুণাময়ী, খোলো গো কুটির দ্বার—'

মায়ের ঘরের জানলা খোলার শব্দ হল।

'এই রে, মাকে তুলেছে।' শরৎ মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'উঠেছ মা, সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।' বলে পদ্মবিনোদ রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। খানিক ধুলো গায়ে-মাথায়

মেখে চলে গেল সে গান গাইতে গাইতে : 'যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিনী শ্যামা মাকে। মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে—অন্তত দোস্ত যেন নাহি দেখে॥'

'ছেলেটি কে?' সকালে উঠে জিজ্ঞেস করলেন মা। সব শুনে বললেন, 'দেখেছ জ্ঞানটুকু টনটনে আছে।'

গিরিশের জ্ঞানও কি টনটনে নয়? যাই করুক-বলুক ঠাকুরকে রেখেছে ঠিক মাথায় বেঁধে আর মাকে মর্মে গেঁথে।

পদ্মবিনোদ হাসপাতালে মারা গেল। মৃত্যুসময়ে বললে, 'ঠাকুরের কথামৃত শোনাও।'

শুনতে শুনতে তার দু-চোখে দুফোঁটা জল দেখা দিল। মুখে ফুটল 'রামকৃষ্ণ', সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল শেষ নিঃশ্বাস।

মা বললেন, 'তা হবে না? ঠাকুরের ছেলে যে। কাদা মেখেছিল তা হয়েছে কী! যাঁর ছেলে তাঁর কোলেই গেছে।'

গিরিশের অন্তিম মুহূর্তেও কি এসেছিল রামকৃষ্ণ-নাম?

বাবুরাম মহারাজ ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ কাশী থেকে লিখছে :

'শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর প্রায় সুস্থ হচ্ছে, আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। আহা, তাঁর স্বভাব কী চমৎকার হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে। ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কী চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি—যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্য তাঁর কাছে হ্যাক-থু হয়েছে। অনেক অনেক সাধুরও এমন ভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কী অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। আটষট্টি বছর বয়স, কিন্তু বালকের মত স্বভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির কথায় একেবারে মাতোয়ারা। তাঁর চাকরবাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা।'

পশ্চিম জয় করে ফিরেছে স্বামীজি।

গিরিশকে দেখেই বলে উঠল : 'জি-সি, তোমার ঠাকুরকে সাগরপারে রেখে এলুম।'

গিরিশ স্বামীজির পায়ের ধুলো নিতে নত হল।

'কী করো, জি-সি, এতে যে আমার অকল্যাণ হবে।' এই বলে স্বামীজিই গিরিশকে প্রণাম করল। জিজ্ঞেস করল আবার সেই পুরোনো কথা : 'সাড়ে তিন হাত মানুষের মধ্যে কি ভগবান আসতে পারে জি-সি?'

গিরিশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'হ্যাঁ, এসেছে, আমি দেখেছি।'

আমি দেখেছি! আমি দেখেছি!

॥ সাতাশ ॥

কাশী থেকে গিরিশ কলকাতায় যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকে চিঠি লিখছে। যতীন্দ্রের পুত্রবিয়োগ হয়েছে। তাই এই চিঠি।

'যোগেন মহারাজ যখন খুব পীড়িত, বোসপাড়ায় মার বাড়িতে আছেন, ন-দিদি একদিন বললেন, যোগেন, তোমার অসুখের কথা মাকে বলো না, ঠাকুরকে বলুন, আরাম হোক। যোগেন মহারাজ বললেন, ন-দিদি, তুমি জানো না, ওরা যা করবার তা করে, কারুর বলা-কওয়ায় কিছু হয় না। যাকে ভালো করবার তাকে আপনিই ভালো করে দেয়, যাকে ভালো করবার নয়, কাঁদাকাটা করলেও তার ভালো করবে না।

ঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে, মা-ঠাকরুন তারকেশ্বরে হত্যে দিতে গেলেন, কিন্তু হত্যে দিলে এমনি বেদান্তভাব এল যে আর কামনা চলল না। দেখলেন, কেউ মরে না, কেউ বাঁচে না। পূর্ণ ভাবে সমস্তই থেকে গেছে। আবার একবার যখন কেশব সেনের ব্যারাম হয়, ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব মানেন, সেবার কেশব সেন আরাম হলেন। কিন্তু কেশববাবুর মৃত্যুরোগের সময়, কেশববাবুর মা কত বললেন, ঠাকুর কোনোরকমেই ঘাড় পাতলেন না। আমাদের কাছে ঠাকুর গল্প করেছিলেন, শেষবার কামনা এলোনি। কেশবকে বললাম, কেশব, তুমি বসরাই গোলাপ, মালী যেমন ভালো করে বসরাই ফোটাবার জন্যে গোড়া খুঁড়ে দেয়, তেমনি দিচ্ছেন।

বোঝো, ঠাকুরের শরণাপন্ন হলে তিনি তার প্রকৃত উন্নতি দেখেন। বালককে শিক্ষা দেবার মত মারও আছে। কাঁদো-কাটো কিছুতেই এড়ানো নেই। তবে একমাত্র তোমার সান্ত্বনা এই যে ঠাকুরের জিনিস ঠাকুর নিয়েছেন। সে নিশ্চয়ই তাঁর স্বগণ, নচেৎ মেনিনজাইটিসের দারুণ তাড়নায় ঠাকুরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারত না, ঠাকুরের নাম নিতে পারত না। তোমাদের শিক্ষার জন্য ঠাকুর তাঁর স্বগণকে পাঠিয়েছিলেন। কঠোর শিক্ষা দিয়ে গেল। শোক করতে হয় তো করো, কিন্তু শোকের সঙ্গে সঙ্গে ভোলবার জো নেই যে সাধুবালক অন্তকালে মৃত্যুযন্ত্রণা উপেক্ষা করে ঠাকুরের চরণে দৃষ্টি রেখেছিল।

এ সংসার এমনি স্থান যে যার প্রতি ভালবাসা রাখবে তার কাছেই তেমনি ঠকবে। আমি ঠকে ঠকে আমার দুটো নাতির বাগে চাই না। তাদের দরকার সাধ্যমত কুলান করি এই পর্যন্ত। সংসারে এরূপ থাকা ভিন্ন উপায় নেই। নচেৎ পদে-পদে যন্ত্রণা। পুত্রশোকী কাঙালের শেষ পত্রে বোধ হয়েছে যে ভাবনারাশিই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—কদিক ভাববে ভেবে না পেয়ে মাস্তুলের পাখির মত ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে। এই গুয়ের হেগো সংসারে আবার পরজন্মের কামনা করে। ইহজন্মেই রক্ষে নেই। যে স্থানে অনিত্য বস্তু আপনার মনে হয়, সে স্থান যমালয় অপেক্ষা ভীষণ। কারণ পদে-পদে নিরাশ হতে হয়, যাকে আনন্দের বস্তু বিবেচনা করেছে যত উদ্বেগ তারই জন্যে। ঠাকুরের কথামৃতে

আছে না যে একজনের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল—ঝড়ের সময় রামের দোহাই লক্ষ্মণের দোহাই হনুমানের দোহাই দিয়েও দেখল ঘর রাখা যায় না, শেষে বললে, যা শালার ঘর উড়ে। তবে নিশ্চিন্ত। বাবাজি, জেনো সংসার এই।

ইতিপূর্বে তোমায় চিঠি লিখেছিলাম যে আমার 'নিব্রিচের' মাপ নেওয়া হয়েছিল, সেই সঙ্গে তার কোটেরও মাপ নেওয়া হয়েছিল কিনা স্মরণ নেই। আমার সেই নিকারবুকার সুটের প্রয়োজন। যে সুট পাঠিয়েছ তা ঠিক বেড়াবার পক্ষে সুবিধের নয়, তবে ভড়ং করে কোথাও যাবার পক্ষে সুবিধের বটে। আর হাফ-ডজন সার্ট আর তদুপযুক্ত নেক-টাই কলারের কথা ছিল, তাও পাঠাওনি। টুপি রেসপেক্টেব্‌ল দেখে তোমাদের পছন্দমতই পাঠিয়ে দিও, আমার তো সাহেব সাজবার ইচ্ছে নয়। তবে রেলে উঠতে গেলে বা একজিবিশন প্রভৃতি কোনো দৃশ্য দেখতে গেলে 'কালা বাঙালী' বলে উঠিয়ে না দেয়, এই আমার উদ্দেশ্য।

আমার শরীরের অবস্থা এরূপ যে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করা দূরে থাক, বাসা থেকে দু-পা গেলে 'দাউজি' দর্শন হয়, তা এ পর্যন্ত হয়নি। এ স্থানের একটু মমতা আছে, নচেৎ স্থানান্তরে যাবার চেষ্টা করতাম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে গুরুদেব, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও উত্তরবাহিনী গঙ্গার মাতৃ-উচ্চারণ করি, বলি শালা-শালীরে, আমায় কি করতে আনলি? তা গাল দাও আর স্তুতিই করো, শালা-শালীরা কানের মাথা খেয়ে বসে আছে। ভরসা করি এতদিনে ঠাকুরের পাদপদ্ম স্মরণ করে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেছ আর এই পত্র সকলের কুশল অবস্থায় পৌঁছুবে।'

অন্তকালে গিরিশ কী দেখল? কী বলল?

তিরিশে শ্রাবণের শনিবার বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। মিনার্ভায় 'বলিদান' হবে, প্ল্যাকার্ড পড়ে গিয়েছে, করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশ।

সন্ধে পর্যন্ত টিকিট বিক্রি পঞ্চাশ টাকা।

থিয়েটারের সকলেই গিরিশকে বললে, 'আপনার আজ আর নেমে কাজ নেই। এ ঠাণ্ডা সহ্য হবে না আপনার।'

হাঁপানির রুগী, ঠাণ্ডা লাগলেই নিমোনিয়া। আর করুণাময়কে তিনবার স্টেজে খালি গায়ে আসতে হবে। মেয়ে হিরণ্ময়ীর বিয়ের সময়, হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পরে, আর একবার গলায় দড়ি দিয়ে মরবার সময়ে। তিন-তিনবার বেশ খানিকটা সময় খালি গায়ে থাকতে হলে বিপদ না ঘটে যায় না।

গিরিশ বললে, 'দাঁড়াও, দেখি, কী রকম হয়।'

আস্তে-আস্তে চারশো টাকার মত টিকিট বিক্রি হল।

'থাক, তবু আপনার নেমে কাজ নেই।' থিয়েটারের মালিক মহেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত বারণ করল: 'এমনিতে আপনি অসুস্থ, তার উপর ঠাণ্ডা লাগলে আপনার অসুখ আরো বাড়বে।'

'তা কি হয়? দুর্যোগেও কত লোক এসেছে টিকিট কেটে। শুধু আমার

অভিনয় দেখবার জন্যে।' গিরিশ বললে, 'আমি কি তাদের নিরাশ করতে পারি?'

গিরিশ নামল স্টেজে। আর এই তার শেষ অভিনয়।

শেষ পর্যন্তও সে মঞ্চকে, থিয়েটারকে ধরে ছিল। ঠাকুর তাকে কিছু ছাড়তে বলেননি। যা ছাড়বার তা নিজের থেকেই ছেড়ে চলে যাবে। তুমি শুধু আমাকে ছেড়ো না।

'আচ্ছা, আপনি মদ কী করে ছাড়লেন?' জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ।

'আমি কি ছেড়েছি?' বললে গিরিশ, 'মদই আমাকে ছেড়ে গেছে।'

'ঠাকুর তো নিষেধ করেননি।'

'না, তাঁর হাঁ-ও নেই, না-ও নেই। তাঁর—যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে। কারুর ভাব তিনি নষ্ট করেন নি। সব পথই পথ। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হয়ে গেল।' বলতে বলতে গিরিশের চোখ জলে ভরে উঠল।

'তপোবলে' ব্রহ্মণ্যদেব গান গাইছে :

'আপনাকে চেন আগে, চিনবে আমায় তার পরে।
দেখছ কি এদিক-ওদিক, দেখ কে আছে ঘরে॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ—
মনের ভুলে মুল খোয়ালে, কাঁচ নিলে সোনার দরে॥'

একটা দেহের মধ্যে দশ-বারোটা গিরিশ ঘোষ বাস করছে। যেমন সেজেছে 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ, 'নীলদর্পণে' উডসাহেব, 'পলাশীর যুদ্ধে' ক্লাইভ, 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ, 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র, 'প্রফুল্লে' যোগেশ, 'কালা-পাহাড়ে' চিন্তামণি, 'বিল্বমঙ্গলে' সাধক, 'নসীরামে' নসীরাম, 'জনা'য় বিদূষক, 'সিরাজদ্দৌলা'য় করিমচাচা। আবার ধাম-লীলা ছেড়ে তাকে নিত্যলীলায় দেখতে চাও, দেখবে নিতান্ত সাধাসিধে, বালকস্বভাব, ভক্তিতে-বিনতিতে দ্রবীভূত।

এদিকে সঙের গান লিখতেও ওস্তাদ :

'আয়লো আয় বুকের মাঝে উল্কি দেগে নে।
ভেলকি করে পয়সাওয়ালা নাগর কিনে নে॥
উল্কি পরা নাগর ধরা সখের নূতন ফাঁদ
উল্কি দেখে ভেলকি খাবে পয়সাওয়ালা চাঁদ।
তোর সাধের বেণী ওলো শোন বিনোদিনী
যদি বেণীর গুমোর করিস তবে খাবি আমানি।
উল্কিতে ভেলকি খেয়ে মুখপানে তোর থাকবে চেয়ে
হতচ্ছাড়া নাগর তোমার হবে না আর ভ্যানভেনে॥'

উল্কি-ওয়ালার পর গান গাইছে সাপুড়েরা :

'কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর
কালনাগিণী কেটে গেল সোনার লকিন্দর রে সোনার লকিন্দর।

ভাসিয়ে ভেলা বেউলো সতী, নিয়ে যাবে মরা পতি
সতীর মেয়ে বেউলো সতীর এয়োৎ ভারি জোর রে
এয়োৎ ভারি জোর॥'

ঠাকুর শুধু শিবের গানই লিখতে বলেননি, সঙের গানও লিখতে বলেছেন। তার মানেই সমস্ত সংসার নিয়ে লেখ—সংসারে সঙও আছে সারও আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর। আমি সমগ্র বেলটিকে চাই। জানি আমি শুধু শাঁস খাব, কিন্তু শাঁস নিতে হলে খোল-বিচি-আঠাও নিতে হবে। খোল বিচি আঠার মধ্যেই শাঁসের বাসা। সঙের মধ্যেই সারের অধিষ্ঠান।

মাথায় শাদা ঝাঁকড়া চুল, গালে শাদা দাড়ি, হাতে মোটা লাঠি এক বুড়ো বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর চেনা-অচেনা যাকে পাচ্ছে তাকে ধরে বলছে, 'ওহে শুনেছ, গিরিশবাবু কী বলেছেন? এ কথা পুরাণেও লেখেনি, ব্যাসও বলেনি—এ অতি নতুন কথা—গিরিশ ঘোষই প্রথমে এ কথা বলেছে। কী কথাটা শুনেছ? কৃষ্ণদর্শনের ফলই কৃষ্ণদর্শন। মুক্তি নয়, বৈকুণ্ঠ নয়, স্বর্গ নয়,—কৃষ্ণদর্শনের ফলই কৃষ্ণদর্শন—আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাঃ, কী সুন্দর কথা! শুনে রাখো, শিখে রাখো। তোমাকে দেখলুম মানে তো তোমাকেই দেখলুম।'

নরেন তখন কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়ে খালি পায়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, এক গণৎকার তার হাত-পায়ের লক্ষণ দেখে বললে, 'এর পায়ে শঙ্খচক্র চিহ্ন আছে, এ অসাধ্য সাধন করবে কিন্তু তার এখন যা হাল দেখছি তাতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছি না।'

গণৎকার চলে গেলে গিরিশ বললে, 'এখন বোঝা যাচ্ছে না বটে পরে যাবে।'

স্বামীজির আমেরিকা-বিজয়ের কাহিনী শুনে গিরিশ অভিভূতের মত বললে, 'ওহে এ হল কী! এ যে মিরাক্যাল-এর দিন আবার ফিরে এল। বহু শতাব্দী আগে যা হয়েছিল সেই মিরাক্যল যে চোখের সামনে দেখছি। এ যে বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে গেল। এ কি তর্ক-যুক্তিতে হয়? একটা শক্তি পেছনে না দাঁড়ালে এ সব কাজ কি কেউ করতে পারে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে বারে বারে প্রণাম করতে লাগল : 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। এ যে শঙ্কর-বুদ্ধের দলে গেল, সাধারণ লোকের হিসেবে আর রইল না।'

মিরাক্যল কি শুধু স্বামীজি? স্বয়ং গিরিশ মিরাক্যল নয়? সে যে ধ্রুব-প্রহ্লাদের দলে গেল।

তার শুধু ভক্তি-বিশ্বাস। ধ্রুবের বিশ্বাস আর প্রহ্লাদের ভক্তি।

ঠাকুর গিরিশকে বলতেন, ছিপ-ভাঙা ছেলে।

এক জমিদারের দুই ছেলে, বড়টি বিদ্বান, বিনয়ী, বাপের অনুগত। ছোটটা বয়াটে, লেখাপড়ায় মন নেই, দিনরাত কেবল গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মশগুল। যা সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে, বাপের ধারে-কাছেও ঘেঁসে না, ভয়ে-ভয়ে থাকে। একদিন ছোট ছেলেকে বাপ জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে, বাগানে যাবি?

তোর দাদাও যাচ্ছে।' দাদা যাচ্ছে শুনে ছোটভাইও রাজি হল। বাপ দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়ি করে বাগানে গেল। বাগানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বাপ বড় ছেলেকে বোঝাতে লাগল, কোন গাছটা কোথা থেকে আমদানি, কোন কলমের কী বৈশিষ্ট্য, কার কত ফল দেবার সম্ভাবনা—নানা তত্ত্ব নানা তথ্য—এই দিকে আবার দেখ শাকশবজির খেত। কিন্তু ছোটছেলেটা উধাও। সে মালীর ঘর থেকে বড় একগাছা ছিপ নিয়ে চারের জোগাড় করে দিব্যি একটা পুকুরে মাছ ধরতে বসেছে। বিকেলের জলখাবার এসে গেল, ছোটছেলের দেখা নেই। ছোটকা কোথায় গেল? বড় ছেলে খুঁজে এসে বললে, পুকুরে মাছ ধরছে। বলছে, তোমরা খাও গে, আমি গোটা দুই মাছ না ধরে উঠছি না। ব্যাটা যেখানে যাবে সেখানেই জ্বালাবে। চটে-মটে বাপ নিজেই গেল পুকুরে, ছোট ছেলের হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিল, তারপর ছোট-ছেলের হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে এল, জোর করে জলখাবার খাওয়াল, তারপর দু ছেলেকে এক সঙ্গে গাড়ি করে ফিরিয়ে আনল বাড়ি। ছোটছেলেটা দুরন্ত বলে অবাধ্য বলে তাকে বাগানে একা ফেলে রেখে এল না।

ঠাকুর বললেন গিরিশকে লক্ষ্য করে, 'তুমি আমার ছোট ছেলে আর নরেন আমার বড় ছেলে। বাড়ি যাবার সময় তোমাকে আর নরেনকে একসঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার ছিপ-ভাঙা ছেলে।'

স্টার থিয়েটারে বাবা-ভারতী এসেছে। পরনে গেরুয়া, খালি পা, কেটে গিয়েছে বলে পটি বাঁধা। আসলে এ সুরেন মুখুজ্জে, লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার এককালের সম্পাদক।

অভিনয় দেখার পর গিরিশ, বাবা-ভারতী ও কৃষ্ণধন দত্ত তিনজনে মিলে মদ খেল। খাবার পর খেয়াল উঠল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসকে দেখতে যাবে। রাত প্রায় দুটো, একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরুলো তিনজন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দেখল, ফটক বন্ধ। দরোয়ানকে এক টাকা বকশিস দিতেই সে ফটক খুলে দিল। তিনজনে ঢুকেই ঠাকুরের ঘরের দরজায় কিল-চড় মারতে সুরু করল। সঙ্গে দানাই চিৎকার। খুলুন, বেরিয়ে আসুন। ঠাকুর জেগে ছিলেন, দরজা খুলে দিলেন।

'আমরা তিনজনে ঢুকে পরমহংস মশাইকে মাঝে করে দানাই-নাচ শুরু করে দিলুম।' বলছে বাবা-ভারতী, 'কৃষ্ণধন শালা ভারি বেরসিক। মদ খেয়ে কিনা গান ধরলে, রাধে গোবিন্দ বলো। মাতাল জাতের বদনাম করে দিল। আবার বলছে, দক্ষিণেশ্বরের ঐ লোকটার মত প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি—খুব উঁচু-দরের ইয়ার। নাচে-গানে রাত ভোর করে ফিরলুম তিনজন।'

আরো একজন আসে গিরিশের বাড়ি। অন্যের সঙ্গে সমান আসনে না বসে মেঝের উপর বসে, তামাক সেজে সকলকে খাওয়ায়। যদি কখনো কীর্তন হয় যুক্তকরে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নাম দুর্গাচরণ নাগ।

'নিজেকে এত দীনহীন ভাবেন কেন?' নিরঞ্জনানন্দ স্বামী বললে, 'দীন-হীন ভাবলে দীনহীনই হয়ে যেতে হয়।'

'যে সত্যি দীনহীন, সে আর দীনহীন হবে কী!' বললে নাগমশাই, 'কীট যদি নিজেকে কীট ভাবে তবে সত্যের অমর্যাদা হয় না। তেমনি আমি যখন নিজেকে ক্ষুদ্র বলি সত্যের অপলাপ করি না। তাই দোষস্পর্শও হয় না।'

এর পর কে আর কী বলবে?

গিরিশ তাই বললে, 'মহামায়া দুজনকে বাঁধতে পারল না, এক নরেনকে আরেক নাগমশাইকে। নরেনকে যত বাঁধে সে তত বড় হয়—দড়িতে আর কুলোয় না। আর নাগমশাইকে যত বাঁধে সে তত ছোট হয়—দড়িতে গিঁট পড়ে না। একজন বেরিয়ে গেল, আরেকজন গলে গেল।'

নাগমশাইকে একখানা কম্বল দিয়ে গিরিশ বিপদে পড়ল। কি শীত কি গ্রীষ্ম, নাগমশাই সেই কম্বল গায়ে না দিয়ে পুঁটলি বেঁধে মাথায় করে বয়ে বেড়াতে লাগল।

এটা কী—কেউ জিজ্ঞেস করলে নাগমশাই বলে : 'এ কম্বল আমাকে গিরিশবাবু দিয়েছেন, এ কম্বল কি আমি গায়ে দিতে পারি? তাই একে আমি মাথায় করে রেখেছি।'

যাকে দেখে তাকেই প্রণাম করে। বলে : 'আমি শুদ্দুর-ক্ষুদ্দুর, আমি কি জানি, আপনারা আমাকে পদধূলি দিয়ে পবিত্র করতে এসেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম।'

গিরিশেরও এই প্রণাম-ভাব।

বললে, 'রাম-অবতারে ধনুর্বাণে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ-অবতারে জগৎ-জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, এবার রামকৃষ্ণ-অবতারে জগৎ-জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।'

শেষ 'বলিদান' করে এসে গিরিশ অসুখে পড়ল।

সেই অসুখ আর সারে না।

প্রথমে হোমিওপ্যাথি হল, শেষে কবিরাজি। কবিরাজিতে একটু সুরাহা হল বোধহয়। কবিরাজ বললে, 'আপনি ভালো হয়ে উঠলে প্রত্যহ আপনাকে গঙ্গাস্নান অভ্যেস করাব।'

আর গঙ্গাস্নান! মণিলাল মুখুজ্জের ছেলে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। ভাবতে ভাবতে রাত্রে গিরিশের শ্বাসরোধ—বাতাসের জন্যে ওর প্রাণ না-জানি কত হাঁপিয়ে উঠেছিল!

এদিকে মোহনবাগান আই-এফ-এ শিল্‌ড্‌ পেয়েছে, তাতে কী আনন্দ। বলছে উদ্বেল কণ্ঠে, 'বাঙালি দশ বছর এগিয়ে গেল।'

ক্রমে ক্রমে শীত এসে পড়ল। সুরু হল ধোঁয়ার উৎপাত।

'কোথাও বাইরে যান না।' কেউ কেউ পরামর্শ দিল।

'বড় সাধ বাইরে যাবার, কিন্তু হাঁপানিই বুকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে।'

'ঠাকুরকে বলুন না ভালো করে দিতে।'

'কল্পতরুতলে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি,' বললে গিরিশ, 'আমি কি তাঁকে

ডেকে এ রোগ থেকেও মুক্ত হতে পারি না? পঞ্চবটীতে গড়াগড়ি দিয়ে এসে এক্ষুনি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার কি প্রার্থনা করবার উপায় আছে? আমার যে তাঁকে বকলমা দেওয়া।'

মাস্টারমশাই এসেছে দেখা করতে।

একবার বুঝি নৈরাশ্য এসেছিল গিরিশের মনে। ভেবেছিল, এর পরে আমার কী হবে?

নিজেরই গানের কলি মনে পড়ল :

'কাল কি হবে আজ ভেবে কি হবে,
ভেবে ভেবে ভবের খেলা বুঝতে পারে কে কবে?'

মাস্টারমশাইকে দেখতেই বলে উঠল : 'ভাই, ঘা কতক জুতো লাগিয়ে দিতে পারো আমাকে?'

'ও কথা কেন বলছেন?' মাস্টারমশাই স্তম্ভিত হল।

'আমার ঠাকুর রয়েছেন, তবু কিনা আমি ভাবছি আমার কী হবে!'

থিয়েটারের অভিনেত্রীরাও কেউ কেউ এসেছে দেখতে।

নরীসুন্দরী বলছে, 'আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমাকে বলেছিল, পুণ্যের ছাপমারা স্কুলে যখন তোর জন্ম নয় তখন তুই চিরদিন পাপই করতে থাক আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করতে থাকি। কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়েও চৈতন্যলীলার নিতাই-এর, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলিয়েছিলেন।'

অভিনেত্রী বসন্তকুমারীরও সেই কথা : 'তাঁর চরণতলে বসে আমরা শুধু অভিনয়ই শিক্ষা করিনি—সেই মহাপুরুষ গিরিশবাবু এই দুঃখিনীদের প্রাণ-স্পর্শ করেছিলেন, কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখে আদরে যত্নে আশ্বাসে এ জ্বালাময় জীবনে শান্তিজল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

কে না জানে অভিনেতার জীবন কী কষ্টকর! 'রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ।' কে না জানে 'দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।' তবু বহু উচ্চাশা নিয়ে রঙ্গভূমিকে ভালোবেসেছিল গিরিশ। 'রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি-রাশি, আশার নেশায় করি জীবনযাপন।' তবু অভিনয় লোকে ভালো-বাসলেও অভিনেতাকে কেন নিন্দা করে?

গিরিশেরই নিজের আক্ষেপ :

'লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদন হায় পরে কি বুঝিবে তায়
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কয়জন॥'

'বখাটে নট আর অখাঁটি নটীদের দিয়ে দেশে ধর্মপ্রচার হল। ছি ছি। একথা মনে এলেও স্বীকার করতে নেই, তাতে পাপ আছে।' অমৃত বোসের কথাগুলি আবার মনে করো : 'মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে জঘন্য

বেদীতে শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্তন করতে শুনেই ধর্মবিপ্লবকারী বীরের দল অন্তরে কম্পিত হল আর ধর্মপ্রাণ নিন্দিত হিন্দু জাগ্রত হয়ে ব্রজরাজ আর নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করতে আরম্ভ করল। নগরে নগরে গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। গীতা আর চৈতন্যচরিতামৃতের নানা সংস্করণে দেশ ছেয়ে গেল। বিলেতফেরত বাঙালি সন্তানও লজ্জিত না হয়ে সগর্বে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সচেষ্ট হল।'

আর বিপিন পাল তো অভিভূত। বলছে : 'আমরা তখন কলেজের ছাত্র, কলকাতার হালফ্যাশানের বাবু—র‍্যাংকিনের বাড়ির ডবল-ব্রেস্ট সার্ট গায়ে, তার উপরে পাকানো চাদর শক্ত করে বাঁধা, হাতে ছড়ি। আমরা চৈতন্য-লীলার অভিনয় দেখতে স্টার থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করেছি। প্রথম কয়েকটি দৃশ্যের পর যখন শিঙা আর খোল-করতাল নিয়ে স্টেজের উপর হরি-সংকীর্তনের দল উপস্থিত হল তখন মনে করলাম—এবার উঠতে হল। কিন্তু নিতাই আর নিমাই-এর গান শুনে এমন অভিভূত হলাম যে আর ওঠা হল না। এদিকে বুকের চাদরের বাঁধন খুলে গেছে। চোখ সজল, শেষ অবধি বসে রইলাম। ফেরবার সময় গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।'

আর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ তো দর্শকের আসন থেকে উঠে ভাবাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন।

ভক্তিরসের তুফান তুলে দিল গিরিশ। ভগবান শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন! নাস্তিকের হৃদয়েও জাগল ভগবদবিশ্বাস।

রঙ্গালয় গিরিশের গুণে জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পরিণত হল।

গিরিশ অমৃতলালের 'সাথি, মিত্র, গুরু,' শুধু নাট্যজীবনে নয়, অধ্যাত্ম-জীবনে। 'রামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে করে দিল স্থান।'

সেবার অধর সেনের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। গিরিশও গিয়েছে।

অধর বললে, 'অনেকদিন আসেননি, ঘর অন্ধকার হয়ে ছিল। আজ দেখুন ঘরের কেমন শোভা হয়েছে। কেমন সুগন্ধ বেরিয়েছে। আমি আজ ঈশ্বরকে খুব ডেকেছিলাম। এমন কী, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল!'

'বল কী গো।' ঠাকুর সস্নেহে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

সেইখানেই বঙ্কিমের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা—প্রথম আর শেষ।

অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাই তার সহকর্মীদেরও নিমন্ত্রণ করে এনেছে। এসেছে আরো অনেক নতুন লোক। বেশ একটা উৎসব-সভা বসে গিয়েছে।

বঙ্কিমের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে অধর। বললে, 'মশায়, ইনি একজন খুব বড় পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিম।'

'বঙ্কিম!' ঠাকুর হাসলেন : 'তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'

বঙ্কিম সহাস্যে উত্তর দিল : 'আর মশায়, জুতোর চোটে, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা!'

'না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'তুমিও তেমনি প্রেমে বঙ্কিম!'

কিন্তু গিরিশ এসেছিল না? সে গেল কোথায়?

সে পাশের ঘরে নিভৃতে বসে মদ খাচ্ছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য টেবলের উপর থেকে মদের বোতল পড়ে গেল মাটিতে। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সভাস্থ লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'ভগবৎ প্রসঙ্গ ছেড়ে ডি-গুপ্তের বোতল ভাঙায় কেন তোমরা উতলা হচ্ছ?'

আশ্চর্য, মদ কোথায়, সকলে ডি-গুপ্ত ওষুধেরই গন্ধ পেল! ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করলেন ঠাকুর। গিরিশকে কেউ আর দোষী করতে পারল না।

সভাশেষে বাড়ি ফিরবে বঙ্কিম, ঠাকুরকে প্রণাম করল। বললে, 'একটি প্রার্থনা আছে, যদি অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন—'

'তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে। সেখানেও হরিনাম হয়।'

'কী রকম হরিনাম গো।' ঠাকুর পরিহাসে সরস হয়ে উঠলেন: 'তবে একটা গল্প শোনো। কণ্ঠিমালা তেলক ছাপা এক স্যাকরার দোকানে কটা লোক সোনা বেচতে এসেছে। ভেকধারী বৈষ্ণবের দোকান, বেচারী খুব নিশ্চিন্ত আছে। স্যাকরার কী ভক্তি, লোকটাকে দেখেই বলে উঠল, কেশব! মানে এরা সব কে? একজন দোকানের কর্মচারী বলে উঠল, গোপাল! মানে কিনা গরুর পাল, হাবাগোবা গেঁয়ো লোক। তাই শুনে স্যাকরা বললে, হরি হরি! মানে তাহলে হরণ করি? কর্মচারী বললে, হর হর। অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে হরণ করো। কী গো,' বঙ্কিমের দিকে হাসিভরা চোখে তাকালেন: 'এই রকম হরিনাম নাকি?'

কথা শুনতে-শুনতে কী রকম উদাস হয়ে গিয়েছে বঙ্কিম। গায়ের চাদর ফেলেই চলে যাচ্ছে। একজন চাদরখানা কুড়িয়ে ছুটে দিয়ে এল তাকে। বঙ্কিম যেন কী ভাবতে-ভাবতে চলেছে।

গিরিশকে বঙ্কিমের বাসায় পাঠালেন ঠাকুর। সঙ্গে মাস্টারমশাই। সেই যে বলে গিয়েছিল তার বাসায় নিয়ে যাবে, কই এল না তো। যাও তোমরা একবার খোঁজ নিয়ে এস।

কিন্তু বঙ্কিমের আর আসা হয়নি।

গিরিশের প্রতিও বঙ্কিমের অটুট শ্রদ্ধা। বঙ্কিমের কত উপন্যাস গিরিশের কলমে নাটকায়িত হয়েছে। গিরিশকে বঙ্কিম লিখেছে: 'আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার যত্নে আমার রচনা আশাতীত সফলতা লাভ করিবে ইহা আমি খুব ভরসা করি।'

'আগে আমি আপনার উপর বিরূপ ছিলাম কিন্তু আপনার ম্যাকবেথ দেখে ভারি খুশি হয়েছি।' একজন এসে বললে গিরিশকে।

'সেকালের রাজারা রুষ্ট হলে শূলে দিতেন আর তুষ্ট হলে জায়গির দিতেন।' বললে গিরিশ, 'তা আপনি যখন তার কিছুই করেননি তখন আপনার রুষ্টি-তুষ্টি একই কথা।'

শুধু ম্যাকবেথ নয় শেকসপিয়রের আরো অনেক নাটকের স্থানবিশেষ গিরিশের মুখস্ত। বায়রনেরও অনেক জায়গা। শুধু আবৃত্তি নয়, ব্যাখ্যাতেও তার অসীম নৈপুণ্য। বলছে গিরিশ, 'আমার অবস্থা হয়েছে কী জানো? প্রকাণ্ড বড় মাথা, একটুখানি শরীর। অর্থাৎ জিনিসটা বোঝাবার শক্তি খুব আছে কিন্তু সেইটে উপলব্ধি করে জীবনের প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা নেই। এই জন্যেই দুঃখটা বেশি যে বুঝতে পারলাম, করতে পারলাম না।

পরক্ষণেই আবার বলছে : 'করতে পারি আর না পারি, বুঝতে পারি আর না পারি, তাঁকে ধরে পড়ে আছি, আমার আর কোনো ভাবনা চিন্তার আবশ্যক নেই। তিনিই আমার সব, আমার সব তিনিই করে নেবেন।'

রাম দত্ত 'তত্ত্বমঞ্জরী' লিখেছে। শুনে ঠাকুর বললেন, 'তা তুমি তো এত লিখেছ কিন্তু তার কী করলে? যে লোক শুদ্ধাচারে থাকে, হবিষ্যি করে, জলটুকুও ছেঁকে খায়, অথচ ভগবানে ভক্তি নেই, সে বড়, না যে আচার-বিচার মানে না, ভগবৎ প্রসঙ্গে অশ্রুপাত করে সে বড়?'

গিরিশ কি শুধু বইই লিখেছে না কি প্রেমাশ্রুতে সমস্ত অহঙ্কার ভাসিয়ে দিয়েছে!

'এ আবার কাকে নিয়ে এলে?' এক আগন্তুককে দেখে বৈকুণ্ঠ সান্যালকে বললেন ঠাকুর, 'এক সের দুধে এক সের জল থাকলে মারতে পারি কিন্তু দশ সের জল থাকলে মারতে হাল্লাক হয়ে যাব।'

গিরিশের ক সের জল? না কি যা জল সবটাই অশ্রু?

কথায়-কথায় ছোট ভাই অতুল ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে ফেলেছে।

গিরিশ তখুনি আগুন। বললে, 'আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। এখুনি বাড়ি ভাগ করে পাঁচিল তুলে নাও।'

মর্মান্তিক দুঃখে ম্লান হয়ে গেল গিরিশ। বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

বৈঠকখানায় একা বসে আছে অতুল, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল ঠাকুর দাঁড়িয়ে।

এ কী আপনি?

'গিরিশের জন্যে এসেছি। বাড়ি নেই, তাই না? তুমি তো বেশ লোক গো!' ঠাকুর অনুযোগ করে উঠলেন : 'অমনি করে বুঝি কেউ বলে!'

অতুল ঠাকুরের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিল। ভক্তের মনের বেদনা ঠাকুর ঠিক টের পেয়েছেন। শুধু গিরিশের নয়, অতুলেরও মনের বেদনা। অপ্রিয় কথাটা বলার পর থেকেই অতুলেরও দুরন্ত মর্মদাহ।

নেশা কাটিয়ে দাও, নেশা কাটিয়ে দাও। অন্তিমে গিরিশের শুধু এই আকুতি।

স্বজনে-পরিজনে গিরিশের তো কত বড় সংসার, কামনার শেকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু সুরেন মিত্তির তো নিঃসন্তান। ঝাড়া-হাত-পা হয়েও তার শান্তি নেই, কোত্থেকে একটা ভাইঝি জুটিয়ে এনেছে। এখন তার মোহেই বিভোর। ঠাকুর গান করছেন : 'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে। বিধি বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে।'

সুরেনের মুখোমুখি হলেন। বললেন, 'আঁটকুড়ো হলি, বেশ হল। কোথায় এখন ভগবানে মন দিবি, তা নয়, বেড়াল কুকুর টিয়ে পাখি পুষে তার জন্যে মশগুল। মোটেই ওকে মেয়ে ভাববি নে, ভগবতীর মূর্তি ভাববি, মা-জননী, আর ভগবতী বলে সেবা করবি—কল্যাণ হবে।'

কিন্তু গিরিশের ভগবতী কই? শুধু দয়া দিয়ে কে তার জীবন ধুয়ে দেবে?

কিন্তু আমি মা-জননীকে পূজা করেছি। প্রণাম করেছি।

আর প্রণামের জন্যেই পূজা। পূজার জন্যেই প্রণাম।

শিবানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। তোমরা জোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করেছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ। দাদা, ঐ যে বলছি ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।'

'এই মাতৃভাব—এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে এই শেষ কথা।'

বৈঠকখানায় দেবেন মজুমদারকে বসিয়ে ঠাকুর যদু মল্লিকের অন্দরমহলে ঢুকেছেন, শিগগির আর ফেরবার নাম নেই। মেয়েমহলে যে খুব প্রতিপত্তি! দেবেনের কী রকম সন্দেহ হল। সমস্ত ভ্রম নিরসন করবার জন্যে যিনি এসেছেন তিনি আশ্রিতকে রাখতে পারেন না সংশয়ে। তাই অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন দেবেনকে। হ্যাঁ, দেখে যাও নিজের চোখে। দেবেন দেখল যদু মল্লিকের মা ঠাকুরকে নিজহাতে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে আর সজল চোখে বলছে, 'চৈতন্যামৃতে শ্রীচৈতন্যের লীলা পড়েছি বটে, সে কোন কালের কথা, কিন্তু আজ বাবা মূর্তিমান চৈতন্য তোমাকে খাইয়ে আমার জন্ম সার্থক হল।'

দেবেন হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করিনে।'

গিরিশ ক্রমশই শান্ত ভাব ধরছে। ঠাকুর বললেন, 'তোমার এ ভাব বেশ ভালো—শান্ত ভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা, ওকে শান্ত করে দাও, যা-তা

আমায় না বলে।'

'কিন্তু আমার এ রশুনগোলা বাটির গন্ধ কি যাবে?' আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল গিরিশ।।

'যাবে। রশুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নতুন হাঁড়ি হয়ে যায়। ভক্তি লাভ করে কর্ম করলে কোনো দোষ নেই। দুর্গাচরণ ডাক্তার এত মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত কিন্তু কাজের বেলায় ঠিক—চিকিৎসা করবার সময় কোনো ভুল হবে না।'

'আপনার কৃপা হলেই সব হয়।' গিরিশ বললে, 'আমি কি ছিলাম, কী হয়েছি!'

'ওগো তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে।' বললেন ঠাকুর, 'সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভালো হয়ে এল তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ বেটে খেয়ো। তারপর রোগ ভালো হল। তা মরিচ দিয়ে ওষুধ খেয়ে ভালো হল, না, আপনি ভালো হল, কে বলবে?'

সব মনে পড়ছে। সেই যে ঠাকুর গিরিশের গায়ে হাত দিয়ে ভাবোল্লাসে গান গেয়েছিলেন সেই গান :

'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি॥'

বাড়ির দোতলার বৈঠকখানায়ই গিরিশের শয্যা, যেহেতু এই ঘরেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ। এই ঘরই গিরিশের গয়া-গঙ্গা-বারাণসী।

'তুমি কি কোথাও বেরুবে?' অবিনাশকে জিজ্ঞেস করল গিরিশ। পরে বলল, 'আজ কোথাও বেরিয়ো না।'

জ্বর বেড়েছে। তারই জন্যে অসুস্থতা। কিন্তু জ্বর তো ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে দেখছি। এখন যে দেখছি ছিয়ানব্বুই। গিরিশ বললে, 'কোল্যাপ্সের সময় হয়ে এল।'

টানের জন্যে শুতে পাচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু তুমি কত রাত জাগবে, বলছে অবিনাশকে, তুমি ঘুমোও। তুমি পড়লে কাকে তুলব?

রাত তিনটের সময় অবিনাশ শুনল গিরিশ "রামকৃষ্ণ" নাম তিনবার উচ্চারণ করল।

অবিনাশ উঠে বসল।

'উঠলে যে?' গিরিশ জিজ্ঞেস করল।

'ঘুম হল না।' অবিনাশ মিনতির সুরে বললে, 'আপনি একটু ঘুমুন।'

'খাড়া হয়ে বসে কী করে ঘুমুই?'

বসা অবস্থায় শ্বাস চলছে। শ্বাসে শ্বাসে নাম চলছে।

মিনার্ভা থিয়েটার ফরিদপুরে বায়নায় গিয়েছে, দানিও সেই দলের মধ্যে। দানিকে টেলিগ্রাম করো। তাকে কত কথা বলবার আছে।

সকালে বললে, 'আমাকে সরিয়ে বিছানা ঝেড়ে দাও।'

বেলা নটা, বললে, 'চলো।'

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল অবিনাশ।

'গাড়ি এসেছে।'

তারপর থেকে থেকে-থেকে শুধু চলো, চলো, চলো।

'মা-ঠাকরুনের কাছে খবর পাঠাব কী?' দেবেন জিজ্ঞেস করল।

'কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

রাত্রে দানি এসে হাজির। বাবার মুখে জল দিল।

'আমাকে কত কী বলবে বলেছিলে।' দানি কেঁদে উঠল।

আর কিছু বলাবলি নেই। এখন শুধু চলা। এখন শুধু 'নেশা কাটিয়ে দাও।' এখন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ।

রাত্রি বারোটা থেকে সারদানন্দ স্বামী কীর্তন আরম্ভ করল। 'রামকৃষ্ণ হরিবোল।' একটা কুড়ি মিনিটে পড়ল শেষ নিঃশ্বাস। ১৩১৮ সালের পঁচিশে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

মা বলতেন, 'আগে ছিল রাহুখেগো চাঁদ, ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছে ষোলকলায় পরিপূর্ণ। ভাবনা কিসের? ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন।'

আর ঠাকুর বলছেন, 'তুমি পবিত্র তো আছ। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল, বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই। বিশ্বাস করো, নির্ভর করো, তা হলে নিজের কিছু করতে হবে না। যার ঠিক বোধ হয়েছে ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা তার আর বেতালে পা পড়ে না। আমি ওকে ষোল আনা দিতে চেয়েছিলুম ও আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিয়ে ফেলেছে।'

না, ভাবনা কিসের? শুধু বিশ্বাস আর ভক্তি। ভক্তি আর বিশ্বাস।

এই গ্রন্থ লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীমকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ
স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত শ্রীমা সারদামণি
মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত গিরিশচন্দ্র
কুমুদবন্ধু সেন প্রণীত গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত গিরিশ-প্রতিভা
কিরণচন্দ্র দত্ত রচিত গিরিশচন্দ্র
শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রণীত শ্রীশ্রীমাসারদামণি দেবী
ইন্দ্র মিত্র রচিত সাজঘর